লোকপ্রশাসন সাময়িকী
সপ্তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, আশ্বিন ১৪০৩

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

সপ্তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, আশ্বিন ১৪০৩

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের
ত্রৈমাসিক মুখপত্র

সম্পাদক ঃ মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

© ১৪০৩
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,
সাভার, ঢাকা

টেলিফোন	ঃ	৮৩১৭১১-৯ (পিএবিএক্স)
টেলেক্স	ঃ	৬৩২২২৮ পিএটিসি বিজে
বিপিএটিসি	ঃ	প্রকা-৩০/বাজা-৬/৯৬
বিপিএটিসি গ্রন্থাগার	ঃ	৩৫১.০০০৫
প্রচ্ছদ	ঃ	কাজী আজাদ
মূল্য	ঃ	পনের টাকা

LOKPROSHASHON SAMOEEKY

Vol. 7, September 1996, Ashwin 1403

Quarterly Bengali Journal of
Bangladesh Public Administration Training Centre

Editor : Mohammad Jahangir Hossain

© 1403
Bangladesh Public Administration Training Centre
Savar, Dhaka.

Telephone	:	831711-9 (PABX)
Telex	:	632228 PATC BJ
BPATC	:	Pub-30/BJ-7/96
BPATC Library	:	351.0005
Cover Design	:	Qazi Azad
Price	:	Taka Fifteen only

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

সপ্তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, আশ্বিন ১৪০৩

বিপিএটিসি গ্রন্থাগার
সাময়িকী
শাখা
তারিখ...
সাভার, ঢাকা

সম্পাদনা পরিষদ

মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
কাজী শামসুল আলম
আ. ক. ম. মাহবুবুজ্জামান
কঙ্কা জামিল

সম্পাদক

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

লেখকের জ্ঞাতব্য

* লোকপ্রশাসন সাময়িকীতে লোকপ্রশাসন, প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা, বিশ্লেষণ, আলোচনা অথবা অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ মৌলিক প্রবন্ধ ও পুস্তক সমালোচনা মুদ্রিত হয়।

* মূলকপিসহ পাণ্ডুলিপির ৩ প্রস্থ সম্পাদক, লোকপ্রশাসন সাময়িকী, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা– এই ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে।

* লেখা রিপোর্ট সাইজের কাগজে এক পৃষ্ঠায় টাইপকৃত অথবা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত, পূর্বে অপ্রকাশিত এবং অনধিক ৬,০০০ শব্দের সীমিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

* প্রাসঙ্গিক সূত্রসমূহ এবং পাদটীকা প্রবন্ধের শেষে গ্রন্থপঞ্জিতে উল্লেখ করতে হবে। গ্রন্থপঞ্জিতে লেখক, গ্রন্থের নাম, প্রকাশক, বৎসর ও পৃষ্ঠা এবং সাময়িকীর ক্ষেত্রে লেখক, প্রবন্ধের নাম, খণ্ড, ইস্যুর সংখ্যা, বৎসর ও পৃষ্ঠা উল্লেখ করতে হবে।

* লোকপ্রশাসন সাময়িকীতে মুদ্রিত লেখার জন্য পৃষ্ঠা প্রতি ২০০ (দুইশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদানের বিধান রয়েছে।

* অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না।

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
সপ্তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, আশ্বিন ১৪০৩

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

১. প্রাচীন বাংলার রাষ্ট্র ঃ আর্থ–সামাজিক, প্রশাসনিক ও ভূমি ব্যবস্থাপনা — ১
ডঃ মোহাম্মদ হান্নান

২. বাংলাদেশের সংবিধানে নির্বাহী ক্ষমতার বিন্যাস — ১৭
মোহাম্মদ আলী

৩. বিচার বিভাগের স্বাধীনতাঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত — ২৫
মুহাম্মদ আব্দুল কাদের

৪. ফৌজদারী বিচার প্রক্রিয়া ও সাক্ষ্য আইন — ৩৯
মোঃ হাসিবুর রহমান

৫. আঞ্চলিক সহযোগিতাঃ দক্ষিণ ও দক্ষিণ–পূর্ব এশীয় অভিজ্ঞতার তুলনামূলক পর্যালোচনা — ৫৩
কাজী মোঃ শামসুল আলম

৬. গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া ও বাংলাদেশের পরিবেশে তার প্রভাব — ৬৩
সৈয়দ শামসুল আলম

৭. পরিবেশ উন্নয়নঃ সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা — ৭৯
মোহাম্মদ আবু ইউসুফ

৮. উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণ — ৯১
কাজী হাসান ইমাম

৯. আঞ্চলিক কেন্দ্র সমূহের প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সমস্যা ও গৃহীতব্য পদক্ষেপ — ১০৯
মোঃ শফিকুল হক/এ. কে. এম. খায়রুল ইসলাম

১০. বাংলা উচ্চারণ রীতিঃ 'অন্ত্য–অ'–এর প্রমিত উচ্চারণ — ১২৫
আ, ক, ম, মাহবুবুজ্জামান

১১. সার–সংক্ষেপ লিখনঃ কৌশল ও গুরুত্ব — ১৩২
মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা

১২. পিএটিসিতে বৃক্ষ রোপণের নেপথ্যে — ১৪২
এ. জেড. এম. শামসুল আলম

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৭ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ৯৬, আশ্বিন ১৪০৩

প্রাচীন বাংলার রাষ্ট্র ঃ আর্থ-সামাজিক, প্রশাসনিক ও ভূমি ব্যবস্থাপনা

ডঃ মোহাম্মদ হাননান*

১.০ ভূমিকা

১.১ ঠিক কোন্ সময় থেকে বাঙলাদশে মানব ইতিহাস তথা লোক বসতির শুরু তা এখনো অজ্ঞাত রয়ে গেছে বলা চলে। এ পর্যন্ত যেসব তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, প্রাচীন গ্রন্থাদি ও অন্যান্য সূত্রে, যতোটুকু সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় তাতে বিষয়টির সত্য উদ্‌ঘাটন একরকম অসম্ভব বলেই মনে হয়। কিন্তু সারা দুনিয়ার সমাজ ও সভ্যতার বিকাশের যে ধারা তা বিশ্লেষণ করলে একথা অনুমান করতে একটুও কষ্ট হয় না যে, বাংলাদেশ অঞ্চলও এক সমৃদ্ধ সভ্যতার (তা অবশ্যই নগর সভ্যতার ধারাবাহী) অধিকারী ছিল। পাহাড়পুর ও ময়নামতির মৃৎফলকগুলিতে প্রাচীন বাংলার লোকায়ত ও নগর জীবনের যে চিত্র দেখতে পাওয়া যায়, তা স্পষ্টতই তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার একটি অবয়বকে আমাদের সমানে তুলে ধরে।

১.২ এছাড়া, চীনা পরিব্রাজকদের বিবরণীতে, শীল ভদ্রের জীবন কাহিনীতে, তিব্বতী ঐতিহ্যে, ভারতীয় ন্যায় শাস্ত্রের ইতিহাস গ্রন্থে, এমনকি বৈদিক সাহিত্যের বেশ কিছু সুক্তেও প্রাচীন বাংলাকে চিহ্নিত করা যায়, এমন কিছু বিষয় থেকে তৎকালীন সমাজ কাঠামো, রাষ্ট্রচিন্তা ও প্রশাসনিক অবস্থার একটা স্বরূপ উদঘাটন করা সম্ভব হয়।

২.০ প্রাচীন বাংলার সমাজ কাঠামোঃ আদি বাঙলার পরিচয়

২.১ বৈদিক সাহিত্যের বেশ কিছু সুক্তে বর্ণিত শুভ–অশুভ, দেবতা–দানব ও বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব সংগ্রামের কাহিনী সমাজ কাঠামো বিশ্লেষণে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ঋগ্বেদে অত্যন্ত স্পষ্ট করেই সমাজের উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর (ধনী দরিদ্র) মানুষের কথা বারবার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যা থেকে তৎকালীন সমাজ কাঠামোর একটা পরিচয় পাওয়া সম্ভবঃ

> "হে অবিনশ্বর অগ্নি, আমি তোমার স্তব করায়, যে সকল ধনী, আমাকে পঞ্চাশটি অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন, তুমি সেই সকল ব্যক্তিকে দীপ্তিশীল প্রচুর অন্ন এবং পরিচালকবর্গ প্রদান কর।"[১]

---

* সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২.২ এখান থেকে বৈদিক আর্য সমাজের সম্পত্তির মালিকানার উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক ও সমাজিক অসাম্যের আবির্ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। দাস– মালিকের কথা প্রসঙ্গে(ঋগ্বেদে কোথাও কোথাও একথা উল্লেখ করা হচ্ছে যে, কারো কারো শত শত ক্রীতদাস আছে)। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, দরিদ্রদশায় পতিত সমাজের মানুষ ব্যক্তি স্বাধীনতা হারিয়ে ক্রমশ ক্রীতদাসে পরিণত হচ্ছে। তখন ক্রীতদাস বলতে দস্যু বা দাস অর্থাৎ শত্রুকে বোঝাত। এই দস্যু বা দাস বলতে সামাজিকভাবে কাদের বোঝান হতো, এরা এসেছিল কোন জনগোষ্ঠী কিংবা সম্প্রদায় থেকে তার একটা পরিচয় নেওয়া যেতে পারে।

২.৩ 'আর্য মঞ্জুশ্রী মূলকল্প' নামে একটি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের আর্য ভাষা–ভাষী লোকেরা 'অসুর' জাতিভূক্ত। বৈদিক ও বেদোত্তর সংস্কৃত সাহিত্যে 'অসুর' শব্দটির যে খুব ব্যাপক ব্যবহার করা হয়েছে তা একমাত্র দেবগণের বিরোধী হিসাবেই।[২] অনেকের ধারণা এই 'অসুর' বলতে আর্যপূর্ব যুগের এ দেশীয় বাঙালী মানুষদেরই বোঝাচ্ছে।

২.৪ সমগ্র বৈদিক সাহিত্য জুড়েই এ অঞ্চলের লোকদের ও তাদের সংস্কৃতির প্রতি আর্যদের প্রবল ঘৃণা ও বিদ্বেষ লক্ষ্য করা যায়। তাদের নিজেদের মধ্যে ছিল আর্য সংস্কৃতি সম্পর্কে দারুণ অহংবোধ। নিজেদের এলাকাকে তারা নাম দিয়েছিল 'ব্রহ্মবিদেশ', 'আর্যাবত' ইত্যাদি। আর্যসংস্কৃতির সীমানার বাইরের অংশকে তারা দস্যুদের দেশ বলে অভিহিত করতো।[৩] বিদ্রোহ পর্যন্ত এগিয়ে এরা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল একমাত্র ব্রাত্যদেশে (কথিত অসুরগণের দ্বারা অর্থাৎ বলা যায় আদি বাঙালীদের দ্বারা। এই অসুরগণের দেশকে তারা 'ব্যাত্যদেশ' বা বেদবহির্ভূত দেশ বলে অভিহিত করতো। সেজন্য আর্যাবর্তের কোনো লোক যদি তীর্থ যাত্রা উপলক্ষে বাঙলাদেশে আসতো, তাহলে তাকে 'পুনোষ্টম' নামে এক যজ্ঞ সম্পাদন করে শুদ্ধ হতে হতো।

২.৫ সুতরাং স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, একটা ভিন্নতর জাতি, ভিন্নতর আচার–ব্যবহার, ভিন্নতর সভ্যতা সংস্কৃতি নিয়ে আর্যদের অনমনীয় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখা দিয়েছিল। গর্বিত আর্যজাতি তাদের দর্পিত উন্নাসিকতায় বিজাতিসুলভ শ্রেণী– চেতনায় এ দেশবাসী আদি বাঙ্গালীদের নানা খেভাবে ভূষিত করে তোলে ('ঐতরের ব্রাহ্মণ' বলছে 'দস্যু, ভীমের দ্বিগ্বিজয় প্রসংগে 'মহাভারত' বাঙলার সমুদ্র তীরবর্তী লোকদের বলছে ' ম্লেচ্ছ', 'ভাগবত পুরাণ' বলছে 'পাপ' এবং এদের ভাষাকে বলা হয়েছে ''অসুর' ভাষা)। এছাড়া আর্যাবর্তের বাইরের লোকজন (যেখানে বাঙলা ও বাঙালীরা ছিল অন্যতম) রাক্ষস, পক্ষী, দৈত্য, নাগ প্রভৃতি নামেও অভিহিত হতো।

২.৬ বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী এই আর্য ও অনার্য ভাবধারা, মতাদর্শ, সংস্কৃতির বিরোধ, বিদ্রোহ ও সংঘাত এ অঞ্চলে নিয়মিত গতিতে চলেছে। তবে বাংলাদেশে আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির ছোঁয়া আসে সকলের পরে।[৪] এমনকি

একাদশ দ্বাদশ শতকের দিকেও যখন আর্য-ছোঁয়া সমাজের উঁচুমানের জীবন যাপনকারীদের মধ্যে বিস্তৃত, তখনো পর্যন্ত, কি তারও অনেক পরবর্তীকাল পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের জীবনযাপনকারীদের কাছে এদেশীয় লোকসংস্কৃতি, লোকভাবদর্শই একমাত্র দর্শন, একমাত্র মতাদর্শ হিসাবে কাজ করেছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বর্ণাশ্রিত আর্য-সমাজের ভিত্তি অনড় ও অনমনীয়ভাবে এদেশের সমাজে গেড়ে বসে।

২.৭ সে হচ্ছে এক নতুন ইতিহাস, নতুন ভাবধারার সূচনা। এই নতুন বিষয়গত সূচনার পশ্চাতে একটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্ন অবশ্যই ছিল। এই যে বর্ণাশ্রিত সমাজ যা বাঙালীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল তা থেকে ইতিহাসেরই শুরু বলা যায়। তাই বাঙলাদেশের ইতিহাসের সূচনায়ই সমাজ কাঠামোগত বর্ণাশ্রম সমস্যা দেখা যায়, যা পরবর্তীতে জাতিভেদ প্রথায় রূপ নেয়। পরবর্তীকালে গড়ে ওঠা রাষ্ট্র কাঠামোতেও তা সমূহ প্রভাব ফেলে।

৩.০ সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস

৩.১ বর্ণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এভাবে বাঙলার আদিম সমাজ সম্পর্কে (কৌম সমাজে) ভাঙন দেখা দিল এবং সম্পত্তির মালিকানা, সামাজিক পদমর্যাদা এবং মতাদর্শের পার্থক্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ব্যস্থায়ও অসাম্যের বিকাশ ত্বরান্বিত হলো।

৩.২ পদমর্যাদায় সামান্য কিছু পার্থক্য থাকলেও ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়রা রাষ্ট্রের সবচেয়ে সুবিধাভোগী অর্থাৎ অভিজাত ও ধনী সম্প্রদায়ে পরিণত হলো। শ্রমজীবী মানুষ ও নিরন্ন ক্রীতদাসদের উপর শোষণ ও প্রভূত্ব করার ধর্মীয় ও তত্ত্বগত স্বীকৃতিও তারা পেয়েছিল।

৩.৩ কারণ ব্রাহ্মণরা প্রচার করেছিল যে, ব্রহ্ম (সৃষ্টিকর্তা) নিজ শরীরের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। ব্রহ্মার (পুরুষের) মুখ থেকে সৃজিত হয়েছে ব্রাহ্মণ (সেজন্য তারা দেবতার পক্ষ থেকে কথা বলতে পারেন), হাত থেকে সৃজিত হয়েছে ক্ষত্রিয় (অর্থাৎ যোদ্ধা শ্রেণী), উরু থেকে বৈশ্য (অর্থাৎ বণিক শ্রেণী), আর পদযুগলের ময়লা থেকে শুদ্র (অর্থাৎ ভৃত্য শ্রেণী)[৫]।

৩.৪ সৃষ্টি মাহাত্মের এই ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত বংশানুক্রমিক হয়ে দাঁড়াল। ব্রাহ্মণের সন্তানই ব্রাহ্মণ হবে আর শুদ্রের সন্তান হবে সব সময়েই শুদ্র। যে বর্ণ হিসাবে সে জন্মগ্রহণ করেছে সে বর্ণে থেকে জীবন অতিবাহিত করাই তার নিয়তি। এ বর্ণ ব্যবস্থা পরবর্তীকালে গীতায় নূতনভাবে সংজ্ঞায়িত হয়ে চরম আকার ধারণ করে। গীতার রূপকাররা এই চেতনাকে শুধু ধর্ম ও সামাজিক ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধ রাখেনি, তা রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থায়ও কায়েম করে ফেলে।

৩.৫ আর সমাজে যে শ্রেণীর মানুষগুলোকে শুদ্র হিসাবে চিহ্নিত করা হলো তারা স্বভাবতই ছিল দরিদ্র অথবা অর্থনৈতিকভাবে ধনীদের ওপর নির্ভরশীল। শুদ্রদের জীবন তাই ছিল অতিকষ্টের, কিন্তু তার চেয়েও কষ্টের ও লাঞ্চনার জীবন ছিল তাদের, যারা

ছিল অন্ত্যজ বা অচ্ছুৎ। অচ্ছুৎ বলে গণ্য করা হতো তাদেরই যারা কোন বর্ণেই পড়ে না। বলা হয়েছিল, ঈশ্বর শুধুমাত্র একটি কর্তব্য সমাধার জন্যই শুদ্রদের নির্দেশ দিয়েছেন "বিনয়াবনত চিত্তে তোমাপেক্ষা উচ্চবর্ণের ব্যক্তিদের সেবা করো।"[৬] উচ্চবর্ণের কাউকে যদি কোনো শুদ্র অপমানজনক বাক্য বলে, তবে তার মুখ উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড পুড়ে বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ ছিল। শুধু তাই নয় ব্রাহ্মণের সংগে তর্করত শুদ্রের মুখ ও কানে ফুটন্ত তেল ঢেলে দেওয়ার জন্য সম্রাটের ওপর আদেশ ছিল।[৭]

৩.৬ কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সামাজিকভাবে কারা ছিল এই শুদ্র শ্রেণীর অধিবাসী? অনেক সমাজবিজ্ঞানীর মতে, শুদ্ররা আসলে ছিল আর্যদের হাতে পরাভূত ও বশীভূত স্থানীয় অধিবাসী আদি বাঙালী সম্প্রদায়। অতএব, দুই বিপরীত মতাদর্শের প্রতিভূ, দুই সামাজিক অবস্থানের নিমিত্তহেতু, অর্থনৈতিক দিক থেকে উৎপাদনের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে শ্রেণী দ্বন্দ্বে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালো। সেদিক থেকে বাঙলার বর্ণ বিন্যাস সরাসরি ব্রাহ্মণ ও শুদ্র অন্ত্যজ এই দুই ভাগে বিভক্ত। অনেক সমাজ বিজ্ঞানীরমতে, এ অনেকটা পিরামিডের গঠনের মতো–

"সুউচ্চ মার্গে অর্থাৎ চূঁড়ায় ব্রাহ্মণ, মধ্যে শুদ্র সম্প্রদায়, আর পদতলে অন্ত্যজ, অস্পর্শ্য ম্লেচ্ছ সম্প্রদায়।[৮]

৩.৭ ঐতিহাসিকদের মতে, বাঙলাদেশের ব্রাহ্মণ ছাড়া আর সবাই ছিল শুদ্র। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের কোনো উল্লেখ অন্তত বাঙলাদেশ প্রসংগে পাওয়াই যায় না। বাংলাদেশে তাই কোনোকালেই ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সুনির্দিষ্ট বর্ণ হিসাবে গঠিত বা স্বীকৃত হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ,

> "An important factor in the evolution of this final stage is the growing fiction that almost all non-Brahmins were Sudras. The origin of this fiction is perhaps to be traced to the extended significance given to the term Sudra in the Purans, where it denotes not only the members of the fourth caste, but also those members of the three higher castes who accepted any of the heretical religions or were influenced by Inntric rites. The predominance of Buddhism and Tantric Saktism in Bengal, as compared with

> other parts of India since the eighth century A. D. perhaps explains why all the notable castes in Bengal were regarded in the Brihad-diharma Purana and other later texts as Sudras.[৯]

৩.৮ ব্রাহ্মণ ছাড়া বাংলাদেশের আর সকল বর্ণকেই সঙ্কর শুদ্রবর্ণ হিসাবে ধরে তিনটি মাত্র শ্রেণীতে তাদের বিভক্ত করে তাদের প্রত্যেকের সামাজিক মর্যাদা ও বৃত্তি বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। স্থান ও ব্যক্তিগত দিক থেকে এদের সংখ্যা ছিল ৩৬ জাতের। বৃহদ্ধর্ম পুরাণ মতে, বিভাগ তিনটি যথাক্রমে– ১. উত্তম সঙ্কর (২০ টি উপবর্ণ), ২. মধ্যম সঙ্কর (১২টি উপবর্ণ) ৩. অপধসঙ্কর (৯টি উপবর্ণ)।

৪.০ অর্থনৈতিক শ্রেণী

৪.১ প্রাচীন বাঙালী রাষ্ট্র ও সমাজ এই বর্ণের মতো অর্থনৈতিক শ্রেণীতেও বিভক্ত ছিল। উৎপাদন সম্পর্ক ও বন্টন ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে সমাজে শ্রেণীর স্তর বিভাগ নির্ধারিত হয়ে থাকে। প্রাচীন বাঙলায় এই শ্রেণীর সংগে বর্ণ প্রায় সার্থক অর্থেই ব্যবহার করা যেত। বর্ণ বিন্যাস ও শ্রেণী বিন্যাস প্রায় একই মাপকাঠিতে বাঁধা ছিল।

৪.২ কারণ "বৃত্তি বা জীবিকা ছিল বর্ণ–নির্ভর আর বর্ণ ছিল জন্ম নির্ভর। বৃত্তি যেকানে বর্ণ অনুযায়ী সেখানে বর্ণ ও শ্রেণী একে অন্যের সঙ্গে জড়াইয়া থাকিবে এবং শ্রেণীর মর্যাদাও সেই সমাজে বর্ণ ও বৃত্তি অনুযায়ী হইবে তাহা বিচিত্র নয়।"[১০]

নির্ভর নির্ভর

বৃত্তি ⟶ বর্ণ ⟶ জন্ম

৪.৩ ব্রাহ্মণরা বর্ণ হিসাবে যেমন, শ্রেণী হিসাবেও ঠিক তেমনি পৃথক ছিল। উচ্চ শ্রেণীর এই সম্পত্তি ও দাস মালিকদের প্রভাব প্রতিপত্তি সমাজে ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকলে মৌর্য যুগের প্রশাসন একরকম প্রায় একনায়কতন্ত্রে রূপ নেয়। অবস্থাটা এমন যে, একটা মাত্র বর্ণ (ব্রাহ্মণ বর্ণ), একটাই ধর্ম (ব্রাহ্মণ্য ধর্ম), একটাই আদর্শ (পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য আদর্শ) ছাড়া সমাজের অপরাপর মতাদর্শ ও শক্তি কে রাষ্ট্র আর স্বীকৃতি দিতে চাইত না।

৪.৪ আর শুদ্র অন্ত্যজরা শুধুমাত্র বর্ণ হিসাবেই নয়, অর্থনৈতিক শ্রেণী হিসাবেও ছিল সমাজের নিম্নতম পর্যায়ের লোক। এদের প্রায় সকলেই দিনমজুর, ভূমিহীন কিংবা অন্যান্য পেশার সমাজ শ্রমিক। এভাবে বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথার শুধু যে উদ্ভব ঘটল তাই নয়, রাষ্ট্র ও সমাজ কাঠামোতে তা এক প্রধান বিষয়ও হয়ে দাঁড়াল। জন্ম কৌলীন্যের সঙ্গে বিষয় সম্পত্তি ও রাষ্ট্র মর্যাদা যখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিল তখন তীব্র শ্রেণী দ্বন্দ্বেরও সৃষ্টি হল।

৪.৫ মৌর্যযুগে 'গণ ও সংঘ' নামে ক্ষত্রিয় প্রভাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের যেসব রাজ্য গড়ে উঠেছিল সেখানে কিছু পরিমাণ গণতান্ত্রিকতা ছিল। এ সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রগুলো ছিল তীব্র শ্রেণী, মালিকানা ও সমাজগত বিরোধে আকীর্ণ।

৫.০ গণবিদ্রোহ ও মুক্তি কামনা

৫.১ ভারতীয় আকরসূত্রে যেসমস্ত যুক্তরাষ্ট্রয়কে গণ বা সংঘ বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো স্বায়ত্বশাসিত ও স্বাধীন ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধাঁচের রাষ্টে রাজা ছিল না, রাষ্ট্র নেতারা সেখানে নির্বাচিত হতেন। এসব রাষ্টে (মগধ ও মৌর্য যুগে) রাজবংশ–শাসিত রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম করে গেছে।

৫.২ এ সময়ের লিখিত স্মৃতিগ্রন্থ সমূহে সমাজের প্রভাবশালী উচ্চ শ্রেণীর সংগে গণ ও সংঘের সাধারণ সদস্যদের সংঘর্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'মহাভারতেও' এ ধরনের বিদ্রোহের খবর পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে, গণ ও সংঘসমূহের প্রধান শত্রু হল তাদের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ বিরোধ। বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্রে তো শাক্যপ্রজাতন্ত্রে ক্রীতদাসদের প্রকাশ্য বিদ্রোহের কথাই আছে। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' রাজাকে পরামর্শ দিয়ে বলা হয়েছে, ভিন্ন রাজ্যের সম্ভাব্য আক্রমণের ভয় থেকে অভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ অধিকতর বিপজ্জনক।[১১] এছাড়া পরবর্তীকালে বিশেষ করে পাল আমলে নিম্নশ্রেণীর 'কৈবর্ত' জাতি–শক্তির প্রবল অভ্যুত্থানের সংবাদ ইতিহাস স্বীকৃত।

৫.৩ স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে, এতসব বিদ্রোহ ও সংঘাত কার এবং কাদের, অথবা কার এবং কাদের বিরুদ্ধে এ বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কতখানি বিপর্যস্ত হয়ে পড়লে বড়ো ধরনের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক পবির্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে তা সহজেই অনুমেয়।

৫.৪ পালরাজাদের অধীন এক কৈবর্ত যাঁর নাম দিব্যোক, যে তাঁর প্রভূর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে পালরাজা দ্বিতীয় মহীপালকে (১০৭২–৭৫ খ্রীঃ) হত্যা করে, বরেন্দ্রভূমি অধিকার এবং তথায় কিছুকাল রাজত্ব করে, তাতে বোঝা যায় এই সময় প্রশাসন ব্যবস্থায় চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছিল এবং অবহেলিত, নিপীড়িত মানুষ বিশেষ করে কৈবর্তরা খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল ও সমাজে বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান তারা অধিকার করেছিল। সময় সময় অনাচার–অবিচারের বিরুদ্ধে সমাজের নীচু তলার এ মানুষগুলোর এসব বিদ্রোহকে, সমাজের উঁচুতলার লোকেরা যে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গিতেই নিতো তা বোঝা যায় কৈবর্ত বিদ্রাহের এই নায়ক দিব্যোক প্রসঙ্গে সন্ধ্যাকর নন্দীর উক্তি থেকে। সন্ধ্যাকর নন্দী দিব্যোককে দস্যু ও 'উপধিব্রতী' (ভাপত) 'আখ্যা দিয়েছিলেন।'[১২]

৫.৫ বাঙালী জনগোষ্ঠী যাদের কাছে ছিল অস্পৃশ্য, যারা এই জনগোষ্ঠীকে করে রেখেছিল অন্ত্যজ, তারাই তথাকথিত অস্পৃশ্য কৈবর্ত দিব্যোকের দ্রোহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলার ইতিহাসে এ ঘটনা অনন্য। পাল সম্রাটদের

প্রবল প্রতাপী এ শাসন ও প্রভাব ভেদ করে শির উঁচু করে নির্ভয়ে দাঁড়াবার প্রেরণা ও শক্তি যুগিয়েছিল শত বছরের পীড়ন–শোষণ ও নির্যাতন, একথা বলা বাহুল্য।

৫.৬ ক্রমেই কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে আবার কোথাও সংঘবদ্ধভাবে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। বেদসমূহের পৌরাণিক বিশ্বাস এবং পুরোহিতদের সম্পর্কে ইতপূর্বে জনগণের যে মোহ ছিল তা থেকে মুক্তির ফলে বেদবাদের প্রভাব অনেকাংশে ক্ষুণ্ন হতে থাকল। ধর্মমত হিসেবে বেদবাদের নিরংকুশ কর্তৃত্বে অবিশ্বাসী হয়ে উঠল মানুষ। ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠল প্রতিবাদ এবং ক্ষোভ। শত শত বছরের যে দুঃসহ জ্বালা সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষের উপর চাপ ফেলেছিল, মানুষ সে পীড়ন থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পায়।

৫.৭ আর তাদের এই মুক্তি কামনা শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মমত ও পথকে আশ্রয় করেই অভিব্যক্ত হয়ে উঠলো। ব্রাহ্মণ্য সংস্কার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যখন সে বিদ্রোহ জ্ঞাপন করছে, তখন পাশাপাশি সে স্বতন্ত্র আদর্শ তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। ফলে প্রাচীন যুগের একেবারে প্রথম থেকেই মধ্যযুগ পর্যন্ত গড়ে উঠেছে এখানে সেখানে বিভিন্ন ধর্মান্দোলন। বেদ ভিত্তিক মতাদর্শগত ও সামাজিক নিয়ম–কানুনও অস্বীকার করে ফেলল তারা এবং 'পরমজ্ঞান'–এ একমাত্র অধিকারী বলে ব্রাহ্মণদের এতকালের দাবি সরাসরি প্রত্যাখ্যাত হল।

৫.৮ আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয়–তৃতীয় শতকে বর্তমান বাংলার উত্তরাঞ্চল প্রাচীন ভারতের বিশাল মৌর্যরাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়েছিল। বর্তমান বগুড়ার মহাস্থানগড় ছিল এর রাজধানী। এই মৌর্যরাষ্ট্রের অন্যতম রাজা চন্দ্র গুপ্তের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কৌটিল্য। তাঁর রচিত অর্থশাস্ত্রের কথা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুমান করা হয়, কৌটিল্য প্রণীত রাজনৈতিক মতবাদ খ্রীষ্টের জন্মেরপরবর্তী শতাব্দী থেকে গ্রন্থিত হয়। সমকালীন ইতিহাসে শুধু নয়, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও কৌটিল্যের রাজনৈতিক মতবাদ এক অসাধারণ বিস্ময় বলেই রাজনীতি ও তাত্ত্বিকদের কাছে প্রতীয়মান হয়। প্রাচীন বাংলার রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও প্রশাসন চিত্র উদঘাটনে কৌটিল্যের মতবাদ একটি অন্যতম উপাদান হিসেবে স্মর্তব্য। এছাড়া রয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ ও স্মৃতিগ্রন্থ সমূহ। এসব প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক প্রশাসনের প্রামাণ্য দলিল।

৬.০ রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও ধারণা

৬.১ ইতঃপূর্বে সমাজ কাঠামোর আলোচনায় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যে 'গণ ও সঙ্ঘ' এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা ছিল অনেকটা আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 'প্রজাতন্ত্র' ধারণার মতো। এই ধারণা নিরবচ্ছিন্ন ছিল এমন কথা খুব জোর দিয়ে বলার অবকাশ কম। তবে এসব প্রজাতন্ত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিলঃ

(১) বংশানুক্রমিকভাবে এই সময় রাজা হওয়া যেত না

(২) গণ ও সঙ্ঘের পরিচালনায় রাষ্ট্রপ্রধান পদে নির্বাচন বা মনোনয়ন অনুষ্ঠিত হতো

(৩) প্রয়োজনবোধে এই গণ ও সঙ্ঘ রাষ্ট্রকর্তার অপসারণও করতে পারতো

(৪) রাষ্ট্রকর্তা প্রার্থীপদের জন্যে বহুগণের সম্পন্ন চরিত্রের প্রয়োজন হতো।

(৫) রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি নির্ধারণী বিষয়ে গণ ও সঙ্ঘই ছিল প্রধান নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী

(৬) নাগরিকদের জন্যে অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল, যদি নাগরিক রাষ্ট্রের আইন শৃংখলা পরিপন্থী কাজে জড়িত থাকতো অথবা আইন না মানতো

(৭) মৃত্যুদণ্ডেরও ব্যবস্থা ছিল, অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনার্থে।[১৩]

৬.২ উপরিউক্ত বর্ণনা মতে বোঝা যায়, গণ ও সঙ্ঘ ছিল অনেকটা পরিষদ সভার মতো। ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক যুগের খোলাফায়ে রাশেদিন কিংবা সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ধাঁচের পলিটব্যুরো অথবা সম্রাট আকবরের ধর্মসভার মতো ছিল এই গণ ও সঙ্ঘের চরিত্র। প্লেটোর রাষ্ট্রচিন্তার সাথেও এর চেতনাগত সাযুজ্য রয়েছে অনেকখানি। তবে এই গণ ও সঙ্ঘ ছিল ক্ষত্রিয় প্রাধান্যে গড়া। ব্রাহ্মণ অভিজাতরা এখানে সম্ভবতঃ খুব কমই পাত্তা পেতেন এ ধারণা অত্যন্ত সঙ্গত। ধীরে ধীরে অবশ্য ব্রাহ্মণরা অভিজাত পরিষদ প্রাধান্য পেতে থাকে।

৬.৩ তবে এই দুই পরিষদের ক্ষেত্রেই অভিন্ন আশ্রয় ঘটেছে শুদ্রদের সামাজিক–প্রশাসনিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে। দেখা গেছে, রাজনৈতিক ক্ষমতার অনেক দূরে রাখা হয়েছে শুদ্রদের। আর শুদ্ররা ছিল দেশের সাধারণ প্রজা, যারা রাজনৈতিক–প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধার বাইরে থেকেছে চিরটা কালই, আজকের মতো। নগর জীবনের বাইরে প্রবীণ সমাজে কথিত 'মুক্ত সদস্যরাই' ভোট দিতে পারতেন, দিন মজুরদের কোনো রাজনৈতিক অধিকার প্রশাসন ব্যবস্থা থেকে দেওয়া হয়নি।

৬.৪ কৌটিল্য প্রাচীন ভারতে যে রাজ্য শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তা আধুনিক দুনিয়ার জন্য এক বিস্ময়কর রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে স্বীকৃত হবে। ভাবতে অবাক লাগে যে, সেই প্রাচীনতম সময়েও প্রশাসন ব্যবস্থায় এই মতধারার প্রয়োগ ইচ্ছা কেমন করে সম্ভব হয়েছিল। এই রাষ্ট্র চিন্তা ও শাসন ব্যবস্থার মতবাদে বলা হয়েছিল ঃ

(১) প্রশাসন ব্যবস্থা সুবিন্যস্ত ও নিরাপদ রাখার জন্যে সামাজিক বৈষম্য টিকিয়ে রাখতে হবে।

(২) রাষ্ট্র শাসন বিজ্ঞানের ভিত্তি হবে শাস্তিদানের বিধান। অর্থাৎ এই প্রশাসনিক মতবাদে সাধারণ মানুষকে বশে রাখার সর্বোত্তম পন্থা হিসেবে শাস্তিদান অব্যাহত রাখাকেই উৎকৃষ্ট পথ বলে মনে করা হতো।

(৩) সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ, ক্ষোভ এবং বিক্ষোভকেই রাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল সেকালে। বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিপদের চেয়েও এটাকে আরো বেশী 'গুরুতর' বলা হয়েছিল।

(৪) রাজনৈতিক প্রশাসনে গোপন কুটকৌশলের প্রয়োগ শুরু হয় এই সময় থেকেই

(৫) গোয়েন্দা বিভাগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয় এবং এখান থেকেই তা গুরুত্বসহকারে গড়ে তোলা হয়।

(৬) রাজকর্মচারীদের মধ্যে উৎকোচ প্রথা চালু করা হয়।

(৭) সরকারী কর্মচারীরা যাতে পরস্পর মনোমালিন্য ও বিদ্বেষ মনোভাবে সর্বদা বিরাজিত থাকে, গোপনে প্রশাসন থেকে তার ব্যবস্থাও করা ছিল।

(৮) জনগণের ধর্মীয় অনুভূতি রাষ্ট্র ও প্রশাসন পরিচালনায় কাজে লাগানোর চিন্তাধারাও তাদের মধ্যে কাজ করেছে। রাষ্ট্রকর্তা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ও সৃষ্টিকর্তা রাষ্ট্র প্রধানের উপর সদয় আছেন এমন ধারণা ও মনোভাব প্রচারণার মাধ্যমে সৃষ্টি করা হতো সেকালে।

(৯) রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থায় যে পররাষ্ট্রনীতি অনুসৃত হয়েছিল তাতে দেখা যায়, 'শত্রুর শত্রু – বন্ধু' এই তত্ত্ব পরম ও চরমভাবে অনুসৃত হয়েছিল প্রাচীনকালে।[১৪]

৭.০ প্রশাসনিক কাঠামো

৭.১ এছাড়া শাসন কার্যাবলীর দিক থেকে প্রাচীন বাংলার রাষ্ট্রীয় প্রশাসন নিম্নোক্তভাবে নীচ পর্যন্ত বিভক্ত ছিলঃ

কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র–প্রশাসন
↓
ভুক্তি
↓
বিষয়
↓
মফল
↓
বীথি
↓
গ্রাম–প্রশাসন

৭.২ অর্থাৎ কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি বীথি প্রশাসন গঠিত হতো। কয়েকটি বীথি নিয়ে মফল এবং কয়েকটি মফল নিয়ে বিষয়, তারপর কয়েকটি বিষয় নিয়ে ভুক্তি গঠিত হতো। ভুক্তি ছিল কেন্দ্রীয় প্রশাসনের বৃহত্তম প্রশাসনিক বিভাগ।

৭.৩ ভুক্তির যিনি প্রশাসক ছিলেন তার পদবীর নাম ছিল উপরিক। বিষয় প্রশাসনের প্রধানের নাম ছিল বিচারপতি।

৭.৪ কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলের খবর পাওয়া যাচ্ছে প্রাচীন বাংলায়। তার প্রধানের পদবীর নাম ছিল বাহনায়ক। পুলিশ সার্ভিসের (শান্তিরক্ষক কর্মকর্তা) প্রধানের পদবী ছিল চৌরাদ্ধরণিক।

৭.৫ পাল আমলে এসেই প্রাচীন বাংলার প্রশাসন ব্যবস্থায় প্রথম মন্ত্রী ও সচিবের পদবীধারী রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তার সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য তারা ছিলেন রাজ পরিবারেরই লোক, রাজপুরুষ। প্রায় সকল উচ্চপদেই বংশানুক্রমিক রাজ পরিবার সদস্যদের নিয়োগ অব্যাহত ছিল।

৭.৬ রাজার জ্যেষ্ট পুত্রকে যুবরাজ উপাধি দেওয়া হয়েছিল (আজো রাজতন্ত্রে পরিচালিত দেশসমূহে এই প্রথা প্রচলিত আছে)। যুবরাজ সাবালক হলেই অভিষেক অনুষ্ঠিত হতো।

প্রাচীন বাংলায় এছাড়া যেসমস্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তা ছিলেন[১৫] ঃ

মহাকরণাধ্যক্ষ	ঃ	মুখ্য সচিব
মহামহত্তর	ঃ	স্বরাষ্ট্র সচিব
মহাসান্ধিবিগ্রহিক	ঃ	পররাষ্ট্র বিষয়ক সচিব
মহাসেনাপতি	ঃ	প্রতিরক্ষা বিষয়ক সচিব
মহাক্ষপটলিক	ঃ	অর্থ সচিব (অথবা মহাহিসাব রক্ষক)
মহাদণ্ডনায়ক	ঃ	প্রধান বিচারপতি
নৌকাধ্যক্ষ	ঃ	নৌবাহিনীর প্রধান
বলাধ্যক্ষ	ঃ	পদাতিক বাহিনীর প্রধান

৮.০ গ্রাম প্রশাসন

৮.১ তবে প্রাচীন বাংলার প্রশাসন ব্যবস্থার সবচেয়ে মজার তথ্য পাচ্ছি এখানে যে, সেই সময় গ্রাম প্রশাসনেরও অস্তিত্ব ছিল। ইতঃপুর্বে প্রশাসনিক বিভাগে আমরা দেখেছি, গ্রাম প্রশাসন হচ্ছে বুনিয়াদি প্রশাসন; সমগ্র কেন্দ্রীয় প্রশাসনে। এই গ্রাম–প্রশাসনের যিনি প্রধান ছিলেন তার উপাধি ছিল গ্রামিক। প্রাচীন বাংলার অনেক লিপিতে পঞ্চকল অষ্টকুল নামে বুনিয়াদি প্রশাসনের সংবাদ পাওয়া যায়। ধারণা করা হয়, মোট পাঁচজন প্রতিনিধি বা কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত প্রশাসনকে বলা হচ্ছে পঞ্চকুল। সম্ভবত এখানে থেকেই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসনের উদ্ভব। অষ্টকুল সম্ভবত একই ধাঁচের প্রশাসন, যার সদস্য সংখ্যা ছিল আটজন।

৮.২ আটশতকে পাল বংশের রাজত্বকালে গ্রাম প্রশাসনে আরো রদবদল ঘটে। এই সময় দশটি গ্রাম নিয়ে একটি গ্রামীন প্রশাসন গড়ে তোলার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, যার কর্তার নাম দশগ্রামিক। আবার চারটি গ্রাম নিয়েও কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রামীণ বুনিয়াদি প্রশাসনের অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে, এই প্রশাসনের প্রধানের নাম চতুরক। এটা সেন – বর্ম রাজাদের আমলে ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয়।[১৬]

৯.০ চর্যাপদ দলিল অনুযায়ী আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

৯.১ প্রাচীন বাংলার সমাজ কাঠামো, রাষ্ট্রচিন্তা ও প্রশাসন চিত্র উদঘাটনে 'চর্যাপদ' কাব্য প্রাচীনতম দলিল হিসেবে স্বীকৃত হতে পারে। 'চর্যাপদ' গ্রন্থখানি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেরও প্রাচীনতম দলিল। এর আগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রূপ কেমন ছিল তা এখনো আবিষ্কৃত হয়নি।

৯.২ তবে বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনের ইতিহাস সন্ধানের এ অবিস্মরণীয় দলিলটি কিন্তু বাংলাদেশে পাওয়া যায়নি, পাওয়া গিয়েছিল নেপালে। কেন এর পাণ্ডুলিপি নেপালে পাওয়া গিয়েছিল তার কারণ অনুসন্ধানেও প্রাচীন বাংলার প্রশাসন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার ইতিহাসকে উন্মোচিত করে।

৯.৩ চর্যাপদের রচনাকালে তৎকালীন বাংলার রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে চরম অশান্তি ও দুর্যোগ নেমে এসেছিল। বিপর্যস্ত এই আর্থ-সামাজিক, পরিস্থিতির নাম দেওয়া হয়েছিল 'মাৎস্যন্যায়'। বৌদ্ধদের উপর সেদিন নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রশাসকবর্গ। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ঘোরতর অবনতির মুখে দলে দলে বৌদ্ধরা বাংলাদেশ ত্যাগ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আশ্রয় নেয়। যাওয়ার সময় তারা তাদের রচিত পান্ডুলিপিও সংগে নিয়ে গিয়েছিলেন। বৌদ্ধদের রচিত এই প্রমাণ্য দলিল চর্যাপদ তাই পাওয়া গিয়েছিল নেপালে।

৯.৪ চর্যাপদের মতো গ্রন্থেও প্রাচীন বাংলার এই গুরুতর প্রশাসনিক সংকটের কথা রূপকের মাধ্যমে চিত্রায়িত হয়েছে। গ্রন্থের ৩৩ নম্বর চর্যায় সেই সময়ের এই মর্মন্তুদ পরিস্থিতির বর্ণনায় বলা হচ্ছে, শেয়ালের মতো ক্ষুদ্র প্রাণীও রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। (নিতি শিআলা সিহেসম যুজই)।[১৭]

৯.৫ নগরের যিনি কোটাল যার কাজ নগরবাসীকে রক্ষা করা, দেখা যাচ্ছিল সেই সময়টায় সে-ই চোরের ভূমিকায় অবতীর্ণ। ('জো সো চোর, সোহি সাধী' অর্থাৎ যে চোর সেই দুষাধী= কোটাল)।[১৮] সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, পচন লেগেছিল প্রশাসনের অন্দর মহলেই। নগর মানুষের জীবনের নিরাপত্তা দিতে প্রশাসন তাই ব্যর্থ হচ্ছিল।

৯.৬ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির এই রকম আরো অবনতির খবর আছে আরেকটি চর্যায়, যেখানে বলা হচ্ছে, একজন নতুন বউয়ের কানের দুল ছিনতাইকারী নিয়ে গেল ('কানেট চোরে নিল কানই মাগই')[১৯] পথে ডাকাত পড়ার ভয় করছে একজন সাধারণ মানুষ ('বাটত খান্টবি বলআ')।[২০] এতে বোঝা যায়, প্রাচীন বাংলায় আইন শৃংখলা পরিস্থিতি যুগপৎ ঘরে ও বাইরে ভেঙ্গে পড়েছিল। সাধারণ নাগরিকের সামাজিক নিরাপত্তা ও জীবনের নিরাপত্তা দিতে তৎকালীন প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছিল।

৯.৭ দেশে আইনের শাসনের অভাবে প্রশাসনে দেখা দিয়েছিল এভাবে শিথিলতা, ফলে 'গুণ্ডাবদমাশের' স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল স্বদেশ। সেই প্রাচীন কাব্যেও 'গুণ্ডা' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় স্বচ্ছন্দে (গুরুবঅন বিহারে রে থাকিব তই খুণ্ড কইসে')।[২১]

এমন একটা পরিস্থিতিতে যা হবার তাই হলো। সমগ্র বঙ্গ দেশই লুণ্ঠিত হলো (অদঅ বাঙ্গাল দেশ লুড়িউ')।[২২]

১০.০ রাজা সংবাদ

১০.১ তবু রাজা ছিল, ছিল তার মন্ত্রী। কিন্তু সেখানেও দেখা যায় অরাজকতা, অনিয়ম। মন্ত্রী নিজে রাজাকে বিভিন্ন কাজে বাধা দিচ্ছেন, রাজাকে মন্ত্রী দ্বারা নিবৃত্ত হওয়ার কথা আছে একটি পদে ('মতিঁএ ঠাকুরক পরিনিবিত্তা')। বোঝা যায়, প্রশাসন ব্যবস্থা তার স্বাভাবিক গতি হারিয়েছিল।[২৩]

১০.২ এমন রাজা সম্পর্কে জনগণেরও প্রশ্ন ছিল, আস্থা ছিল না তাঁর প্রতি সাধারণ নাগরিকের। কারণ তার থেকে কোনো সুফল মানুষ দেখতে পাচ্ছিলো না। রাজা মোহ দ্বারা আবদ্ধ অথবা ভোগ বিলাসে মত্ত এমন অভিযোগ রয়েছে চর্যার পদসমূহে ('রাআ রাআরে, অবর রাঅ মোহেঁর বাধা')।[২৪]

১০.৩ রাজা কর্তৃক শাসন পাট্টা দান বা জারী করার প্রথা প্রচলিত ছিল প্রাচীন বাংলায় সেটা বোঝা যায়। কিন্তু প্রশাসনিক শৃংখলা ও শাসন ব্যবস্থা যেখানে এইরূপ সেখানে শাসন পাট্টার অস্তিত্ব থাকে কিভাবে। তাই একটি পদে উল্লেখিত হয়েছে শাসন পাট্টা গড়ে যাওয়ার কথা (দগ্ধ হাল নবগুন শাসন পাট্টা')[২৫]

১০.৪ ডঃ আনিসুজ্জামান চর্যাপদে প্রাচীন বাংলার প্রশাসন ব্যবস্থা প্রসঙ্গে বলেছেন, চর্যাপদে 'রাজার উল্লেখ আছে বটে, তবে তিনি শাসন পাট্টা দান করা ছাড়া শান্তিকালে আর কি করতেন, তা বোঝা যায় না'। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, 'যুদ্ধের সময়ে তারা সেনামণ্ডল তুর্য শঙ্খধ্বনি করে যাত্রা করতেন। তাঁদের মধ্যে অশ্বারাহী সেনা থাকতো। বিপক্ষের দুর্গ বা প্রধান স্থান জয় করতে পারলে বিজয় নিশ্চিত হতো।'[২৬]

১০.৫ চর্যাপদ সাহিত্য দলিলে প্রাচীন বাংলার প্রশাসন, রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও আইন শৃংখলা পরিস্থিতির যে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, ডঃ নীহাররঞ্জন রায় সমসাময়িক অন্যান্য দলিলযোগে তার স্বীকৃতি দিচ্ছেন। তিনি বলেনঃ–

> 'তারনাথের বিবৃতিমতে' ললিতচন্দ্রের মৃত্যুর পর সমগ্র বাংলাদেশ জুড়িয়া অভূতপূর্ব নৈরাজ্যের সূত্রপাত হয়। গৌড়–বঙ্গ–সমতটে তখন আর কোন রাজার আধিপত্য নাই, রাষ্ট্র ছিন্ন–বিচ্ছিন্ন, ক্ষত্রিয়, বণিক, ব্রাহ্মণ, নাগরিক স্ব স্ব গৃহে সকলেই রাজা। আজ একজন রাজা হইতেছেন, কাল তাঁহার ছিন্ন মস্তক ধুলায় লুটাইতেছে। ইহার চেয়ে 'নৈরাজ্যের বাস্তব চিত্র আর কী হইতে পারে।'[২৭]

১১.০ প্রাচীন বাংলার ভূমি ব্যবস্থা

১১.১ প্রাচীন বাংলার প্রশাসন ব্যবস্থার অন্যতম দিক হচ্ছে ভূমি প্রশাসনের স্বরূপ। তৎকালীন বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা সমকালীন সামাজিক ও প্রশাসনিক বিন্যাসকেও

চিহ্নিত করে। এসব চিত্র উদঘাটনে যেসব প্রামাণ্য কাগজপত্র ইতিহাস হিসেবে কাজ করেছে তার প্রধান হচ্ছেঃ

১. রাজাদের ভূমি দান পত্র
২. রাজকীয় ভূমি বিক্রয় দলিল } তাম্র পট্টোলী
৩. প্রাচীনতম স্মৃতি শাস্ত্র
৪. কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র
৫. সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্নগ্রন্থ
৬. পালি ভাষায় রচিত জাতক গ্রন্থাদি
৭. হিন্দু পুরাণ, বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি।

১১.২ তবে প্রাপ্ত তথ্যাদি নির্ভর ভূমি ব্যবস্থার চিত্রসমূহ নিখিল বাংলার সর্বত্র নির্বিচারে সত্য ছিল একথা হলফ করে বলা সম্ভব নয়। কারণ একটি উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে, আজো বাংলাদেশের ভূমি মানের একক সর্বজনীন নয়। কোনো এলাকায় জমির গণ্ডার হিসাব, কোথাও কানি, কোথাও পাখি, কোথাও বিঘা, আবার কোথাও কাঠার হিসেব প্রচলিত রয়েছে। অবশ্য তথ্য প্রমাণাদি থেকে এই বিষয়টি প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন বাংলার ভূমি ব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রীয়ভাবে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। প্রাচীন বাংলার ভূমি নীতির প্রধান বিষয়গুলি সূত্রায়ন করলে দাঁড়ায়ঃ

(১) ভূমি ক্রয় বা বিক্রয়ের পূর্বে রাজ সরকারের কাছে আবেদন করতে হতো

(২) প্রাচীন বাংলার ভূমি ক্রয় বা বিক্রয়ের প্রধান ইচ্ছাই দেখতে পাওয়া যায় ধর্মীয় প্রেরণা তথা দেবতা-তুষ্টি

(৩) রাজ সরকারের পক্ষ থেকে যিনি ভূমি ব্যবস্থা সংরক্ষণ করতেন তার পদবী ছিল পুস্তপাল। পুস্তপাল ক্রয়-বিক্রয় প্রক্রিয়া শুরু করার পূর্বে আগে এই বিষয়টি সুরাহা করে নিতেন যে জমিটি অন্য আর কেউ ক্রয় করতে ইচ্ছুক ছিলেন কিনা।

(৪) পুস্তপাল জমির মূল্য যথাযথ আছে কিনা এবং তাতে রাজ সরকারের স্বার্থ মিটেছে কিনা তাও নিরীক্ষণ করতেন।

(৫) এরপরই প্রস্তাবিত জমিখানি 'রেজিষ্টী' করা হতো। প্রাচীন বাংলার ভূমি প্রশাসনে এই 'রেজিষ্টীকে' বলা হয়েছে, 'পট্টীকৃত'।

(৬) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে প্রাচীন বাংলার ভূমি নীতিতে আরেকটি অতিরিক্ত তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে যিনি ভূমি কিনছেন, তাকে ভূমির মূল্যের ওপর রাজ সরকারে ক্রুটি করও দিতে হবে।

(৭) তবে প্রাচীন বাংলার ভূমি প্রশাসনের ইতিহাসে এই কর আদায়ের ঘটনা নেই বললেই চলে। কারণ ব্যক্তিগত কারণে অর্থাৎ সম্পত্তি বৃদ্ধির মানসে জমি বিক্রয়ের কোনো অবকাশ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দেখা যাচ্ছে না। কারণ সকল জমির মালিকই হচ্ছে একমাত্র রাজা। রাজা কোন গৃহস্থকে নেহাৎ সম্পত্তি বৃদ্ধির মানসে ভূমি ক্রয়ের

সুযোগ দানের বিষয়টি প্রাচীন যুগে অবান্তর। তবে ক্রয়–বিক্রয়ের এই বিষয়গুলি নিছকই ধর্মীয় প্রেরণায় এই যে, ধর্মাচরনোদ্দেশ্যে এসব জমি প্রাচীন বাংলায় ক্রয়–বিক্রয় হচ্ছে এবং এখানে সমস্ত জমিই বিক্রি করছেন একমাত্র রাজা। অনেক ক্ষেত্রেই এসব ক্রয় বিক্রয় ছিল দানমাত্র। আর এ দানের প্রধান পাত্র অর্থাৎ দান গ্রহিতা ছিলেন মূলতঃ ব্রাহ্মণরাই। রাজা তাদের বিভিন্ন সময়ে গ্রামের পর গ্রাম লিখে দিচ্ছেন এ জন্যে যে, ব্রাহ্মণরা ধর্ম রক্ষার্থে এ জমির আয় ও অন্যান্য বিষয় ব্যবহারকরবেন।

১১.৩ সিলেট জেলার ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত গোবিন্দ কেশব দেবের লিপি থেকে বোঝা যায়, রাজা স্বেচ্ছায়ই ধর্ম প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্যে ভূমি দান করেছেন। দেবোত্তর সম্পত্তির মূল নির্বাহী ব্রাহ্মণের নামে এর দলিল সম্পন্ন হচ্ছে।[২৮]

১১.৪ ভাবতে অবাক লাগে যে, প্রাচীন বাংলায় সপ্তম শতকের পরে সাধারণভাবে কোনো সাধারণ মানুষ বা গৃহস্থকে জমি বিক্রি করতে দেখা যাচ্ছে না। সর্বত্রই এই কার্য সম্পাদন করছেন রাষ্ট্রীয় প্রশাসন কিংবা রাজা স্বয়ং। অনুমান করতে বাধা নেই যে, –সপ্তম শতকের পরে প্রাচীন বাংলায় সাধারণ মানুষের সেই অধিকার ছিল না। সপ্তম শতকের পূর্বে প্রাচীন বাংলায় অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ গৃহস্থকে ভূমি ক্রয়–বিক্রয়ে অংশ নিতে দেখা যাচ্ছে। যেহেতু পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভূমি ক্রয়–বিক্রয়ের পুরো বিষয়টি ছিল ধর্মকে কেন্দ্র করে 'সেহেতু এরূপ সিদ্ধান্তে আসা খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, সপ্তম শতকের পরে ব্যক্তি জীবন–যাপনের থেকে ধর্ম রাষ্ট্রীয় আচ্ছাদনে পরিণত হয়।

১২.০ রাজস্ব নীতি

১২.১ ভূমি প্রশাসনের এক্ষেত্রে একটি মূল সমস্যা ছিল এই যে, রাজা যখন ভূমি দান করতেন (দেবোত্তর অথবা অন্য যে কোনো কারণে) তখন পুরো গ্রামবাসীকে কর অথবা অন্য যে কোনো সেলামী কিংবা উৎপাদিত শস্যের ভাগ ইত্যাদি দিতে হতো দান গ্রহীতা ব্যক্তিকেই, রাজাকে আর নয়।

১২.২ ভূমি প্রশাসনের একটি মূল বিষয় ছিল করনীতি। কর ব্যবস্থায় ভাগ, ভোগ, কর ও হিরণ্য নামে চার প্রকার পদ্ধতিই ব্যবহৃত হতো। নিম্নোক্ত বিষয়গুলি ছিল সাধারণ কর–নীতির অতিরিক্তঃ

১. দশ রকম অপরাধের কোনো অপরাধে অপরাধী হলে জমিমানা কর প্রচলিত ছিল
২. হাট, বাজার, খেয়াঘাট ইত্যাদিতে কর প্রথা চালু ছিল
৩. চোর–ডাকাত থেকে রক্ষণাবেক্ষণের কর (বর্তমানের চৌকিদারী–ট্যাক্সের অনুরূপ)
৪. 'পীড়া' কর চালু ছিল রাজার বিশেষ বিশেষ কার্য উপলক্ষে
৫. রাজপুত্রের জন্ম, রাজকন্যার বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষেও কর বসতো প্রজার উপরে।[২৯]

১৩.০ উপসংহার

এভাবে প্রাচীন বাংলার একটি রাজনৈতিক–প্রশাসনিক সমাজ চিত্রের আভাস আমরা পাচ্ছি। তবে প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক –প্রশাসনিক ইতিহাসের সব খবর ও তথ্য, আবিষ্কৃত হয়ে গেছে এমন কথা জোর দিয়ে বলা সম্ভব নয়। তবে শত শত বছর পরেও প্রাচীন বাংলার সমাজ কাঠামো রাষ্ট্রচিন্তা ও প্রশাসন এবং ভূমি ব্যবস্থার হাল এই অতি আধুনিক সমাজেও অনুসৃত, একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। 'আবহমান বাংলা' বলে যে ঐতিহ্যিক চেতনার কথা বলা হয়, তা বোধ হয় এই ক্ষেত্রেও ধারাবাহিকভাবে রাষ্ট্র কাঠামো ও রাষ্ট্র চিন্তায় নিয়তই প্রবহমান একথা অত্যন্ত জোরের সাথে বলা চলে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. ঋগ্বেদ সংহিতা (প্রথম খন্ড), রমেশ চন্দ্র দত্ত অনুদিত, পঞ্চম মন্ডল, ১৮ সুক্ত, পৃষ্ঠা ২৮২

২. অতুল সুর, বাংলার সামাজিক ইতিহাস (কলকাতা, ১৯৭৬), পৃষ্ঠা, ১৩

৩. ঋগ্বেদের চতুর্থ মন্ডলের ২৮ সুক্তে বলা হয়েছে 'ইন্দ্র মধ্যাহ্নের পূর্বে সংগ্রামে দস্যুদিগকে বধ করিয়াছেন এবং অগ্নি কতকগুলিকে দগ্ধ করিয়াছেন।' (ঋগ্বেদ সংহিতা, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৫২)। এছাড়া , দশম মন্ডলের ২৩ সুক্তে আরো কড়া সুরে বলা হচ্ছে, 'আমি দাস অর্থাৎ দস্যু জাতির নাম পর্যন্ত উঠাইয়া দিতেছি'। (ঋগ্বেদ সংহিতা, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৩৩)।

৪. অতুল সুর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮

৫. ঋগ্বেদ সংহিতা (দ্বিতীয় খন্ড, পূর্বোক্ত, দশম মন্ডল ১০ সুক্ত), পৃষ্ঠা ৭০৩

৬. ফিউদর করোভকিন, পৃথিবীর ইতিহাস (প্রাচীন যুগ), প্রগতিপ্রকাশন, মস্কো (বাংলা অনুবাদ ১৯৮৩), পৃষ্ঠা ১১৭

৭. ঐ, পৃষ্ঠা ১১৭

৮. অরবিন্দ পোদ্দার, মানব ধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, (তৃতীয় মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৯৮১) পৃষ্ঠা, ৭

৯. The History of Bengal, Vol. I (Hindu Period), edited by R. C. Majeimder (University of Dacca, 1943), P 578

১০. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালির ইতিহাস, (আদিপর্ব, জ্যোৎস্না সিংহরায় কর্তৃক সংকলিত, কলিকাতা, ১৩৮২) পৃষ্ঠা ১৬০–১৬১

১১. ভারতবর্ষের ইতিহাস, পুর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩২–১৩৪

১২. অজয় রায়, বাংলা ও বাঙ্গালী (ঢাকা, বালা একাডেমী, ১৯৭৭), পৃষ্ঠা ১৪১

১৩. ভারত বর্ষের ইতিহাস, পুর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৩২–১৩৪

১৪. ঐ পৃষ্ঠা ১৩৯–১৪১

১৫. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, পুর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৮–৭৫

১৬. ঐ পৃষ্ঠা ৬৮–৭৫

১৭. মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত, চর্যাগীতিকা (ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৬৩), পদ নং ৩৩, পৃষ্ঠা ১৫১

১৮. ঐ পৃষ্ঠা ১৫১

১৯. ঐ, পদ নং ২ পৃষ্ঠা ৬৫

২০. ঐ, পদ নং ৩৮, পৃষ্ঠা ১৬৬

২১. ঐ পদ নং ৩৯, পৃষ্ঠা ১৬৯

২২. ঐ, পদ নং ৪৯, পৃষ্ঠা ১৯১

২৩. ঐ পদ নং ১২, পৃষ্ঠা ৯৬

২৪. ঐ পদ নং ৩৪, পৃষ্ঠা ১৫৫

২৫. ঐ, পদ নং ৪৭, পৃষ্ঠা ১৮৯

২৬. আনিসুজ্জামান, স্বরূপের সন্ধানে (ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৭৬) পৃষ্ঠা ২৪

২৭. নীহার রঞ্জন রায়, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৪১

২৮. ঐ, পৃষ্ঠা ৯৮–১২১

২৯. ঐ, পৃষ্ঠা ১২৯

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৭ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, আশ্বিন ১৪০৩

বাংলাদেশের সংবিধানে নির্বাহী ক্ষমতার বিন্যাস

মোহাম্মদ আলী*

১.০ ভূমিকা

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর দীর্ঘ ২৫ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এ সময় বাংলাদেশের জনগণ কখনো রাষ্টপতিকে আবার কখনো প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে দেখেছেন। কখনো দেখা গেছে রাষ্টপতি শুধুই রাষ্টপ্রধান, সরকার প্রধান রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্বেই রাষ্ট পরিচালিত হচ্ছে। আবার কখনো দেখা গেছে রাষ্টপতি একাধারে রাষ্টপ্রধান ও সরকার প্রধান। তিনিই একচ্ছত্র অধিপতি, প্রধানমন্ত্রী শুধু একজন মন্ত্রী মাত্র। তার মন্ত্রীত্বও রাষ্টপতির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কেন এমন হয় ? এ প্রশ্নের উদ্রেক হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এ প্রসংগে বলা প্রয়োজন যে, এটি নির্ভর করে সংবিধানে রাষ্টের নির্বাহী কর্তৃত্ব কার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে, তার ওপর। যেমন দ্বাদশ সংশোধনীতে প্রধানমন্ত্রীর হাতে রাষ্টের নির্বাহী ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। এর ফলে রাষ্টপতির পদটি একটি আলংকারিক পদে পরিণত হয়েছে। তবে কি রাষ্টপতির কোন কর্তৃত্ব নেই? এই প্রশ্ন দেখা দেয়া খুব প্রাসংগিক। বিশেষতঃ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধন আইন অনুমোদিত হওয়ার পর এই প্রশ্নটি আরো বেশী তাৎপর্য অর্জন করেছে। সংবিধানের আলোকে এই বিষয়টি পর্যালোচনা করাই এই রচনার উদ্দেশ্য।

২.০ নির্বাহী ক্ষমতা/কর্তৃত্ব

২.১ সরকারের তিনটি বিভাগ–আইনসভা, বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগের মধ্যে–নির্বাহী বিভাগ হলো অন্যতম। নির্বাহী শব্দটি ইংরেজী executive শব্দের সমার্থক। Longman Dictionary of Contemporary English গ্রন্থে বলা হয়েছে Executive is concerned with making and carrying out decisions. আইনসভা আইন প্রণয়ন করে, বিচার বিভাগ আইনানুযায়ী বিচার করে। এ দু'য়ের মাঝে সরকারের যে সব কর্মকান্ড তা পরিচালনা করে নির্বাহী বিভাগ। এক সময় রাষ্টের দায়িত্ব ছিলো শুধু শৃংখলা রক্ষা করা। তখন নির্বাহী বিভাগের দায়িত্ব

* এষ্টেট অফিসার, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

ছিলো সীমিত। আজ রাষ্ট্রের দায়িত্ব বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সকল প্রকার উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডের কর্ণধার আজ সরকার। সেই কাজের ভার নির্বাহী বিভাগের ওপর ন্যস্ত। বাংলাদেশের সংবিধানে নির্বাহী বিভাগ নামে একটি ভাগ আছে। এই ভাগে মূলতঃ নির্বাহী বিভাগের গঠন, দায়িত্ব ও ক্ষমতার বিবরণ দেয়া হয়েছে।

২.২ নির্বাহী বিভাগের শীর্ষে রয়েছেন রাষ্ট্রপতি এরপর প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রীসভা। তারপর রয়েছেন সরকারী কর্মচারীবৃন্দ।

৩.০ সংবিধান অনুযায়ী নির্বাহী ক্ষমতা

বাংলাদেশের সংবিধানের মোট ৪৫টি অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতিকে নির্বাহী ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। তবে এগুলো মূলত ঃ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা। কারণ সংবিধানে ৪৮ অনুচ্ছেদের ৩ দফায় বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন। নিম্নে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা/কর্তৃত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

৪.০ নির্বাহী বিভাগ সংক্রান্ত ক্ষমতা/কর্তৃত্ব

৪.১ রাষ্ট্রপতির অন্যতম নির্বাহী কর্তৃত্ব হল প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ। ৫৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে সংসদ সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজন বলে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হবেন রাষ্ট্রপতি তাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন এবং প্রধানমন্ত্রী যেরূপ নির্ধারণ করবেন সেরূপ সংখ্যক অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ–মন্ত্রী নিয়োগ করবেন।

৪.২ অনুচ্ছেদ ৬৪(১)–এ বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হওয়ার যোগ্য কোন ব্যক্তিকে এটর্নি জেনারেল নিয়োগ করবেন, ৬৪(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে এটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করবেন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত হারে পারিশ্রমিক পাবেন এবং রাষ্ট্রপতির সন্তোষ অনুযায়ী স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।

৪.৩ রাষ্ট্রপতি কোন আদালত, ট্রাইবুনাল বা অন্যকোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যেকোন দণ্ড মওকুফ, হ্রাস এবং স্থগিত করতে পারেন, যেকোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্ব এবং বিরাম মঞ্জুর করতে পারেন। সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রপতিকে এই এখতিয়ার দেয়া হয়েছে।

৪.৪ অনুচ্ছেদ ৫৫(৫)–তে বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতির নামে প্রণীত আদেশ অন্যান্য চুক্তিপত্র কিভাবে সত্যায়িত হবে রাষ্ট্রপতি তা বিধি বিধানের মাধ্যমে নির্ধারণ করবেন।

৪.৫ সংবিধানের ৬১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে বাংলাদেশে প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত থাকবে। আইনের দ্বারা প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ নিয়ন্ত্রিত হবে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকাররের দায়িত্ব পালনকালে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উক্ত আইন প্রযুক্ত হবে।

৫.০ আইনসভা/আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা

৫.১ অনুচ্ছেদ ৭২(১) অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সরকারী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংসদ আহ্বান, স্থগিত ও ভঙ্গ করবেন। সংসদ আহ্বান কালে রাষ্ট্রপতি প্রথম অধিবেশনের তারিখ ও সময় নির্ধারণ করবেন। তবে শর্ত এই যে, বর্ণিত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর লিখিত পরামর্শ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন। ৭২(৪) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সংসদ ভঙ্গ হওয়ার পর পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে যুদ্ধজনিত কারণে রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনক ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সংসদ পুনরাহ্বান করা প্রয়োজন তাহলে তিনি ভেঙ্গে দেয়া সংসদ আহবান করতে পারবেন।

৫.২ অনুচ্ছেদ ৭৩(১) এ বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণদান এবং বাণী প্রেরণ করতে পারবেন। ৭৩(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক বছরের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় সংসদে ভাষণ দেবেন।

৫.৩ সংসদ আহবান, ভঙ্গ ও ভাষণ দান সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়েও রাষ্ট্রপতির হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের পর তা আইনে পরিণত হয়। ৮০(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সংসদ কর্তৃক কোন বিল গৃহীত হলে তা সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করতে হবে। রাষ্ট্রপতি কোন বিলে (অর্থ বিল ব্যতীত) সম্মতি নাও দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাঁকে বিলটি পুনর্বিবেচনার জন্য একটি বার্তাসহ সংসদে ফেরৎ পাঠাতে হবে। অবশ্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে বিলটি যদি পুনরায় গৃহীত হয় সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রয়োজন হবে না। অর্থ বিল সংক্রান্ত বিষয়ে বলা হয়েছে যে, সরকারী অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে এমন কোন অর্থ বিল বা বিল রাষ্ট্রপতির অনুমতি ছাড়া সংসদে উথাপন করা যাবে না।

৫.৪ আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষমতা। ৯৩(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার পর বা সংসদ অধিবেশনরত না থাকা অবস্থায় রাষ্ট্রপতির নিকট আশু ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে বলে প্রতীয়মান হলে তিনি অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করতে পারবেন। এরূপ অধ্যাদেশ সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হবে। তবে সংসদের পরবর্তী প্রথম অধিবেশনে উক্ত অধ্যাদেশ অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে। সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত না হলে কিংবা সংসদে উথাপনের পর ত্রিশ দিন অতিবাহিত হলে অধ্যাদেশ রহিত বলে গণ্য হবে।

৬.০ বিচার বিভাগ সংক্রান্ত ক্ষমতা

৬.১ সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী তাঁর সকল দায়িত্ব পালন করবেন বলে বিধান রয়েছে। কিন্তু দু'টো ক্ষেত্রে এরূপ পরামর্শ প্রয়োজন হবে না। প্রথমটি হলো প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টি হলো প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে। প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে শর্ত হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করতে হয়। কিন্তু প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সংবিধানের কোন শর্ত আরোপ করা হয়নি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি একক ক্ষমতার অধিকারী। এছাড়া অন্যান্য বিচারকগণও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। সুপ্রীম কোর্টের দু'টো বিভাগ অর্থাৎ হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগের বিচারক সংখ্যাও রাষ্ট্রপতি নির্ধারণ করেন। এ ছাড়া রাষ্ট্রপতি এ দু'টো বিভাগের জন্য অতিরিক্ত বিচারকও নিয়োগ করতে পারেন। এ ছাড়া রাষ্ট্রপতি কোন বিচারকের শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্য কিংবা অসদাচরণ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ তদন্ত করার জন্য সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে অনুরোধ করতে পারবেন। তদন্তে অসামর্থ্য বা অসদাচরণ প্রমাণিত হলে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট বিচারককে অপসারণ করবেন।

৬.২ সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের আসন থাকবে। তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে যেরূপ স্থানসমূহ নির্ধারণ করবেন সেরূপ স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে পারবে।

৬.৩ অনুচ্ছেদ ১১৫ তে বলা হয়েছে বিচার কর্মবিভাগে বা বিচারবিভাগীয় ম্যাজিষ্ট্রেট পদে বিধি অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করবেন। ১১৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে বিচার কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনরত ম্যাজিষ্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি ও ছুটি মঞ্জুরী ও শৃঙ্খলা বিধান) রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত থাকবে। রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে তা প্রয়োগ করবেন।

৭.০ কর্মবিভাগ সংক্রান্ত এখতিয়ার

প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী সংসদের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে বলে সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে। একই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সংসদ কর্তৃক উক্ত আইন প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণপূর্বক বিধিসমূহ প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকবে। এছাড়া ১৩৪ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ রাষ্ট্রপতির সন্তোষ অনুযায়ী স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। সংবিধানের ১৩৮(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সরকারী কর্মকমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। ১১৩৮(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে কর্মকমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যের কর্মের শর্তাবলী

রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করবেন সেরূপ হবে। ১৪১(১) অনুচ্ছেদে অনুযায়ী কর্মকমিশন প্রতি বছর মার্চ মাসের প্রথম দিনে তার পুর্ববর্তী একত্রিশে ডিসেম্বর সমাপ্ত এক বছরের রিপোর্ট রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করবেন। ১৪১(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি উক্ত রিপোর্ট সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে উপস্থাপন করবেন।

৮.০ জরুরী অবস্থান সংক্রান্ত নির্বাহী ক্ষমতা

মূল সংবিধানে জরুরী অবস্থা ঘোষণার কোন বিধান ছিলো না। পরবর্তীতে সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধন আইন ১৯৭৩ এর মাধ্যমে জরুরী অবস্থা ঘোষণার বিধান রাখা হয়। উক্ত আইনের মাধ্যমে সংবিধানে নবম 'ক' ভাগ (অনুচ্ছেদ ১৪১ ক, ১৪১ খ এবং ১৪১(গ) সংযোজন করা হয়। ১৪১ক অনুচ্ছেদে বলা হয় রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এমন জরুরী অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে, যাতে যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা তার কোন অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন তাহলে তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন। তবে শর্ত থাকে এরূপ ঘোষণার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষর প্রয়োজন হবে।

৯.০ অন্যান্য এখতিয়ার

৯.১ অন্যান্য এখতিয়ারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মহা–হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিয়োগ এবং চুক্তি সম্পাদন। ১২৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের জন্য একজন মহা–হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নিয়োগ ও তার কাজের শর্তাবলী নির্ধারণ করবেন। ১৩১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে মহা–হিসাব নিরীক্ষক যেরূপ নির্ধারণ করবেন সেইরূপ পদ্ধতিতে প্রজাতন্ত্রের হিসাব রক্ষিত হবে। ১৩২ অনুচ্ছেদে প্রজাতন্ত্রের হিসাব সংক্রান্ত মহা–হিসাব নিরীক্ষকের রিপোর্ট রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হবে, রাষ্ট্রপতি তা সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করবেন।

৯.২ অনুচ্ছেদ ১৪৫–এ বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে প্রণীত সকল চুক্তি ও দলিল রাষ্ট্রপতির কর্তৃক প্রণীত বলে প্রকাশ করা হবে এবং রাষ্ট্রপতি যেইরূপ নির্দেশ ও ক্ষমতা প্রদান করবেন তাঁর পক্ষে সেরূপ ব্যক্তি কর্তৃক সেরূপ পদ্ধতিতে তা সম্পাদিত হবে। বিদেশের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করতে হবে এবং রাষ্ট্রপতি তা সংসদে পেশ করার ব্যবস্থা করবেন। চুক্তিটি জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট হলে তা সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করা হবে।

১০.০ ত্রয়োদশ সংশোধনী ও নির্বাহী ক্ষমতা

১০.১ ১৯৯৬ সালের ২৮ শে মার্চ তারিখে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধন আইন ১৯৯৬ অনুমোদিত হয়। এতে বলা হয়েছে যে, সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার পর বা সংসদের মেয়াদ অবসানের পর একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে। নতুন সংসদ গঠিত

হওয়ার পর নতুন প্রধানমন্ত্রী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত উক্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বহাল থাকবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক বা তার কর্তৃত্বে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হবে। অর্থাৎ সাধারণভাবে প্রধানমন্ত্রী যেসব ক্ষমতার অধিকারী প্রধান উপদেষ্টার ক্ষমতাও তাই। ৫৮গ (১১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টাগণ যথাক্রমে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণের পদমর্যাদা এবং পারিশ্রমিক ও সুযোগ সুবিধা লাভ করবেন।

১০.২ তবে ৫৮খ(১)অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদন করবেন। কোন নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। এছাড়া সংবিধানের ৬১ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদকালে প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগের নিয়ন্ত্রণ রাষ্টপতির হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান উপদেষ্টার নির্বাহী কর্তৃত্ব সর্বাংশে সমান নয়।

১১.০ সংসদ ও নির্বাহী কর্তৃপক্ষ

সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় নির্বাহী বিভাগ অর্থাৎ মন্ত্রীসভা মূলতঃ সংসদ সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয়। মন্ত্রীসভা সংসদের নিকট দায়ী থাকে। সংসদে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। সংবিধানের ৫৫(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ি থাকবে। তবে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের একটি রক্ষাকবচ আছে। ৫৭(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার জন্য রাষ্টপতিকে অনুরোধ করতে পারেন।

১২.০ বিচার বিভাগ ও নির্বাহী কর্তৃপক্ষ

সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদে বিচার বিভাগকে বিশেষ এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। এটিকে writ Jurisdiction বলে। এর মাধ্যমে হাইকোর্ট বিভাগ প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃপক্ষকে/স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে কোন কাজ করার বা না করার নির্দেশ দিতে পারে। এছাড়া উক্ত কর্তৃপক্ষের কোন কাজকে আইনগত এখতিয়ার বহির্ভূত হিসেবে ঘোষণা করতে পারে। সর্বোপরি বেআইনীভাবে আটক কোন ব্যক্তির আটকাদেশ রহিত করতে পারে। সংসদে প্রণীত কোন আইন সংবিধানের পরিপন্থী হলে বিচার বিভাগ সেটিকে বাতিল ঘোষণা করতে পারে। এ প্রসংগে সংবিধানের অষ্টম সংশোধন আইনের ব্যাপারে সুপ্রীমকোর্টের রায় উল্লেখযোগ্য। ১৯৮৯ সালের ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে প্রদত্ত উক্ত রায়ে সুপ্রীমকোর্ট অষ্টম সংশোধন আইনের হাইকোর্ট বিভাগ বিকেন্দ্রিকরণ সংক্রান্ত অংশটিকে বাতিল ঘোষণা করেন।

১৩.০ পর্যালোচনা

১৩.১ আমাদের সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ বিষয় ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে বলা হয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রি ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য

সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রির পরামর্শ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন। ৫৫(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তার কর্তৃত্বে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হবে। এখানে গোটা মন্ত্রিসভাকে সম্পৃক্ত করা হয়নি। অথচ ৫৫(৩) অনুচ্ছেদে ঘোষণা করা হয়েছে যে, মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সংবিধান সংসদীয় গণতন্ত্র অনুশীলনরত অন্যান্য দেশের সংবিধানের চাইতে কিছুটা স্বতন্ত্র। যেমন ব্রিটেন ও ভারতে যথাক্রমে রাজা ও রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক প্রধান হলেও তারা মন্ত্রিসভার পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করতে পারেন না। ভারতের সংবিধানের ৭৪(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "There shall be a council of Ministers with the Prime Minister at the head—to aid and advise the President, who shall in the exercise of his functions act in accordnace with such advice."

১৩.২ ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ও কেবিনেটের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রফেসর স্মীথ বলেছেন The Prime Minister is the keystone of the cabinet arch. এখানে কেবিনেটের মধ্যে প্রধানমন্ত্রির মর্যাদা সম্পর্কে বলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রিকে কেবিনেট থেকে বিচ্ছিন্ন কোন দ্বীপ হিসেবে দেখানো হয়নি। ব্রিটেনে নির্বাহী ক্ষমতার মালিক কেবিনেট, প্রধানমন্ত্রী নন। কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধানে প্রধানমন্ত্রিকে নিরংকুশ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। মন্ত্রীসভার অন্য সদস্যদের মন্ত্রিত্ব তার সন্তুষ্টির ওপর নির্ভরশীল। সংবিধানের ৫৮(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "প্রধানমন্ত্রি যে কোন সময়ে কোন মন্ত্রিকে পদত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং উক্ত মন্ত্রী অনুরূপ অনুরোধ পালনে অসমর্থ হইলে তিনি রাষ্ট্রপতিকে উক্ত মন্ত্রির নিয়োগের অবসান ঘটাইবার পরামর্শদান করিতে পারিবেন।"

১৩.৩ এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধন আইনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টাকে প্রধানমন্ত্রির সমমর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তাদের উভয়ের ক্ষমতা এখতিয়ার সমান নয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ কালে প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগের নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করার যে বিধান করা হয়েছে তা সংসদীয় ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ নয় বলে সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। তবে প্রধানমন্ত্রির নেতৃত্বে গঠিত নির্বাচিত সরকার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্বও সমান নয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে শুধু দৈনন্দিন কাজ চালানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে নির্বাচিত সরকারের নিকট জনগণের বিপুল প্রত্যাশা থাকে, এ কারণেই প্রধানমন্ত্রীর হাতে ব্যাপক ক্ষমতার সমাহার ঘটানো হয়েছে।

১৪.০ উপসংহার

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে জারীকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে রাষ্ট্রপতির হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারী তারিখে জারীকৃত সাময়িক সংবিধান আদেশে প্রধানমন্ত্রিকে নির্বাহী ক্ষমতা দেয়া হয়। ইতোমধ্যে পুর্ণাংগ সংবিধান প্রণীত হয়। এতে প্রধানমন্ত্রির নেতৃত্বে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার কায়েম করা হয়। এটি ছিলো এদেশের জনগণের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নের রূপায়ন। কিন্তু অনতিকালের মধ্যেই এই পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে। রাষ্ট্রপতিকে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী করা হয়। এই পরিবর্তনের পেছনে হয়তো কারণ ছিলো। তবে সংসদীয় পদ্ধতিই যে জনগণের কাঙ্খিত তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৯১ সালে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধন আইন অনুমোদনের সময়। প্রধানমন্ত্রির নেতৃত্বে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে আনীত উক্ত সংশোধনী গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারী ও বিরাধীদলীয় সংসদ সদস্যগণ অভূতপূর্ব ঐকমত্য প্রদর্শন করেন। এ ছাড়া এই সংশোধনীটি জনগণের দ্বারাও বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়। এর একটি তাৎপর্য আছে। এর দ্বারা জনগণের অভিপ্রায় কী তা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জি

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারঃ *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান* পৃঃ ৩৫, ৩৮, ৪০,৪৪, ৫৪, ৬২, ৬৪, ৬৬, ৭২, ৭৪, ৭৬, ৭৮, ৮০, ৮২, ৮৪, ৯৮, ১০৬, ১০৮, ১১০, ১১২, ১১৬, ১১৮ ও ১২৬)

২। রহমান গাজী শামছুর : *বাংলাদেশের সংবিধানের ভাষ্য, পল্লব পাবলিশার্স* ঢাকা (পৃঃ ৫৪৫ ও ৫৪৬)

৩। রহমান মিজানুরঃ *সংবিধান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক*, সিটি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫ (পৃঃ ৫৮, ৫৯ ও ৬০)

৪। বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা মার্চ ২৮, ১৯৯৬।

৫। ত্রয়োদশ সংশোধনী বিষয়ে খন্দকার মাহবুব হোসেনের বক্তব্য দেখুন ১০ই এপ্রিল ১৯৯৬ তারিখের আজকের কাগজে।

৬। একই বিষয়ে ব্যারিষ্টার আমীরুল ইসলামের বক্তব্য দেখুন ১১ই এপ্রিল ১৯৯৬ তারিখের আজকের কাগজে।

৭। Longman Dictionary of Contemporary English, 1978, Longman Group Ltd, Great Britain, P. 180'

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৭ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, আশ্বিন ১৪০৩

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

মুহাম্মদ আব্দুল কাদের*

১.০ ভূমিকা

১.১ সভ্যতার সূচনালগ্নে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে তেমন বাদানুবাদের প্রয়োজন ছিল না। বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্রীকরণ বা স্বাধীনতার দাবি বর্তমান বিশ্বে নতুনভাবে উচ্চারিত হচ্ছে। তবে এরিষ্টটলের দর্শনে বিশেষত "দি পলিটিক্স" গ্রন্থে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা উদ্ধৃত হয়েছিল। গ্রীক সভ্যতায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতার বিদ্যমানতা পাওয়া যায়। এর পরে ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় চার খলিফার শাসনামলে বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতার বিদ্যমানতা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু খ্রীষ্টানদের ক্রুসেডের নামে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিকাশ ঘটলে বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা টিকে থাকেনি। রেনেঁসা নামক বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের পরে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। ইংল্যান্ডে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্র বিকশিত হয়। সমগ্র ইউরোপে পার্লামেন্ট ভিত্তিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ ঘটতে থাকে। আর পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে বিচার বিভাগের স্বাধীনতাও প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এদিকে মন্টেস্কু কর্তৃক প্রচারিত হয় ক্ষমতার স্বাতন্ত্রীকরণ তত্ত্ব। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি দৃঢ়ভাবে সমর্থিত ও প্রতিষ্ঠিত হবার সাথে সাথে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার দাবি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

১.২ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কী, এবং বাংলাদেশে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কতটুকু বিরাজিত আছে–এ বিষয়ে আলোচনার আগে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিষয়ক প্রত্যয়ের পটভূমি সম্বন্ধে একটু আলোকপাত করা দরকার। মানব জাতির ইতিহাসে যেসব সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার অন্যতম সভ্যতা হলো গ্রীক সভ্যতা। গ্রীক সভ্যতার উল্লেখযোগ্য চিন্তাবিদ বা রাজনৈতিক দর্শনের প্রবক্তাগণ মনে করতেন যে, সরকারের আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ, এ তিনটি বিভাগ তিন ধরনের ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করে। ফলে একটি সরকারের ক্ষমতাও তিন রকমের হয়ে থাকে। আর সরকারের সুষ্ঠু বা সার্থকভাবে কাজ সম্পাদনের জন্য সরকারের উপর্যুক্ত কাজগুলো একেকটি বিভাগকে অন্য বিভাগ থেকে পার্থক্যশীল করে সুনির্দিষ্টভাবে পালন করার জন্য দিক নির্দেশনা গ্রীক দার্শনিকগণ প্রদান করেন।

---

* উপ–পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

বহুযুগ পরে পৃথিবী পরিক্রমায় বর্তমান সভ্যতার দ্বার–প্রান্তে এসে এভাবে সরকারের তিনটি বিভাগের পার্থক্যশীলতা বা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার পক্ষে মত ব্যক্ত করা হয়েছে। আর সরকারের তিনটি বিভাগের পার্থক্যশীলতা বা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার মাধ্যমে কাজ করে যাবার নীতি হলো ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি। অর্থাৎ আইন সভা দেশের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন, সংশোধন ও পরিবর্তনের কাজ করবে। এসব আইন অনুযায়ী শাসন বিভাগ কাজ করবে ও আইনসমূহ বাস্তবায়নের কাজ করবে। আর বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে বিচার কার্য করবে তথা সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত করবে। আরও স্পষ্ট করে বললে বলা যায়–১) সরকারের এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজ চালনা করবে না, ২) একই ব্যক্তি একাধিক বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে না ও ৩) সরকারের এক বিভাগ অন্য বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ বা কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবে না।

১.৩ সপ্তদশ শতকে ব্যক্তি সাতন্ত্রবাদ বা ব্যক্তিস্বাধীনতার মতবাদ ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকলে ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ মতবাদ ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করতে থাকে। প্রখ্যাত চিন্তাবিদ Bodin ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির পুনরুজ্জীবন ঘটান। তিনি বলেন যে, অন্তত শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ পরস্পর হতে সম্পূর্ণ পৃথক হবে। জন লক "Civil Government" গ্রন্থের মধ্যে ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির আলোচনা করে প্রতিটি কমনওয়েলথে বিদ্যমান সরকারগুলির তিনটি ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছিলেন। তবে মধ্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত দার্শনিক মন্টেস্কু তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "La Espirit des Lois" গ্রন্থে ব্যক্তি স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির পরিস্ফুটন করেন। স্বৈরাচারী চতুর্দশ লুইয়ের শাসনে যখন কোন ব্যক্তি স্বাধীনতা ছিল না তখনই মন্টেস্কু ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য উক্ত মতবাদ প্রচার করেন।

তিনি বলেন, ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য সরকারের তিনটা বিভাগকে পৃথক করতে হবে ও সরকারী তিনটা বিভাগের ক্ষমতা পৃথক ব্যক্তিদের হাতে অর্পণ করতে হবে। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন যে তিনটি বিভাগের ক্ষমতা যদি একই ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত থাকে, তবে তাতে ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকবে না ও একই ব্যক্তি বা ব্যক্তি–সংসদ স্বৈরাচারী আইন প্রণয়ন করে তা স্বৈরাচারীভাবে প্রয়োগ করবে। আবার আইন ও শাসন সংক্রান্ত বিষয়াদি পৃথক না করা হলেও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হবে। কেননা এতে বিচারকরাই আইন প্রণেতা হয়ে দাঁড়াবে ও ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বৈরাচারী ক্ষমতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে আইন, শাসন ও বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা একই ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত করা হয় সেক্ষেত্রে স্বাধীনতার লেশমাত্র থাকতে পারে না।

মন্টেস্কুর ভাষায়, "যখন আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ও নির্বাহী ক্ষমতা একই ব্যক্তির বা কর্মকর্তার হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে তখন সেখানে কোন স্বাধীনতাই থাকতে পারে না। কারণ একই রাজা বা কর্মকর্তা স্বেচ্ছামূলকভাবে আইন বিধিবদ্ধ করতে পারে ও সেগুলো স্বেচ্ছামূলক উপায়ে কার্যকর করতে পারে – এ আশংকা সেখানে দেখা দিতে পারে। আবার যদি বিচার বিভাগীয় ক্ষমতাকে আইন প্রণয়নগত ক্ষমতা বা নির্বাহী ক্ষমতা হতে পৃথক না করা হয়, তবে সেখানে স্বাধীনতার বিলুপ্তি ঘটবে। যদি বিচার

বিভাগীয় ক্ষমতাকে আইন প্রণয়নগত ক্ষমতার সাথে সংযুক্ত করা হয়, তবে নাগরিকের জীবন ও স্বাধীনতা স্বৈরতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে, কারণ তখন বিচারকরা আইন–বর্তায় পরিণত হবেন। যদি বিচার বিভাগীয় ক্ষমতাকে নির্বাহী ক্ষমতার সাথে সংযুক্ত করা হয় তবে বিচারকরা ভয়ংকর অত্যাচারী হয়ে পড়তে পারেন।”

জনগণের মধ্য হতেই হোক, আর ভূ–স্বামীর মধ্য হতেই হোক, একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এ তিনটি ক্ষমতা–আইনবিধিবদ্ধকরণ, সরকারী সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকরকরণ ও ব্যক্তিগণের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসাকরণ সংক্রান্ত ক্ষমতা–চর্চা করতে যায়, তবে সেখানে সবকিছুরই অবসান ঘটবে। “অর্থাৎ ব্যক্তি স্বাধীনতা যা সর্বোচ্চ মানবিক কল্যাণ সাধন করবে তা রক্ষার জন্য ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির যথার্থ প্রয়োগ আবশ্যক।”

১.৪ ব্লাকষ্টোন নামক ইংরেজ আইনজ্ঞ ও ক্ষমতাস্বাতন্ত্রীকরণ নীতিকে যথার্থভাবে ব্যাখ্যা দানের মাধ্যমে পরিস্ফুট করেছেন। তিনি বলেছেন যে, স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যই ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ আবশ্যক। তাঁর মতে, “যখনই আইন প্রণয়ন ও আইন বলবৎকরণের অধিকার কোন একক ব্যক্তি বা ব্যক্তিমন্ডলীর হাতে ন্যস্ত করা হয় তখনই সেখানে কোন ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকতে পারে না। ম্যাজিষ্টেট নিজেই স্বৈরতান্ত্রিকভাবে আইন বিধিবদ্ধ করে তাকেই স্বৈরাচারী পন্থায় কার্যকর করতে পারেন। কারণ তিনি আবার বিচার কার্য পরিচালনার ক্ষমতায় অভিসিক্ত, আইন প্রণেতা হিসেবেও তিনি নিজের জন্য যথার্থ ক্ষমতার ব্যবস্থা রাখেন।”

১.৫ ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতিটি আসলে স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা বা রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা থেকে সমাজে সফলভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্তরণ ঘটানোর জন্য প্রচারিত একটি মতবাদ। যেসব দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে ব্যক্তি স্বাধীনতার বিকাশ সমাজে ঘটেছে, সেসব দেশে ক্ষমতাস্বাতন্ত্রীকরণ নীতির তেমন আর প্রয়োজন নেই বলে বেশীর ভাগ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন। তবে যেসব দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্বৈরতন্ত্র এখনও বিদ্যমান এবং যেসব দেশের সমাজ কাঠামোতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেসব দেশে ক্ষমতার স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি আবশ্যিকভাবে প্রয়োগ হওয়া উচিৎ, যাতে অন্তত বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

২.০ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

২.১ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে আইন ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থেকে কেবল আইন অনুযায়ী নিরপেক্ষভাবে বিচার–কার্য সম্পাদন করার ক্ষমতাকে বুঝায়। অর্থাৎ বিচার কার্য সম্পাদনের প্রক্রিয়ায় আদালত অন্য কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের নিকট হতে কোনরূপ নির্দেশ গ্রহণ করবে না এবং বিচারকগণ সকল প্রকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব হতে মুক্ত থাকবেন। একজন বিচারক শুধুমাত্র আন্তঃব্যক্তিক বিরোধের মীমাংসাকারী হিসেবে বিচারকার্য সম্পন্ন করেন না। তিনি সরকার এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাগরিকদের অভিযোগেরও বিচার করে থাকেন। এজন্য নিরাপত্তা ও ন্যায়ানুগ বিচার নিশ্চিত করতে হলে বিচার বিভাগকে আবশ্যিকভাবেই

সরকারের অন্যান্য বিভাগ হতে পৃথক ও স্বাধীন রাখতে হবে। সেই সাথে বিচারকদেরকে ব্যক্তিগত প্রভাব এবং সামাজিক চাপ হতে মুক্ত রাখতে হবে।

২.২ গতানুগতিক গণতান্ত্রিক মতবাদ অনুযায়ী বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা ন্যায়বিচার এবং অধিকার রক্ষার অত্যাবশ্যক হাতিয়ার। এই স্বাধীনতার অর্থ হলো বিচারকগণ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে ভীতি ও বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়াই বিচারের কাজ সমাধা করবেন। তাছাড়া বিচারকদের উপরে রাজনৈতিক প্রভাব ও চাপ প্রতিহত করার যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও থাকা চাই। হ্যারল্ড ল্যাস্কির মতে, বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতার জন্য তিনটি নীতি প্রয়োজনীয় ঃ ক) বিচারকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিচার বিবেচনার সম্ভাবনা দূর করার জন্য উপযুক্ত নিয়োগ পদ্ধতি সুনির্দিষ্টকরণ খ) সদাচরণ সাপেক্ষে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কাজের স্থায়ী নিরাপত্তা বিধান দরকার, গ) কর্মক্ষেত্রে সুনাম ও যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতির ব্যবস্থা করা উচিৎ।

২.৩ তবে সাধারণভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোই কোন একটা দেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন। এগুলো হলো ঃ–

ক. বিচারকদের নিয়োগঃ বিভিন্ন দেশে বিচারকদের নিয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত আছে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণকে সিনেটের অনুমোদনক্রমে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করে থাকেন। ব্রিটেন–এর রাজা লর্ডসভার লর্ডগণকে মনোনীত করে থাকেন। যদিও এক্ষেত্রে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ও লর্ড চ্যান্সেলরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ রাজ্যেই বিচারপতিগণ গণভোটের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে থাকেন এবং কিছু সংখ্যক রাজ্যে বিচারপতিগণ আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন।

সুতরাং বিচারপতি নিয়োগের ব্যাপারে সাধারণত তিনটি নীতি অনুসৃত হয় যথাঃ– ক) শাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খ) জনগণ দ্বারা নির্বাচন, গ) আইনসভাকর্তৃক নির্বাচন।

এখন আমাদেরকে দেখতে হবে কোন পদ্ধতি দ্বারা বিচারপতিদের নিয়োগ করলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় থাকতে পারে। ডঃ গার্নারের মতে,. শাসন কর্তৃপক্ষের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির দ্বারা বিচারপতিদের নিয়োগ হলো সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। কারণ এ পদ্ধতিতে শুধুমাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ সম্ভব হয়। কিন্তু যেহেতু মুষ্টিমেয় ব্যক্তি এ মনোনয়ন দান করে থাকেন, সেহেতু সব ক্ষেত্রে যে তারা ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে কঠোরভাবে শুধুমাত্র যোগ্যতা অনুযায়ী নিয়োগ করেন তা সত্য নয়। আইন সভা কর্তৃক বিচারপতিগণের নিয়োগ সম্পর্কে বলা যায় যে, এ পদ্ধতিতে বহু লোক এক বিতর্কের দ্বারা যোগ্যতা নিরূপণ করে বিচারকগণকে নিযুক্ত করেন। ফলে হয়তবা যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচিত হতে পারে। কিন্তু এ পদ্ধতির একটা বড় ত্রুটি হলো বিচারকগণ দলাদলীর সাথে জড়িত হয়ে পড়েন নিজ পদের স্থায়ীত্বের জন্য এবং দ্রুত পদোন্নতির আশায় দলীয় স্বার্থে তারা কাজ পরিচালনা করতে পারেন। আর জনসাধারণের হাতে বিচারপতিগণের নিয়োগের দায়িত্ব দেয়া মোটেও ঠিক নয়। কারণ যোগ্য ও দক্ষ বিচারক নির্বাচিত করার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের খুব কমই আছে।

অন্যদিকে বলা যায় যে, মুষ্ঠিমেয় কয়েকজন মানুষ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গিয়ে ভুল করতে পারেন। কিন্তু ব্যাপক জনসমষ্টি কখনও ভুল করতে পারে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিটি ব্যবস্থায়ই কোন না কোন দোষ বা গুণ আছে। প্রকৃতপক্ষে বিচারপতিদের ব্যক্তিগত চরিত্র এবং শিক্ষার উপরে তাদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নির্ভর করে। কেন্দ্রে যে পদ্ধতি পরিচালিত আছে সেই পদ্ধতির উপর যদি বিচার প্রার্থী জনসাধারণের আস্থা বা শ্রদ্ধা থাকে সে পদ্ধতিকে উৎকৃষ্ট পদ্ধতি বলে গণ্য করা যায়।

খ। অপসারণ প্রক্রিয়াঃ বিচারপতিগণের অপসারণ পদ্ধতির ভিন্নতার উপর বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা ভিন্ন ভিন্নভাবে বিকশিত হয়। তাই অপসারণের শর্তাবলী এমন হওয়া উচিত নয়, যাতে করে বিচারকগণ সর্বদা ভীতি ও আশংকার মধ্যে থাকে। তাদেরকে সদাচরণ সাপেক্ষে পূর্ণ কার্যকাল পর্যন্ত কার্যরত থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। যেমনঃ ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর পর বাংলাদেশের বিচারপতিদের যে কোন সময় রাষ্ট্রপতি তার ইচ্ছা ব্যতিরেকেই অপসারণের ক্ষমতাধিকারী হন। এতে করে সন্দোহাতীতভাবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা খর্বিত হয়। তাই বিচারকরা যাতে সর্বদা চাকরি হারাবার ভয়ে ভীত না হয়ে নিশ্চিন্তে তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেন সে জন্য তাদের অপসারণ প্রক্রিয়ায় বিশেষ পদ্ধতি থাকা প্রয়োজন। যেমন, আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে বিচারপতিদের পদচ্যুত করতে হলে রাষ্ট্রপতি আইন সভার দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের প্রস্তাবক্রমে তা করে থাকেন।

গ। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো এই যে, অবশ্যম্ভাবীভাবে বিচার বিভাগের উপর থেকে আইন বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বন্ধ করতে হবে। কারণ, যদি বিচার বিভাগের উপর আইন বিভাগ প্রভাব খাটায় তবে স্বভাবতই বিচার বিভাগ সংকীর্ণ দলাদলির ভিতর লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে এবং স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা একটি আকাশ কুসুম কল্পনায় পরিণত হতে পারে। আবার যদি বিচার বিভাগের উপর শাসন বিভাগের আধিপত্য থাকে, তবে বিচার বিভাগ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে না। বিশেষ করে যদি কোন রায় নির্বাহী বিভাগের বিরুদ্ধে যায় তবে সেসব ক্ষেত্রে শাসন বিভাগ কর্তৃক স্বভাবতই বিচার বিভাগের রায়ের উপর প্রভাব বিস্তারের আশংকা থাকে। তাই সর্বদাই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার জন্য বিচার বিভাগকে আইন ও শাসন বিভাগের প্রভাব থেকে অবশ্যই মুক্ত রাখতে হবে। তবে সে সাথে বিচার বিভাগের প্রাধান্যের জন্য অবশ্যম্ভাবী ভাবেই শাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা থাকা দরকার। কারণ, শাসন বিভাগই বিচার বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায় কার্যকরী করার বৈধ কর্তৃপক্ষ। তাই উভয়ের মধ্যে কর্তৃত্ব বা হস্তক্ষেপ বিহীন সহযোগিতাও অপরিহার্য।

ঘ। বিচারকদের সততাঃ বিচারকদের সততা, নিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত। বিচারকদের যোগ্যতা আইন সভার বা শাসন কর্তৃপক্ষের যোগ্যতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। বিচারকদেরকে আইন সম্বন্ধে সার্বিক জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে এবং

অবশ্যই রাজনীতি নিরপেক্ষ হতে হবে। তাদেরকে সদা পরিবর্তনশীল জনমত দ্বারা প্রভাবিত হওয়া চলবে না। বিচারকরা যদি তাদের সততা, কর্তব্য পরায়ণতা, নিষ্ঠা প্রভৃতি বজায় রাখতে না পারেন তবে বিচার বিভাগের কী নিরপেক্ষতা, কী স্বাধীনতা, কী প্রাধান্য, কোনটিই রক্ষিত হবে না। কারণ বিচারকরা যদি সৎ ও নিষ্ঠাবান না হন, তবে তাদের কারণেই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হওয়ার আশংকা থাকে।

ঙ। বেতনের পরিমাণ ঃ উপযুক্ত যোগ্যতা সংবলিত ব্যক্তিগণকে বিচার কার্যে আকৃষ্ট করার জন্য বিচারপতিদের বেতনের পরিমাণ উপযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বেতনের পরিমাণ যদি পদমর্যাদা, দায়িত্বভার ও উচ্চমান সম্পন্ন জীবন যাপনের সাথে সংগতিপূর্ণ না হয়, তবে বিচারপতিগণের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হতে পারে। বেতনের পরিমাণ উপযুক্ত করে তাদেরকে সব ধরণের প্রলোভনের উর্ধ্বে রাখতে হবে, যাতে তারা অর্থের কারণে সততা পরিত্যাগ না করেন। তাদের কার্যকালের মধ্যে বেতনের পরিমাণ হ্রাস করা উচিত নয়।

চ। সাংবিধানিক প্রাধান্য ঃ সাংবিধানিক প্রাধান্য কোন দেশের স্বাধীনতা ও নিপেক্ষতা রক্ষার জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। সাংবিধানিক প্রাধান্য বলতে সংবিধানের সার্বভৌমত্ব এবং সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের সমূদয় কর্ম পরিচালনার কার্যক্রমকে বুঝানো হয়ে থাকে। সংবিধানের মধ্যেই সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা ও বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক বিবৃত থাকে। তাই সংবিধানের প্রাধান্য যদি বজায় থাকে তবে তার অর্থ হবে সংবিধান অনুযায়ী কোন বিভাগ বিচার বিভাগের কাজের উপরে কোন প্রভাব বিস্তার করবে না। ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা অক্ষূণ্নভাবে বজায় থাকবে।

২.৪ সর্বপোরি বিচারপতিদেরকে তাদের অফিস সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একদিকে যেমন যোগ্য হতে হবে, তেমনি মানসিকভাবে তাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। এছাড়া এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে তারা অবসর নেয়ার পরে আইনজ্ঞ হিসেবে কাজ করতে না পারেন। সেই সাথে তারা যেন আর্থিক সংকটে পতিত না হন সেজন্য চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পরে সকল বিচারকের পারিতোষিক হিসেবে পর্যাপ্ত পেনশনের বিধান রাখতে হবে। তবে বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে বিচারপতিদের মানসিকতা বিচার করা জরুরি, সমাজের সদস্য হিসেবে বিচারপতিরা সমাজে বিদ্যমান কোন না কোন মূল্যবোধের প্রতি অংঙ্গিকারাবদ্ধ থাকেন। সামাজিক অবস্থানের দ্বারা সামাজিক চেতনার মান ও স্তর নির্ধারিত হয়। এবং সে কারণেই বিচারপতিদের সামাজিক অবস্থান তাদের চেতনা, মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত করে। কাজেই নিজস্ব মূল্যবোধকে বর্জন করে অঙ্গিকারবিহীন অবস্থায় আইন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। রাষ্টবিজ্ঞানী রডি, অ্যান্ডারসন এবং ক্রীষ্টাল যথার্থ মন্তব্য করেছেন, "Even where the greatest care is taken democreacis to secure the services of high minded impertial judges, the human element creeps inevitably in the judicial process judges however, distinguise

are still men not Gods sitting upon olympus and judging the controversies of mere mortals with complete detachment" বিচারপতিদের পারিবারিক ও শিক্ষাগত পটভূমি, অভিজ্ঞতা এবং দর্শনের দ্বারা বিচার বিভাগের সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হয়। বিচার বিভাগের পদ্ধতি সর্বদা যুক্তিবাদী, আইনানুগ যান্ত্রিক পথে পরিচালিত হয় না। ব্যক্তিগত উপাদান (common sense) এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। বিচারকেরা তাদের পূর্বসুরীদের সিদ্ধান্তের ধারাকে অনেক সময় অনুসরণ করেন না। পরিবর্তিত অবস্থা এবং নুতন বিচারকের নিয়োগ আইনের নুতন নিয়ম সৃষ্টি করে। বিচার বিভাগের কাজের পদ্ধতি সম্পর্কিত এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, বিচারকেরা প্রথমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং পরে তার বিন্যাস অতীতের নজীরের মাধ্যমে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেন। বিচারপতিরা কেবল আইনগত যুক্তি এবং নজিরের দ্বারা পরিচালিত হননা, তাদের আর্থিক, সামাজিক মতাদর্শগত পটভূমি ও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রবার্ট ডাল এর মতে বিচারকেরা বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হবার পূর্বে নাগরিক জীবনের সাথে পরিচিত থাকেন এবং দেশের বৃহৎ সমস্যা বা বিষয় সম্পর্কে প্রকাশ্যে নিজেদের অঙ্গিকার ঘোষণা করেন। বিচারপতি ফ্রাঙ্কফার্টার ও উল্লেখ করেছিলেন যে, মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট জনপ্রতিনিধিদের মতামত, রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের মতামতের সঙ্গে–নিজেকে জড়িয়ে সংবিধানের এবং আইন গ্রন্থের প্রাণহীন পৃষ্ঠায় জীবন সঞ্চারণ করেন। সাধারণভাবে আদালতের পক্ষে অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করা সম্ভব নয়। কারণ জাতীয় সমস্যার বিষয়ে মতানৈক্যের ফলে আদালতের সামনে যখন বিভিন্ন বিকল্প উপস্থিত হয়, তখন আদালতের পক্ষে মূল্যায়নমূলক এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রভাব হতে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। জ্যাক পেলটাসনের ধারণানুসারে, একথা সত্য যে, আইনের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচারকেরা তাঁদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। বিদ্যমান মতাদর্শের দাবি অনুযায়ী পছন্দ স্পষ্টরূপে প্রকাশ করা দরকার। অনেক ক্ষেত্রেই স্বার্থের সমর্থন নিয়ে সমাজে কোন বিরোধ দেখা যায় না এবং এক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ অত্যন্ত সহজ। যেখানে আইনের প্রয়োগ বিষয়ে ব্যাপক মতৈক্য বর্তমান, সেখানে বিচারকদের কাজ সহজসাধ্য হয়ে পড়ে এবং সেখানে বিচারপতির সিদ্ধান্ত অনুমান করা সম্ভব। কিন্তু গুরুতর মতভেদ থাকলে বিচারপতির পছন্দের প্রশ্ন ওঠে এবং এখানে আইন বিচারপতির নিজস্ব সিদ্ধান্তে পরিণত হয়। তাঁর মতে, আইনসভার সদস্যদের মত বিচারকেরাও গোষ্ঠীগত লড়াইয়ে লিপ্ত। কিন্তু তাঁদের অংশগ্রহণের পদ্ধতির মধ্যে তারতম্য বর্তমান।

২.৫ রাষ্ট্র বিজ্ঞানী জি এম কার্টার এবং জে এইচ হার্জের মতে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও সমভাবে ন্যায় বিচার প্রয়োগের অসুবিধা অনেক। মোটের উপর, আইনের চোখে সমতার আদর্শকে মানুষই প্রতিষ্ঠা করবে। নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তার মনোভাব যত প্রবলই হোক না কেন, মানুষ চূড়ান্তভাবে আদর্শের প্রাধিকারের দ্বারা লালিত এবং এমনকি পূর্ব–পরিকল্পিত ধারণা এবং পক্ষপাতদুষ্টতার দ্বারা পরিচালিত সমাজের কোন নির্দিষ্ট স্তর বা শ্রেণীর হতে বিচারপতি নিয়োগ করা হলে কোন বর্ণভূক্ত

লোক বা শ্রেণীর দিকে তাঁদের বিশেষ ঝোঁক দেখা দিতে পারে। এ প্রসঙ্গে গ্রাহাম ওয়ালেসের রচিত "Our social heritage গ্রন্থে বিধৃত মতামত প্রনিধানযোগ্যঃ "We make a judge independent not in order to spare him personal humiliation but in order that certain motives shall not and certain other motives shall direct his official conduct."

২.৬ তবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বর্তমান বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে মোটামুটি ভাবে ক্রিয়াশীল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনের সাংবিধানিকতা বিচারের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী। বিশ্ব বিখ্যাত "মারবারি" বনাম "ম্যাডিসন" মামলায় বিচারপতি মার্শাল আদালতের বিচার অনুযায়ী সংবিধান বিরোধী আইনকে অবৈধ ঘোষণার ক্ষমতা ১৮০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন। যথাযথ আইনগত পদ্ধতি অনুসারে আইনের সাংবিধানিকতা বিচারের ক্ষেত্রে মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা ব্যাপক। সংবিধান ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও এই ক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২.৭ অনেক সময়ই সংবিধানের অর্থ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিচারপতিদের ব্যাখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি সুলিখিত সংবিধান থাকা সত্বেও আইনের সাংবিধানিকতা বিচারপতিদের ব্যাখ্যার উপরই নির্ভর করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে বিরোধ বাধলে সে বিরোধের মিমাংসা মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট করে থাকে। ১৮২১ সালে প্রদত্ত মেরিল্যান্ড মামলায় মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের রায়ের কথাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এ রায়টি কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা পরিবর্ধন করেছে। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণগত বৈষম্য দূরীকরণ, ষ্টেট আইন পরিষদ ও প্রতিনিধি পরিষদের নির্বাচন সম্পর্কে নির্বাচনী এলাকায় অসম বিভক্তি দূরীকরণ, নাগরিক অধিকারের রক্ষাকর্তা হিসেবে কর্তব্য পালন, প্রভৃতি ক্ষেত্রে মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

২.৮ গ্রেট বৃটেনে আদালত পার্লামেন্টের কোন আইনকে সংবিধান বিরোধী আইন বলে বাতিল করে দিতে পারে না। বৃটেনের বিচার বিভাগকে স্বাধীন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হলেও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বৃটিশ পার্লামেন্টের ক্ষেত্রে সার্বভৌম এবং চূড়ান্ত ক্ষমতার অস্তিত্বের ফলে বিচার বিভাগকে আইন প্রণেতাদের বক্তব্য অনুযায়ী আইনের ব্যাখ্যা করতে হয়। তবে বৃটেনের বিচার বিভাগ সব ধরনের প্রভাব ও অবৈধ হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করার উৎকৃষ্ট নজির স্থাপন করতে পেরেছে।

২.৯ সুইজারল্যান্ডের বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে ফেডারেল ট্রাইব্যুনাল কেন্টেনের আইনকে ব্যাখ্যা করে সুইজারল্যান্ড সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্য অংশটুকুকে সংবিধান বিরোধী ঘোষণা করার নজির স্থাপন করেছে। তবে এই ফেডারেল ট্রাইব্যুনাল যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান এবং ফেডারেল আইনের সাংবিধানিকতা পর্যালোচনার অধিকার সংরক্ষণ করে না। জার্মানীর আদালতকে আইনের সাংবিধানিকতা পর্যালোচনা করার ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

জার্মানীর আদালত নাগরিক অধিকারসমুহ সুরক্ষার জন্য প্রধান কর্তা হিসেবে যথার্থ ভূমিকা পালন করে থাকে। অষ্ট্রেলিয়ার সুপ্রীম কোর্ট যেকোন আইনকে সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যশীল কিনা তা বিচারের ক্ষমতা রাখে। ইটালীর সুপ্রীম কোর্টের অনুরূপভাবে আইনের সাংবিধানিকতা বিচারের ক্ষমতা সংরক্ষণ করার এখতিয়ার আছে।

২.১০ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে ভারতের বিচার বিভাগও যথেষ্ট স্বাধীন ভূমিকা পালন করে থাকে। ভারতের বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্ট আইনের সাংবিধানিকতা বিচারের ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করে থাকে। যদিও ভারতবর্ষের সংবিধান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় ভারতের সুপ্রীম কোর্ট আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির মাধ্যমে আইনের সাংবিধানিকতা বিচারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা ভোগ করত। তবুও সংবিধানের চব্বিশ, পচিশ এবং ছাব্বিশতম সংশোধনের ফলে সুপ্রীম কোর্ট আইনের সাংবিধানিকতা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হয়। ভারতের সুপ্রীম কোর্টকে বর্তমানে কেন্দ্র–রাজ্য বিরোধ মিমাংশার ক্ষেত্রে কর্তৃত্বকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার বিস্তর ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। ভারত বর্ষের সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আদালত নাগরিকদের মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। সংবিধানের ১৯নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আদালত নাগরিকের উপর বাধা নিষেধের যৌক্তিকতা বিচার করতে পারে। হাইকোর্ট সংবিধানের ২২৬নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মৌলিক অধিকার রক্ষাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। এমনকি ভারতীয় সংবিধানের ১৪৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্ট গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক বিষয়ে শাসন বিভাগের প্রয়োজন অনুযায়ী পরামর্শ প্রদান করে বা ব্যাখ্যা প্রদান করে।

৩.০ বাংলাদেশে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

৩.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সমূহ স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। মৌলিক অধিকারগুলো এজন্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, যাতে করে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলো রক্ষা করা যায়। মৌলিক অধিকারগুলো বলবৎ করার দায়িত্ব আদালতের উপরে ন্যাস্ত করা হয়েছে। সংবিধানের ৯৪(৪) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, বিচারকগণ বিচার কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবেন। বিচারকদের এই স্বাধীনতা কার্যকর করার জন্য এর পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে আরো কতিপয় সুস্পষ্ট নির্দেশনা সংবিধানে বিবৃত হয়েছে।

৩.২ বাংলাদেশের বিচার বিভাগের বৈশিষ্ট্য ঃ

বাংলাদেশের বিচার বিভাগ একটি সুপ্রীম কোর্ট, অন্যান্য অধস্তন আদালত এবং প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল নিয়ে গঠিত। বিচার বিভাগের শীর্ষে আছে সুপ্রীম কোর্ট। সুপ্রীমকোর্ট আবার দু'টি ভাগে বিভক্ত – ১) হাইকোর্ট বিভাগ এবং ২) আপীল বিভাগ। সুপ্রীমকোর্ট ও হাইকোর্ট পৃথক সংস্থা না হলেও প্রকৃত পক্ষে সুপ্রীম কোর্টের সাধারণ ক্ষমতাগুলি আপীল বিভাগই প্রয়োগ করে থাকে। সুপ্রীম কোর্টের নিচে আছে জেলা জজের আদালত এবং তার নিচে আছে সহকারী জজের আদালত। জেলা জজ আদালত ও ট্রাইব্যুনালের উপরে হাইকোর্ট বিভাগের তত্ত্বাবধানের/নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আছে।

৩.৩ বাংলাদেশের হাইকোর্ট কর্তৃক ঘোষিত রায়ের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগ শুনানী গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত প্রদান করে। তবে আপীল বিভাগের কোন আদি এখতিয়ার নাই। হাইকোর্ট বিভাগের আদি এখতিয়ার এবং আপীলের এখতিয়ার আছে। সংবিধান বর্ণিত মৌলিক অধিকার বলবৎ করার ক্ষমতা হাইকোর্ট বিভাগের আদি এখতিয়ারের অন্তর্ভুক্ত। দেওয়ানী মামলায় জেলা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট আপীল গ্রহণ করে। অন্যদিকে দায়রা জজের রায়ের বিরুদ্ধে গুরুতর ফৌজদারী মামলার আপীলও এই আদালত শ্রবণ করে। দেওয়ানী মামলাগুলো বিচারের জন্য নিম্ন পর্যায়ে সহকারী জজ (মুন্সেফ) এর আদালত রয়েছে।

৩.৪ বাংলাদেশে নিম্ন ও মধ্য স্তরের ফৌজদারী মামলার বিচার করার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে জেলা পর্যায়ে কর্মরত ম্যাজিষ্ট্রেটদের উপরে। ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত–প্রথম শ্রেণীর, দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা সম্পন্ন ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। এ ম্যাজিষ্ট্রেটগণের আদালতের উপরে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এর আদালত আছে। আর মৃত্যু–দন্ড বা যাবজ্জীবন সাজা প্রদানযোগ্য বা গুরুতর শাস্তিযোগ্য ফৌজদারী মামলাগুলো বিচার করেন দায়রা জজ, যিনি কিনা জেলা জজ হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ বাংলাদেশে দেওয়ানী ও উচ্চস্তরের ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য সম্পূর্ণভাবে পৃথক কোন আদালত নাই। একই আদালত বা বিচারক জেলা জজ ও দায়রা জজ হিসেবে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার করে থাকেন। বাংলাদেশের বিচার বিভাগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো–এদেশের নিম্নস্তরের বিচার বিভাগ শাসন বিভাগের সাথে একীভূতভাবে ক্রিয়াশীল।

৩.৫ এদেশের উচ্চ স্তরের আদালতগুলোর বিচারকগণ (হাইকোর্ট ও আপীল বিভাগের) বিচার বিভাগীয় ব্যক্তি হিসেবে কাজ করেন এবং তাঁরা শাসন বিভাগ হতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও পৃথকভাবে কাজ করেন। কিন্তু এদেশের নিম্ন স্তরের আদালতগুলো অর্থাৎ ফৌজদারী আদালতের বিচারকগণ শাসন বিভাগের কর্মকর্তা এবং তাঁরা শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণে থেকে কাজ করেন। আবার জেলা জজ ও দায়রা জজ, সাব–জজ এবং সহকারী জজ হিসেবে কর্মরত বিচারকগণ আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিযুক্ত এবং নিয়ন্ত্রিত হন। এভাবে তাঁরাও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় দ্বারা নিয়োগ প্রাপ্ত, পদায়িত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকেন এবং মন্ত্রণালয়ের প্রভাবমুক্ত হতে পারেন না। অথচ সংবিধানের ১১৬ নং অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে–বলা আছে যে, বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনরত ম্যাজিষ্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা বিধানের ভার সুপ্রীম কোর্টের উপরে ন্যস্ত থাকবে। বাংলাদেশ সংবিধানের ২২ নম্বর অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূল নীতি হিসেবে শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের নিশ্চয়তা বিধানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপরে অর্পণ করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের জন্মের পরে ২৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্বেও শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ আজও সম্ভব হয়নি।

৩.৬ বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টকে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। সংবিধানের কোন বিধানের সাথে অসামঞ্জস্য কোন আইনকে অবৈধ ঘোষণা

করার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের আছে। মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় রীট গ্রহণ এবং মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণের ক্ষমতা হাইকোর্ট বিভাগকে দেয়া হয়েছে। উপরন্তু সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বিধানের জন্য সংবিধানে উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী এদেশের বিচারকদের নিয়োগ পদ্ধতি, চাকরির নিরাপত্তা এবং কর্মের অন্যান্য শর্তাবলী সম্বন্ধীয় যে বিধান রাখা হয়েচে তা নিম্নে আলোচনা করে বাংলাদেশের বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা বা নিরপেক্ষতার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস চালানো হলো:

৩.৭ নিয়োগ পদ্ধতি ঃ– বিচারকদের নিয়োগ–পদ্ধতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের। ভারত, বৃটেন প্রভৃতি দেশের মতো আমাদের দেশের বিচারকদের নিয়োগের ক্ষমতা শাসন বিভাগের উপরে ন্যস্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি রাষ্টপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে তিনি অন্যান্য বিচারকদের নিয়োগদান করেন সংবিধানের ৯৫(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী। প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্টপতি প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করতে বাধ্য নন। অন্যান্য সমুদয় কর্মকান্ডে রাষ্টপতি প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করতে বাধ্য থাকায় এক্ষেত্রে শাসন বিভাগীয় প্রভাব থাকাই স্বাভাবিক। তবে শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে রাষ্টপতি এক্ষেত্রে যথেচ্ছ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন না। কারণ সংবিধানে বিচারকদের যোগ্যতা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আর এই নির্দিষ্ট যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য হতেই বিচারক নিয়োগ করতে হবে।

৩.৮ চাকরির নিরাপত্তাঃ– বিচারকদের চাকরির স্থায়িত্ব ও নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমে বিচার বিভাগের প্রাধান্য তথা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের সংবিধানে উপযুক্ত বিধান রাখা হয়েছে। শাসন বিভাগ বিচারকদের নিয়োগ দান করে ঠিকই, কিন্তু নিজের ইচ্ছা মতো কোন বিচারককে অপসারণ করতে পারে না। অসদাচরণ বা অসামর্থের বিষয়টি প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ বাষট্টি বছর পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকতে পারবেন। ভারত, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্টের মতোই আমাদের দেশেও আইন সভার প্রস্তাব ব্যতীত শাসন বিভাগ বিচারকদের অপসারণ করতে পারবে না।

৪.০ বেতন-ভাতাদি প্রদানে বিশেষ প্রাধিকার

৪.১ শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখার জন্য বিচারকদের চাকরির নিশ্চয়তা প্রদান করার লক্ষ্যে সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের দেয় পারিশ্রমিক সংযুক্ত তহবিলের উপরে ধার্য করা হয়েছে। অর্থাৎ এ ব্যয় সম্পর্কে সংসদের বাৎসরিক মঞ্জুরীর প্রয়োজন হয় না। কোন বিচারকের নিয়োগের পরে তাঁর বেতন–ভাতা ও কর্মের অন্যান্য শর্তের এমন কোন তারতম্য করা যায় না যা তাঁর পক্ষে অসুবিধাজনক হতে পারে। এদেশের বিচারকদের বেতনের পরিমাণ সংসদের আইনের দ্বারা নির্ধারিত হয়। ভারতের মতো বাংলাদেশের সংবিধানে বিচারকদের বেতনের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। বিচারকগণ যাতে সমস্ত রকমের প্রলোভনের উর্ধ্বে থেকে তাদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে কাজ করতে পারেন সেজন্য কোন বিচারক অবসর নেয়ার

পরে কোন আদালতে ওকালতি করতে পারবেন না এবং সরকারী কোন কর্মে নিয়োগ লাভ করতে পারবেন না মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণভাবে দেখা গেছে যে যখন অবসর গ্রহণের পর কোন সরকারী পদ লাভের আশা থাকে না তখন বিচারকগণ সরকারকে বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষকে তুষ্ট রাখার চেষ্টা না করে নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে বিচার কাজ সমাধা করতে পারেন।

৪.২ বাংলাদেশের সংবিধানে সুপ্রীম কোর্টকে বিশেষ কিছু ফলপ্রসূ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। ন্যায় বিচারের স্বার্থে সুপ্রীম কোর্ট যে কোন ব্যক্তিকে কোর্টে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দিতে কিংবা দলিলপত্র দাখিল করার জন্য নির্দেশ বা পরোয়ানা জারি করতে পারে। বাংলাদেশের সকল কর্তৃপক্ষ সুপ্রীম কোর্টকে সহায়তা করতে বাধ্য। সুপ্রীম কোর্ট স্বাধীনভাবে আদালতসমূহের কর্ম পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধি প্রণয়ন ও নিজস্ব কর্মচারী নিয়োগ করতে পারে। প্রয়োজনে সুপ্রীম কোর্ট আদালত অবমাননার জন্য তদন্ত ও শাস্তি প্রদান করতে পারে। অর্থাৎ সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশে ভীতি প্রদর্শন ও অনুগ্রহ বন্টনের মাধ্যমে বিচারকদের কর্মকান্ড প্রভাবিত করা যায় না।

৪.৩ মাঝে মাঝে অবশ্য এদেশে সরকারী তরফ থেকে শাসন বিভাগ হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের জন্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কোন কোন সময় রাজনৈতিক শ্লোগান হিসেবে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের দাবী উঠেছে, কখনও বা কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করার জন্য পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে। কিন্তু ক্ষমতাসীন শাসকবর্গের স্বার্থ বিরোধী হতে পারে এরূপ আশংকায় বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হয়নি। এদেশে সর্বপ্রথম বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথকীকরণের জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল চতুর্থ জাতীয় সংসদে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের জন্য বিল উথাপনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে। কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের স্বার্থহানি ঘটতে পারে এরূপ আশংকা থেকে শেষ পর্যন্ত এ প্রচেষ্টা সার্থক হয়নি।'৯০ এর গণঅভ্যূত্থানের পরে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন দল শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের সাংবিধানিক নির্দেশ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে পঞ্চম জাতীয় সংসদে শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের লক্ষ্যে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছিল। এ বিলে বাংলাদেশের বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন কাঠামোর মধ্যে আনার প্রস্তাব করা হয় এজন্য বিচার কার্যে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা অর্থাৎ সহকারী জজ থেকে শুরু করে সকল স্তরের বিচারকের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি ইত্যাদি হাইকোর্ট বিভাগের নিয়ন্ত্রণে আনয়নের প্রস্তাব করা হয়েছিল। এই বিলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল এই যে, বিচার কার্যে নিয়োজিত ম্যাজিষ্ট্রেটদেরকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করে তাদেরকে হাইকোর্ট বিভাগের নিয়ন্ত্রণে আনার প্রস্তাব করা হয়েছিল। অর্থাৎ বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের যে সকল কর্মকর্তা জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট হিসেবে কাজ করবেন তাদেরকে হাইকোর্ট বিভাগের অধীনে প্রেষণে পদায়ন করে তাদের দ্বারা পূর্ণকালীন ফৌজদারী বিচার কার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা রাখা হয়। আর তারা জেলা প্রশাসকের অধীনে নয় বরং জেলা জজের অধীনে থেকে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করবেন।

অন্যদিকে প্রশাসন কার্যে নিয়োজিত ম্যাজিষ্ট্রেটদেরকে "প্রশাসনিক ম্যাজিষ্ট্রেট" হিসাবে উক্ত বিলে উল্লেখ করা হয় এবং তাদের হাতে আইন–শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের জন্য ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণসহ সংশ্লিষ্ট আইন মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণের বিধান রাখা হয়েছিল। অর্থাৎ প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী জেলা প্রশাসকগণ এবং তার অধীনস্থ কর্মকর্তাগণ যেসব কর্মকান্ড প্রশাসনিকভাবে নির্বাহ করে থাকেন সে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করার আইনগত বিধান এই বিলে রাখা হয়েছিল।

৪.৪ এই বিলটি জনগুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের আগে বিলটি ভালভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখার জন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগোষ্ঠির মতামত সংগ্রহের ব্যবস্থা নেয়া হয়। এজন্য প্রয়োজনীয় প্রশ্নমালা প্রণয়ন করে সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে বিতরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার জন্য সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিমালা অনুযায়ী সংসদের বৈঠকে নিয়মিতভাবে উপস্থাপিত হয়নি।

৪.৫ সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে সবক'টি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের কথা বেশ জোরে শোরে উচ্চারিত হয়েছিল। অর্থাৎ এটা জনদাবীতে পরিণত হয়েছে। বর্তমান সংসদের ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনী ইশতেহারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয় হিসেবে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথকীকরনের জন্য সাংবিধানিক দাবী বাস্তবায়নের স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত হয়েছে। আশার কথা হলো–বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শপথ গ্রহণের পরপরই জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের বিষয়টিকে বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। আমরা আশা করতে পারি যে, অবিলম্বেই এদেশে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথকীকরণের মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে।

৫.০ উপসংহার

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কোন সমাজে কতটুকু বিদ্যমান তার দ্বারা কোন সমাজের অগ্রগতির মাত্রা বা উন্নয়নের ধাপ পরিমাপ করা যায় বলেই একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ণ সাধনের লক্ষ্যে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা উচিৎ বলে বর্তমান বিশ্বের সবক'টি উন্নত দেশেই ধারণা করা হয়। আর বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য শুধু আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করলেই চলবে না বা সাংবিধানিক বিধিবিধান কার্যকরী করলেই চলবে না। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কোন সমাজে নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দরকার হলো সেই সমাজের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বাড়াতে হবে, যাতে করে জনসাধারণ স্বয়ং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষাকারী বিধি বিধান ও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করবেন। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কোন সমাজে

সফলভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যতম শর্ত হলো সমাজে আইন শৃঙ্খলার যথার্থ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন। বর্তমান বিশ্বে এ ধারণা সর্বজন স্বীকৃত যে, ব্যাপক জনগোষ্ঠী যদি আইন শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে তবে সেই সমাজে বিচার বিভাগের প্রাধান্য বা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। আর আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সমূহের সদস্যরা যদি নির্বিঘ্নে ও সব রকমের রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে সর্বোপরি দূনীতি মুক্ত থেকে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে কোন সমাজে আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কাজে সক্রিয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে পারে, তখনই সেই সমাজে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ সুগম হয়। এজন্যই আমাদের সমাজে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের সাথে সাথে সমাজের জনগোষ্ঠীর শিক্ষার হার কাঙ্খিত মাত্রায় বৃদ্ধি এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যক্রম প্রচলিত আইন ও সমাজের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত (Regulated) করার মাধ্যমে আইন শৃঙ্খলার প্রতি সমাজের জনগোষ্ঠীকে শ্রদ্ধাশীল করে তুলতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, ঢাকা, ৩০শে জুন, ১৯৯৪।

২। এরিস্টটল (মূল), অনুবাদক সরদার ফজলুল করিম, *দি পলিটিক্স ঃ* ঢাকা।

৩। Griffith, Ernest S- *The Amirican System of Government*, Published by Methuenn & Co. Ltd, London, 1965.

৪। আর এম, ম্যাক আইভার, *আধুনিক রাষ্ট্র*, এমাজউদ্দীন আহম্মদ অনুদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা–১৯৮৩।

৫। শ্রী নির্মল কান্তিঘোষ, *আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ভূমিকা*; রবীন্দ্র লাইব্রেরী কলকাতা–১২, সেপ্টেম্বর–১৯৭৫।

৬। সুপ্রীম কোর্ট *বিচারপতিদের (কর্মের শর্তাবলী) আদেশ*, ১৯৭৩, (Po. No. 21, 1973) বি, জি, প্রেস, ঢাকা।

৭। Almond GA. & Coleman J. S, *the Politics of Developing Areas.*

৮। Finer, H. *The Theory and Practice of Modern Government.*

৯। হক, আবুল ফজল; *বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা–অক্টোবর–১৯৭৪।

১০। দৈনিক ইনকিলাব, ২০শে জুন–১৯৯৬ সংখ্যা।

১১। দৈনিক ইত্তেফাক, ২০শে জুন, ১৯৯৬ সংখ্যা

১২। The Independent, June 20, 1996.

১৩। Laski, H, J. - A Grammer of Politics. London.

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৭ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর'৯৬, আশ্বিন ১৪০৩

ফৌজদারী বিচার প্রক্রিয়া ও সাক্ষ্য আইন

মোঃ হাসিবুর রহমান*

১.০ ভূমিকা

১.১ মানুষের জীবনে বৈষয়িক কাজকর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য সুখী হওয়া। সুখ শুধু বর্তমান অবস্থাতেই রাখা নয়, উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বর্তমান পর্যায় থেকে আরো উপরের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। মানুষের ইচ্ছে ছিল বলেই প্রাগৈতিহাসিক গুহাবাসী প্রস্তরযুগ থেকে আজকের দালানকোঠা, গাড়ী, বাড়ীসহ সুপার ইলেক্টনিক যুগে আসতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু যুক্তিবাদী মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রাণী গায়ের জোরে চলত। দুর্ধর্ষ প্রাণীকূল ধ্বংস হয়ে গেছে অথবা প্রাচীন কালের মত অন্যের অধীন হয়েই আছে।

১.২ যুক্তিবাদী মানুষ তার জ্ঞানের দ্বারা বুঝতে পেরেছে অন্য মানুষই তার উন্নয়ন ও সুখের পথের বাধা। "First deserve then desire" কিন্তু উপযুক্ত না হয়েই মানুষ অনেক সময় অনেক কিছুর জন্য ইচ্ছে করে থাকে। সে কারণে জন্ম নেয় চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি ও এমনি আরো বহুবিধ অপরাধ। মানুষকে যদি সম্পূর্ণ স্বৈরাচারের পথে ছেড়ে দেয়া হয়, তা হলে প্রাচীন কালের ডাইনোসর ও অন্যান্য প্রাণীর মতই তারা পরস্পরের সঙ্গে হিংস্র প্রতিযোগিতা করে পৃথিবীর বুক থেকে বিলীন হয়ে যাবে। তাই ফরাসি চিন্তাবিদ রুশো বলেছেন "Man is born free but every where he is in chain".

২.০ দন্ড প্রদানের উৎপত্তি

২.১ মানুষকে প্রতি পদক্ষেপে বাধার সম্মুখীন হতে হয় বিভিন্ন বিধির। বে-আইনী পদক্ষেপ সংশোধনের জন্য মানুষ তৈরী করেছে দণ্ডদানের জন্য বিধি। এটাই দণ্ড বিধি। দণ্ডের উদ্দেশ্য সমাজের বেশীর ভাগ লোকের সুখ ও সমৃদ্ধি। দণ্ডের মাধ্যমে একজনকে সাজা দিয়ে অন্য জনকে শেখাতে হবে, প্রতিহিংসার চিত্ত ঠাণ্ডা করতে হবে, মানুষকে সংশোধন শেখাতে হবে, যে একবার দণ্ডবিধি বিরোধী কাজ করেছে সে যেন আর তা অন্যের উপর করতে না পারে, সেটাই মূল উদ্দেশ্য।

২.২ ব্রিটিশ যুগ শুরু হবার আগে রাজা বা সম্রাটগণ ধর্মগুরুর আইনমত সাজা দিতেন। কুরান, হাদিস, বেদ, বাইবেল, গীতা, ত্রিপিটক, জেন্দাবেসা, গ্রন্থসাহেব,

---

* পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

মনুসংহিতা, জাগ্যবন্ধ (স্মৃতি বা বেদের ব্যাখ্যা) ইত্যাদিতেও অপরাধের জন্য শাস্তির বিধিবিধান ছিল। ফলে ঋষিগণ ঈশ্বরের বাক্য শুনতেন ও শুনে বিধিবিধান দিতেন বলে হিন্দু ধর্মের লোক বিশ্বাস করতো।

১৮৫৮ সালে রাণী ভিক্টোরিয়া ইংল্যান্ডের সিংহাসনে আসীন হওয়ার পর কোম্পানীর হাত থেকে শাসনভার নিয়ে এই উপ–মহাদেশে (বাংলা, পাক, ভারত) ভাইসরয়ের শাসন কায়েম করে। লর্ড মেক্লে, জর্জ স্টিফেনের মত কতিপয় সাহিত্যিক সুশৃংখল ও বিধিবদ্ধভাবে শাস্তি প্রদানের জন্য (১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পরে) কতিপয় আইন প্রণয়ন করে।

৩.০ ফৌজদারী বিচার প্রক্রিয়া

৩.১ লর্ড মেক্লে ১৮৬০ সালে প্রণয়ন করেন দণ্ডবিধি –অর্থাৎ দণ্ড বা শাস্তি–প্রদানের জন্য বিধি। শাস্তি কী পদ্ধতিতে প্রদান করতে হবে, তার জন্য বিভিন্ন আইনের সমন্বয়ে তৈরী হয় ১৮৯৮ সালের পঞ্চম আইন ফৌজদারী কার্যধারা বা 'Cr. PC'/ ফৌজদারী কার্যধারাই বলে দেবে শাস্তি প্রদানের জন্য কী কী উপায় অবলম্বন করতে হবে। অপরাধী Benefit of doubt এ মুক্তি পেয়ে গেলে আইনের আফসোস নেই, কিন্তু নিরাপরাধ যেন শাস্তি না পায়, সে জন্যই অপরাধ প্রমাণের জন্য জর্জ ষ্টিফেন ১৮৭২ সালে প্রণয়ন করেন সাক্ষ্য আইন। সাক্ষ্য আইনের বিভিন্ন ধারা সঠিক তথ্য উদঘাটনে সহায়তা করে থাকে।

৩.২ ফৌজদারী কার্যবিধিতে শুধু শাস্তি প্রদানের পদ্ধতির কথাই লেখা নেই, এখানে অনেক মূল আইনও রয়েছে। মুল আইনগুলি হচ্ছে ঃ (১) চতুর্থ–অধ্যায়ে ম্যাজিষ্টেট, পুলিশ, ও গ্রেপ্তারকারী ব্যক্তিগণকে উক্ত জনসাধারণের সাহায্য ও তথ্য প্রদান (২) অষ্টম অধ্যায়ে জনসাধারণের অপরাধ প্রতিরোধ (৩) ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পুলিশের প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা (৪) ষষ্টত্রিংশ অধ্যায়ে স্ত্রী–পুত্রের ভরণ-পোষণ (৫) সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ে হ্যাবিয়াস কর্পাস জাতীয় নির্দেশ (৬) অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ে পাবলিক প্রসিকিউটর (৭) উনচত্বারিংশ অধ্যায়ে জামিন (৮) চত্বারিংশ অধ্যায়ে সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণের জন্য কমিশন (৯) একচত্বারিংশ অধ্যায়ে সাক্ষ্য সম্পর্কে বিশেষ নিয়ম (১০) দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়ে মুচলেকা সংক্রান্ত বিধান (১১) ত্রয়োচত্বারিংশ অধ্যায়ে সম্পত্তি বিধি ব্যবস্থা।

৪.০ সাক্ষীর ভূমিকা

৪.১ বিচার ব্যবস্থায় সাক্ষীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দালিলিক সাক্ষ্য ব্যতীত যখন কোন মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়, তখন জনশ্রুতিমূলক সাক্ষ্য সম্পর্কে অতীব সাবধানতা গ্রহণ করা উচিত। অনেক সময় সাক্ষী স্বেচ্ছায় আদালতে উপস্থিত না হলে বা উপস্থিতির জন্য ওয়ারেন্ট সময়মত হাতে না পেলে তাকে গ্রেপ্তার করে নেওয়া হয় (যদিও হাতকড়া পরানো হয় না, কেবল সাক্ষ্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত আট্‌কে রাখা হয়)।

ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত, সুশীল, বুদ্ধিমান, বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে কিন্তু সে যদি ঘটনা দেখার মত হলে না দেখে থাকে, শুনার মত হলে না শুনে থাকে, অনুভব করার মত হলে অনুভবও না করে থাকে তখন তাকে সাক্ষী হিসেবে আদালত কর্তৃক গ্রহণ করা ঠিক নয়।

৪.২ যে লোক কেবল কাউকে লোকশ্রুতিতেই নয়, নিজে অনেক তথ্য জানে তাকেই সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। (১) জনশ্রুতিমূলক সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য নয়; যেমন একজন শুধু আর একজনকে কাঁদতে দেখেছে, কোন্ ঘটনার জন্য কাঁদছে সে ঘটনা সে দেখে নাই, (রুদালী সম্প্রদায়ের মত সে একজন ভাড়াটে ক্রন্দসীও হতে পারে) (২) সাক্ষ্য আইনে জনশ্রুতিমূলক সাক্ষ্যকে প্রাসংগিক সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয় না (৩) এ সাক্ষ্য প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত না হলে গ্রহণযোগ্য নয় (৪) তা স্বার্থমূলক বর্ণনাও হতে পারে (৫) তা উৎকৃষ্ট সাক্ষ্য মতবাদের পরিপন্থী (৬) সাক্ষ্য আইনের ৩২ ধারা বিধান সাপেক্ষে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হলে আদালতে তা গ্রহণযোগ্য নয় (৭) শোনা কথার ক্ষেত্রে মূল ঘোষণাকারীকে শপথ পড়ানোর বিধান নেই (৮) মূল ঘোষণাকারীকে আদালতে হাজির করিয়ে জেরা করাও সম্ভব নয়। (৯) শুনা কথা একজন হতে অন্য জনে যায়; তা ই তা বৈধ অনুসন্ধানের ফল নয়। তা দুর্বল সাক্ষ্য হিসেবে অগ্রাহ্য। (১০) মূল ঘোষণাকারীর অভাবে এখানে তৃতীয়পক্ষ প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে নিজেদের করা দোষ নিরীহ অন্য কোন লোকের উপর ফেলতে পারে, যার উপর কোন কারণে তার ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে। বিবাহ–শাদী, জমিজমা, সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি ইত্যাদি (১১) এটা যথাযথ সাক্ষ্য নয়। Truth depriciate in the process of repealation (১৩) এটাকে সাক্ষ্যদাতা দায়িত্ব অনুভব করে না।

৪.৩ মৌখিক সাক্ষ্যের মূল্য অনেক। মৌখিক সাক্ষ্য সত্য হওয়ার কারণে সাক্ষীর যদি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা জেল খাটারও ভয় থাকে, তবু আইনে তাকে এধরনের সাজা থেকে অব্যাহতি দান করা হয়েছে, সত্য ঘটনা কি তা আদালতকে সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেবার জন্য।

৫.০ সাক্ষ্য আইনে ধারা

সাক্ষ্য আইনের ধারা আছে মোট ১৬৭টি। এর মধ্যে জুরী বা Assessor সম্পর্কিত ধারা বর্তমানে স্থগিত এবং ২, ৮১ ও ১১৩ এই ধারা তিনটি বর্তমানে বাতিল। ফৌজদারী কার্যবিধিতে মোট ধারা আছে ৫৬৫টি, তাদের মধ্যে বর্তমানে বলবৎ ধারা আছে সর্বমোট ৪৭৭টি এবং বাংলাদেশে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এটা সংশোধিত হয়েছে। ৪৭৭টি ধারায় প্রয়োজনীয় সবকিছুর বিধান করা সম্ভব হয়নি বলে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৫৪ ধারায় হাইকোর্টকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে প্রয়োজনীয় সবকিছুর বিধান করার। ঐ ক্ষমতা বলে "জেনারেল রুলস্ এন্ড সার্কুলার অর্ডার্স অফ দি হাই কোর্ট রুল

(ক্রিমিনাল) ১৯৯০" জারী করা হয়েছে। ৪৯৮ ধারায় হাইকোর্টকে জামিনের জন্য অসীম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

৬.০ ফৌজদারী মামলা দায়েরের স্থান ও বিচারের ধারাবাহিক ধাপ

৬.১ থানায় অথবা ফৌজদারী আমল আদালতে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়। আমলযোগ্য অপরাধের (Cognizable Offence) ক্ষেত্রে সরাসরি থানায় এজাহারের মাধ্যমে মামলা দায়ের করা যায়। এজাহারকে ইংরেজীতে First Information Report বা সংক্ষেপে F.I.R বলে। এজাহারে ঘটনার তারিখ, সময়, ঘটনাস্থলসহ ঘটনার বিবরণ থাকা বাঞ্ছনীয়। এজাহার লিখিত বা মৌখিক হতে পারে। তবে উভয় ক্ষেত্রে এজাহারকারীকে পড়ে শুনানোর পরে তার স্বাক্ষর নিতে হবে। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৫৪ ধারা অনুযায়ী থানায় এজাহার লিপিবদ্ধ করা হয়। এজাহার মোট চার কপি করা হয়। মূল কপিটি সংশ্লিষ্ট ফৌজদারী আদালতে প্রেরণ করা হয়। একটি কপি থানায় রাখা হয়। একটি কপি পুলিশ সার্কেল অফিস ও অন্যটি পুলিশ সুপারের অফিসে প্রেরণ করা হয়। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৫৪ থেকে ১৭৩ ধারাসমূহের বিধান অনুযায়ী পুলিশ থানায় দায়েরকৃত কেসসমূহের তদন্ত কাজ সমাপ্ত করে। আমল অযোগ্য মামলায় (Non Cognizable Offence) কোর্টের অনুমতি ছাড়া পুলিশ তদন্ত করতে পারে না। তদন্তকালে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন, সাক্ষীদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ, আসামীদের গ্রেফতারের প্রচেষ্টাসহ আনুষঙ্গিক কাজ শেষ করে কোর্টে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৩ ধারায় রিপোর্ট দাখিল করে। এই রিপোর্ট অভিযোগ পত্র (Charge Sheet) বা চূড়ান্ত রিপোর্ট (Final Report) হতে পারে।

৬.২ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট আমল–আদালতে আমলযোগ্য অথবা আমল অযোগ্য মামলা দায়ের করা যায়। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯০ ধারায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট বাদীর নিকট থেকে নালিশ (আরজি) প্রাপ্তির পর ফৌজদারী কার্যবিধির ২০০ থেকে ২০৪ ধারায় বর্ণিত বিধানসমূহ অনুসরণ করে সন্তুষ্টি সাপেক্ষে Cognizance গ্রহণ করে আসামীদের উপর প্রসেস (সমন অথবা ওয়ারেন্ট)· ইস্যুর নির্দেশ দেন। ফৌজদারী কার্যবিধির ২০২ ধারা অনুসারে তদন্তের ফলাফলে ম্যাজিস্ট্রেট যদি মনে করেন কার্যক্রম গ্রহণের পর্যাপ্ত হেতু নাই, সেক্ষেত্রে আমল আদালত ফৌজদারী কার্যবিধির ২০৩ ধারায় নালিশ খারিজ (Dismis) করতে পারেন।

থানায় দায়েরকৃত মামলাকে পুলিশী মামলা এবং কোর্টে দায়েরকৃত মামলাকে নালিশী মামলা বলে। পুলিশী মামলায় পুলিশ রিপোর্ট দাখিলের পর সমস্ত আসামী হাজির হলে এবং নালিসী মামলায় প্রসেস জারীর পর সমস্ত আসামী কোর্টে হাজির হলে অথবা অনুপস্থিত আসামীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যবিধির নির্ধারিত পদ্ধতি (ঘোষণা, ক্রোকি–পরওয়ানা জারী ও সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি) অনুসরণ শেষে ফৌজদারী আমল আদালত মামলা বিচারের জন্য প্রস্তুত হলে বিচারের যোগ্য আদালত; যেমন, দায়রা

জজ/জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/মেট্রোপলিটান ম্যাজিষ্ট্রেট/প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্টেট/দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট/তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে প্রেরণ /বদলি করেন।

৭.০ ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে ফৌজদারী মামলার বিচার

৭.১ পূর্বে দুই বছরের অধিক কারাদন্ডের যোগ্য অপরাধের মামলা ওয়ারেন্ট পদ্ধতিতে এবং তার নিচের অপরাধের মামলা সমন পদ্ধতিতে ম্যাজিষ্টেট আদালতে বিচার করা হ'ত। কিন্তু বর্তমানে ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে বিচারযোগ্য মামলা শুধু একটি পদ্ধতিতে, ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪১ ধারা থেকে ২৪৯ ধারার নির্দেশসহ আনুষঙ্গিক ধারা অনুসরণ করত বিচার কার্য সমাপ্ত করা হয়।

৭.২ বিচারক ম্যাজিষ্টেট বিচারের জন্য প্রাপ্ত নথিটি কাঠগড়ায় আসামিদের উপস্থিতিতে পুলিশ রিপোর্ট কিংবা ফরিয়াদির দরখাস্ত এবং তার সংগে দলিলাদি প্রেরিত হয়ে থাকলে সেগুলি দেখবেন, প্রয়োজনে তিনি উভয় পক্ষকে শুনতেও পারেন এবং সব দেখে, পড়ে ও শুনে প্রাথমিক অভিযোগ ভিত্তিহীন মনে হলে এবং বিচারের প্রহসন করে অনর্থক সময় ও শক্তি ক্ষেপণ করা উচিৎ নয় মনে হলে ঐ সমস্ত কারণ লিপিবদ্ধ করে আসামিকে অব্যাহতি দিবেন।

৭.৩ সবকিছু দেখে, শুনে ও পড়ে আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের যথেষ্ট উপাদান থাকলে আসামির বিরুদ্ধে চার্জ (অভিযোগ) গঠন করবেন এবং চার্জ বিচারক ম্যাজিষ্টেট লিখবেন এবং আসামিকে পড়ে শুনাবেন। আসামি যদি দোষ স্বীকার করে তবে বিচারক ঐ স্বীকৃতি লিখবেন এবং আসামি দণ্ড থেকে অব্যাহতি পাওয়ার উপযুক্ত কারণ না দর্শাতে পারলে (বিচারক) ম্যাজিষ্ট্রেট আসামিকে শাস্তি দিতে পারেন।

৭.৪ আসামি যদি দোষ স্বীকার না করে তবে ম্যাজিষ্টেট নির্দিষ্ট দিনে প্রথমে বাদী পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণ এবং আসমি পক্ষ থেকে সাক্ষীদের জেরা করার সুযোগ দিবেন এবং ফৌজদারী-কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় আসামিদেরকে পরীক্ষা এবং পরে আসামি পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করবেন (সাফাইসাক্ষ) এবং বাদী পক্ষ থেকে জেরা করার সুযোগ দিবেন। সর্বশেষ উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক শ্রবণান্তে ঐ সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আসামিকে দণ্ড বা খালাস দিবেন। দণ্ড বা খালাস দেয়ার আগে যে কোন মুহূতে বাদীপক্ষ আসামির বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেওয়ার আবেদন করতে পারেন এবং ম্যাজিষ্টেট সে আবেদন মঞ্জুর করতে পারেন।

৭.৫ (ক) ফৌঃ কাঃ বিধির ৩৭১ ধারা অনুসারে রায়ের কপি আসামির বোধগম্য ভাষাতে অনুবাদ করে সমন কেস ব্যতীত বিনা মূল্যে দিতে হবে। ৬ মাসের অনধিক কারাদণ্ডের মামলা সমন কেস ২০ অধ্যায়ের (মূল ফৌঃ কাঃ বিঃ) বিষয়। (খ) ৩৭২ (ফৌঃ কাঃ বিধির) ধারা অনুসারে রায়ের মূলকপি কেস নথির সাথে রাখতে হবে। আসামি চাইলে একটি অনুবাদ আসামির মাতৃভাষায় দিতে হবে। তাই মূল কপিটি কেস

নথিতে রাখতে হবে। (গ) ফৌঃ কাঃ বিঃ ৩৭৩ অনুসারে দায়রা আদালত নিজস্ব আওতাভুক্ত এলাকার মধ্যে বিচারকৃত রায়ের নকল পাঠাবেন।

৮.০ ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীমকোর্ট। এর দুটি বিভাগ আছে–হাইকোট ডিভিশন ও আপীলেট ডিভিশন। রীট পিটিশনের মাধ্যমে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি হাইকোর্টে রীট পিটিশন করতে পারে, ফৌজদারী ব্যাপারে আইন ও শাসনতন্ত্রের প্রশ্ন জড়িত থাকলে। কিন্তু দেওয়ানী মোকদ্দমার বিষয়ে হাইকোর্ট আপীলের আদালত। বর্তমানে রেফারেন্সের ব্যবস্থা নেই। নতুন তথ্যের ভিত্তিতে মামলার রায় পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকলে মামলা রিভিউ হয়ে থাকে। এটা যে আদালত আগের রায় দিয়েছেন, সে আদালতেই হয়ে থাকে। হাইকোর্টে রিভিশন চলে দরখাস্ত করে বা হাইকোর্ট মামলা নিজে তলব করলে। রিভিশনে ঘটনাও বিশ্লেষণ চলে, শুধু আইনের ব্যাখ্যা নয়।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্টেটদের শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

ম্যাজিষ্টেটের ধরন	জেল	জরিমানা	অনাদায়
প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্টেট	৫ বৎসর	১০,০০০/–	জেলের $\frac{১}{৪}$ ভাগ
দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্টেট	৩ বৎসর	৩,০০০/–	জেলের $\frac{১}{৪}$ ভাগ
তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্টেট	২ বৎসর	২,০০০/–	জেলের $\frac{১}{৪}$ ভাগ

৯.০ আমলযোগ্য অপরাধ

পুলিশ বিনা ওয়ারেন্টে কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার করতে পারে সেই CIPSODERA সম্পর্কে বলছি। (১) আমলযোগ্য অপরাধ (যা মুল বইটির দ্বিতীয় সিডিউলে আছে) (২) ঘর ভেংগে অনধিকার প্রবেশ (৩) হুলিয়ার আসামী (৪) চোরাই মালসহ ব্যক্তি (৫) পুলিশকে বাধা প্রদান (৬) সেনাবাহিনী থেকে পলায়ন (৭) অপরাধী বলে সন্দেহ হয় (বাংলাদেশের বাইরে) (৮) সাজাপ্রাপ্ত আসামি পুনরায় জামিনে এসে অপরাধ করলে বা হুমকি দিলে (৮) অন্য থানা থেকে তাকে ধরার আদেশ বা অনুরোধ আসলে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করা যায়। CIPSODORR–কে অনেকে CIPSODERA হিসেবেও ব্যাখ্যা করে বাংলাদেশের বাইরের প্রমাণিত অপরাধের জন্য তাকে সেখানে হস্তান্তরের বিধান উল্লেখ করেছেন।

১০.০ ডিটেনশন

১০.১ রায় তিন প্রকার ঃ (১) ক্ষুদ্র বা মিনি রায়, বা কোর্টে স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রায় (২) যেমন তেমন রায় (৩) শানে রায় (নিয়মিত রায়)। রায়ের ভিত্তিতেই ডিক্রী হয়। ডিক্রীর ভিত্তিতেই স্থায়ী ইনজাংশন হয়, শান্তি ভংগের বা সম্পত্তি অন্যের দ্বারা

অপসারণের ভয়ে দেওয়ানী মামলার ব্যাপারে। ফৌজদারীতে ক্ষতিপূরণ কাম্য নয়। রায়ে শাস্তিই কাম্য। দু'পক্ষের উপস্থিতিতে রায়ের পর ডিক্রী দিলে আর আপীল চলে না। দেওয়ানী মামলায় ১২ বৎসরে তামাদির প্রশ্ন থাকলেও ফৌজদারি মামলার এখন কোন সময় সীমা নাই, যদিও আগে ২০ বৎসর ছিল। তবে বিলম্বে অবস্থা, ঘটনা, সাক্ষী, ইত্যাদির অনেক পরিবর্তন ঘটে। অনেকে সংশোধিত হয়ে যায়। অনেকে অনেক কিছু ভুলে যায়। তখন সংশোধিত ভাল লোককেও শাস্তি দিতে হয়। এটা অযৌক্তিক।

গ্রেপ্তারের স্থান থেকে যাতায়াতের সময় বাদে পুলিশ ২৪ ঘন্টার ভিতর আসামিকে ম্যাজিষ্টেটের নিকট হাজির করবে। তথ্য বের করার জন্য পুলিশ ১৫ দিন পর পর সময় বাড়াবে আসামিকে রিমান্ডে নেবার জন্য। এটা দোষ করার পর punitive শাস্তির বেলায়। দোষ করতে পারে সন্দেহে আসামী দিনের পর দিন মাসের পর মাস বিনা বিচারে preventive Detention -এ থাকতে পারে স্পেশাল পাওয়ার এ্যাক্ট (১৯৭৫) এ অন্যের জান–মাল ও ইজ্জতের জন্য বিপজ্জনক হলে। ভারতে এজন্য সময়সীমা থাকলেও বাংলাদেশে কোন সময়সীমা নাই। তবে সুপ্রীম উপদেষ্টা বোর্ড (দু'জন সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র জজ ও একজন যুগ্ম–সচিব এর নিচে নন এমন নির্বাহী বিভাগের কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত) অভিমত ব্যক্ত করলে ছেড়ে দেয়া যেতেও পারে, যদি আসামির মানসিকতার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বোর্ড আটকে রাখার পক্ষে অভিমত দিলেও সরকার ছেড়ে দিতে পারেন অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে। কয়েদিদের অধিকাংশই এই preventive detention এর কয়েদি।

১১.০ রায় ও জেরা ঃ

১০.১ বিভিন্ন আদেশের উদাহরণ নিম্নরূপ ঃ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা (ধারা ৮৭), সম্পত্তি ক্রোক ধারা (৮৮), আসামির প্রতি সমন ধারা (৬৮), মুচলেকা ও জামিন নামা (ধারা–৮৬) ইত্যাদি। রায় নিম্নোক্ত ভাবে হয়ে থাকে যেমন নিয়মিত বিচারের পর খালাস, বা দণ্ডাদেশ অপরাধ স্বীকারের পরে দণ্ডাদেশ (ধারা–২৪৩)। আদেশ একটি রায়ের অংশ–বিশেষ, তবে সব আদেশই রায় নয়।

১১.২ রায় প্রকাশ্য আদালতে দিতে হবে, উভয় পক্ষের বা আইনজীবীদের (পক্ষদ্বয়ের) উপস্থিতিতে দিতে হবে, রায় লিখিত হতে হবে, রায়ের ঘোষণা ম্যাজিষ্টেট কর্তৃক হতে হবে। কোন পক্ষের অনুপস্থিতির জন্য রায় ত্রুটিপূর্ণ হবেনা, রায় স্বাক্ষর ও তারিখসহ ঘোষণার পূর্বে পরিবর্তন করা যায় কিন্তু পরে ব্যাকরণগত ভুলভ্রান্তি ও টাইপের ভুলভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছু পরিবর্তন করা যায় না। হাইকোর্ট রায় আপীলের ভিত্তিতে পরিবর্তন ও পুনর্বিবেচনা করতে পারেন। রায়ে স্বাক্ষর তারিখ দান ও ঘোষণা একই সময়ে হতে হবে।

১১.৩ আদালতে যে পক্ষসমূহ আছেন, তারা হচ্ছেন: ম্যাজিষ্টেট, ফরিয়াদির উকিল, অপরাধির উকিল, বেঞ্চ কারণিক (উকিল, মুহুরী, মধ্যস্থ ব্যক্তি ইত্যাদি)। ঘোষণার পূর্বে

রায় গোপণ রাখতে হবে। রায়ের ধারা–৩৬৬, ধারা ৩৬৭ অনুসারে রায়ের ভাষা হবে কোর্টের ভাষা–বাংলা বা ইংরেজি। রায় ম্যাজিষ্টেট নিজে লিখবেন বা ডিকটেশন দিবেন, সই করবেন বা স্বাক্ষর দিবেন, রায় টাইপকৃত হলে প্রতি পৃষ্টায় সই করবেন, সীল না দিলেও চলবে। রায়ে দন্ড বা খালাসের আইনের স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে। রায়ের জন্য ৩৬৬ ফৌঃ কাঃ বিঃ হতে ৩৭৩ ফৌঃ কাঃ বিঃ বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে (মূলবই দ্রঃ)। রায়ে থাকবে (১) বিচার্য্য বিষয় (২) বিচার্য্য বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত (৩) সিদ্ধান্তের কারণ সমূহ। অনুচ্ছেদ–ওয়ারী বর্ণনা করতে হবে ক্রমিক নং সহ (১) অভিযোগকারীর বিষয় (২) আসামি/বিবাদির বিষয় (৩) বিচার্য বিষয় (৪) লিপিবদ্ধ সাক্ষ্যের উপর আলোচনা, যুক্তি ও কারণ নির্ণয় (৫) কারণসহ সিদ্ধান্ত (৬) অভিযোগ উল্লেখপূর্বক অপরাধ সম্পর্কে প্রাপ্ত বিষয়/ধারণা (৭) দন্ড বা খালাসের আদেশ।

১১.৪ রায়ের ভাষা হবে গম্ভীর, এটা অপ্রয়োজনীয়ভাবে দীর্ঘ করার দরকার নাই। রায়ে কঠোর বা উদার হওয়ার কারণ উল্লেখ করতে হবে। মৃত্যুদণ্ড দিলে বলতে হবে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ফাঁসিতে ঝুলতে থাকবে। এটা ফৌঃ কাঃ বিধির ধারা ৩৬৮(১), রায়ের ধারা ৩৬৬, ৩৬৯ বিকল্প রায় (কারণিক ভুলছাড়া ঘোষণার পর রায় সংশোধনীয় নয় আপীল ছাড়া) ম্যাজিষ্টেটের যেকোন ভুল আদেশের বিরুদ্ধে Revision দায়ের করতে পারে ক্ষতিগ্রস্ত বা সংক্ষুব্ধ কর্তপক্ষ। ধারা ৩৭০ আসামীর রায়ের অনুলিপি বিনা ফিতে দিবে ২০ অধ্যায় ব্যতীত (৩৭১), যে ভাষায় চায় সেই ভাষায় বিনা খরচে অনুলিপি দিতে হবে (৩৭২)। আদালতের ভাষায় না চাইলে আসামীর মাতৃভাষায় দিতে হবে।

১২.০ স্বাক্ষ্য আইন

১২.১ রায়ের মান নির্ভর করে লেখার ক্ষমতা, প্রকাশ ভঙ্গী ও সাক্ষ্য প্রমাণের উপর। এবার সাক্ষ্য আইনের আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে এই আইনের বিশেষ বিশেষ ধারার কথা আগে উল্লেখ করে নিচ্ছি।

১২.২ সাক্ষ্য আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ ঃ

সাক্ষ্য আইনের ৫ ধারায় বিচার্য ঘটনা, ঘটনার সঙ্গে প্রাসংগিক ঘটনা, প্রাসংগিক ঘটনার সাথে প্রাসংগিক ঘটনা পুংখানুপুঙ্খ রূপে উদ্ধার করতে হবে। এসবের মধ্যেই অপরাধ সংঘটনের আসল তথ্য বা প্রমাণ নিহিত থাকে। ৭ ধারায় আছে বিচার্য ঘটনার পূর্বাপর বা পরবর্তী কারণ ও পরিস্থিতি, ৮ ধারায় আছে উভয় পক্ষের আচরণ, ১৫৭ ধারায় আছে ঘটনার সমর্থনীয় তথ্যের বিশ্লেষণ ও বিবেচনা বা points of corroboration একজন Accomplice বা দুষ্কর্মের দোসর হিসেবে কোন কিছু দোষ স্বীকার করলেই তার উপর ভিত্তি করে রায় দিতে নেই–ঐ স্বীকারোক্তির পিছনে প্রয়োজনীয় তথ্য চাইতে হবে। ১৫৬ ধারায় ইঙ্গিতবাহী প্রশ্নের উত্তর বিবেচনা করতে হবে। ১৪৬ ধারায় সাক্ষীর চরিত্র, সত্য বাদিতা, যোগ্যতা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করতে

হবে। proper, improper বিষয়টি বিবেচনায় থাকতে হবে Accomplice এর বেলায় বা চরিত্র হননকারী প্রশ্নের বেলায়। ধারা ৪৫ এ বিশেষজ্ঞদের মতামত সঠিক কিনা তা–ও যাচাই করতে হবে। প্রধান Examination in Chief এবং জেরাকালীন cross Examination সাক্ষ্যের সঠিক বিশ্লেষণ করতে হবে।

১২.৩ সাক্ষ্য আইনের উপরের ৫টি ধারা বাদে বাকী সব কয়টি সংক্ষিপ্ত বিবরণের জন্য আমরা নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করতে পারি, ১ নং ভাগ ৬ হতে ৫৫ পর্যন্ত, ২নং ভাগ ৫৬ হতে ১০০ পর্যন্ত + ১১৮ (–১৬৬), ৩নং ভাগ ১০৯ হতে ১১৭, ৬ হতে ৫৫ ভাগের ভিতর আলাদা করে নিতে পারি ৬ হতে ১৬ পর্যন্ত ধারা কয়টি। এর ভিতরই আছে বিচার্য ঘটনার সাথে প্রাসংগিক ঘটনা ও প্রাসংগিক ঘটনার সঙ্গে প্রাসংগিক ঘটনা। ৬ হতে ৫৫ পর্যন্ত ধারা কয়টির বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের ভিতরই আছে ফৌজদারি বিচারের গোপণতথ্যসমূহ। এই ৬ হতে ৫৫ পর্যন্ত ধারাকে আবার ৭টি ভাগে ভাগ করা যায়। ৬ হতে ১৬, ১৭ হতে ২৩ + ৩১; ২৪ হতে ৩০, ৩২ ও ৩৩; ৩৪ হতে ৩৯; ৪০ হতে ৪৪; ৪৫ হতে ৫১; ৫২ হতে ৫৫ ধারা।

১৩.০ মাধ্যমিক স্বাক্ষ্য

১৩.১ ব্যতিক্রম থাকলে মাধ্যমিক সাক্ষ্য দিতে হবে এবং মাধ্যমিক সাক্ষ্য দ্বারা দলিল সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া যায়। ধারা (৬৫) বহু দলিলের অংশ, অংশ নকল করে আনা যায়, সর্ব–সাধারণের বিষয়ে দলিল, স্থান চ্যুত করা যায় না, কবরের নামফলক ইত্যাদি (৬৬) দলিল দাখিলের নোটিশ প্রয়োজন নাই কোন কোন ক্ষেত্রে বিরুদ্ধ পক্ষ দলিল দাখিল করা হতে অব্যাহতি পায় যখন (৬৬) (১) দলিলটি একটি নোটিশ হয় (২) বিরুদ্ধ পক্ষ জানে যে দাখিল করতে হবে। (৩) বিরুদ্ধ পক্ষ জোরে হস্তগত করেছে (৪) মূল দলিল আদালতে পেশ করা আছে (৫) বিরোধীপক্ষ বা তার প্রতিনিধি স্বীকার করেছে যে দলিলটি হারিয়ে গেছে, ধারা (৬৭) প্রাইভেট দলিলের প্রমাণ ও হস্তাক্ষরের প্রমাণ। ধারা (৬৮) সম্পাদনকারী স্বীকার করলে প্রত্যয়নকারীর প্রয়োজন নাই (৬৯) সত্যায়ন কারী না পাওয়ায় গলে সম্পাদনকারীর হাতে লেখা প্রমাণের জন্য প্রয়োজন। ধারা (৭০) সত্যায়িত দলিলের পক্ষ যদি সেটি সম্পাদন স্বীকার করে বা মেনে নেয় তা হলেই যথেষ্ট। (৭১) সত্যায়নকারী সাক্ষী অস্বীকার করলে মোকাবেলা সাক্ষী দরকার (৭৩) সিল বা স্বাক্ষরের সাথে অন্য সীল বা স্বাক্ষরের তুলনা (৭৪) সরকারী দলিল (ক) সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের (খ) ট্রাইবুনালের (গ) বাংলাদেশের কমনওয়েলথের আইন, বিচার ও শাসন বিভাগের কার্যের লিপিবদ্ধ বিবরণ (ঘ) বাংলাদেশের সর্বসাধারণের জন্য রক্ষিত বেসরকারী দলিলের লিপিবদ্ধকরণ (৭৫) অন্যান্য যাবতীয় দলিল বেসরকারী দলিল (৭৬) সরকারী দলিলের জাবেদা নকল মাধ্যমিক দলিল। (৭৭) জাবেদা নকল যে দলিলের নকল বা যে দলিলের অংশ বিশেষের নকল বলে কথিত বিষয় বস্তুর প্রমাণ স্বরূপ তা উপস্থাপন করা যায়। (৭৮) আদেশ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা অন্যান্য সরকারী দলিল প্রমাণ করা যায় (৬). যার দখলে দলিলটি আছে সে আদালতের এখতিয়ারের বাইরে থাকে।

ধারা ৭৯ হতে ৯০ পর্যন্ত সম্পর্কে অনুমান। ৩০ বৎসরের অতীতের দলিলকে পুরানো দলিল বলা যায়, বলে তা ভুল প্রমাণ করতে না পারলে আদালত সত্য বলে ধরে নেয়। 'May' সত্য প্রমাণ করতে হলে তথ্য পরিবেশন করতে হয়। Conclusive কে সত্য বলে ধরে নেওয়া হয় এবং সন্দেহ করার অবকাশ সাক্ষ্য আইনে নাই, কিন্তু conclusive ও মিথ্যা বলে প্রমাণিত হতে পারে।

১৩.২ একই বিষয়ে দলিল থাকলেও মুখের সাক্ষ্যতে ঐ দলিল সম্পর্কে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সাক্ষ্য দেওয়া চলবে, কিন্তু (৯১) নিজে দলিলের পক্ষ থাকলে তার মৌখিক সাক্ষ্যতে দলিল হেরফের হবেনা (৯২) (১) দলিল পন্ড, ভন্ড, জাল, মিথ্যা প্রমাণ করা যাবে (৯২) (২) মৌখিক চুক্তি থাকলে এবং দলিলে তা লেখা না থাকলে বলা যাবে "এই শর্তে বিনা মামলায় জমি ছেড়ে দিব ইত্যাদি" (৩) দলিল রেজিস্ট্রী না করা হয়ে থাকলে দলিল দাতা জীবিত থাকলে তা হেরফের বা রদবদল করতে পারবে (৪) রেজিষ্টি হয়ে গেলে আর মৌখিক সাক্ষ্য চলবে না এমনকি উইলের ক্ষেত্রেও নয়, উইলে রেজিষ্টেশন লাগে না, অনেকে করে সখে (৫) প্রথা সম্পর্কে বলা যাবে মেয়েরা নীচু জমি পায়, বাড়ীর জমি পায় না। (৬) স্থানীয় শব্দের ব্যাখ্যা চলবে পোয়া, পাখি, কেয়ার ইত্যাদি (৯৩) অচল দলিলকে সচল ও (৯৪) সচল দলিলকে অচল করা যাবে না (৯০) বিশেষ অর্থের ব্যাখ্যা চলবে "নারায়ণগঞ্জকে ঢাকা বল্লে" কারণ দলিল দাতার ঐ একই সময়ে নারায়ণগঞ্জে জমি আছে, ঢাকায় নাই (৯৬) কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে একজনকে বুঝানো হয়েছে, যেমন কোন একজনের কথা জিজ্ঞেস করা লজ্জাকর হলে কেউ বল্লো "আপনারা কেমন আছেন," উদ্দেশ্য ঐ 'একজনই' যার কথা মনে মনে পোষণ করা হচ্ছে (৯৭) দুটির ভিতর যেকোন এক ধরনের বিষয়ে একটিকে বুঝাতে আপনারা বল্লে। (৯৮) অস্পষ্ট শব্দ সম্পর্কে স্পষ্টীকরণ করা যায়। (৯৯) দলিলের পক্ষ নয় এমন লোক কোন কৃত চুক্তির কথা মনে করায়ে দিয়ে দলিলের বিষয়বস্তু বদলায়ে দিতে পারে– যেমন ছেলেদের নামে উইল করা সম্পত্তিতে তৃতীয় পক্ষের কেউ মনে করায়ে দিল যে কোন একজন গরীব মেয়েকে সম্পত্তি দানের কথা। উত্তরে দাতা বলেছিল ঐ ব্যাপারে আমার মনেরটি আমার মনে আছে। মনেরটি বাইরে লিখায়ে কৃত দলিলের বিষয়বস্তু বদলায়ে দিতে পারে অন্য একজন তৃতীয় পক্ষ যেমন, ভাই–বউ। (১০০) উইল মুখেও হতে পারে, রেজিষ্টেশন লাগে না। তাই ১৯২৫ সালের উত্তরাধিকার আইনের কোন অংশ উইল সম্পর্কে চলবে না।

১৩.৩ প্রমাণের দায়িত্ব কার, ওটা ১০১ হতে ১১৪ ধারায় আছে। যার রায় না হলে ঠকার সম্ভাবনা আছে, প্রমাণের দায়িত্ব তার। স্বাক্ষী সাবুদ, দলিল ইত্যাদি সেই জোগাড় করবে। ১১৫ হতে ১১৭ Estoppel বা স্বীকৃতির মাধ্যমে প্রমাণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সত্য দাবিতে। (১১৬) স্বীকৃতি বা তেমনি Tenent জমিদারের বাড়ীর মালিক বল্লেও একই অবস্থা হবে। (১১৭) চেকের বেয়ারারের বেলায়ও তাই

হবে। তখন দাবীদারকেই তা প্রমাণ করতে হবে যে ওসবের মালিক তারা। (১১৮) সাক্ষ্য সবাই দিতে পারে যে বুঝে সেই, যেমন বোবা, শিশু সবাই। পাগলও দিতে পারে যদি সাক্ষী দেয়ার সময় সে পাগল না থাকে। ৫ টাকার নোটকে যে ৫ টাকার নোটই বলে, সে পাগল হতে পারে না। পুলিশ দেখলে, পার্টি দেখলে যে ভয় পেয়ে ঠিক হয়, সেও পাগল নয়। (১২০) স্বামী–স্ত্রী আলাদা সত্ত্বা। ফৌজদারী দেওয়ানী উভয় ক্ষেত্রে একে অন্যের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে পারে। কিন্তু পিতাপুত্রে ও ভৃত্য-মনিবে পরস্পরের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারে না। ১২১ হতে ১৩১ কিছু ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্বলিত যোগাযোগ আছে সাক্ষীর সময় তা ফাঁস করার আইন নাই, যেমন (১) জজ ও ম্যাজিষ্টেট মামলাকালে যা জানলো (২) স্বামী স্ত্রী এতদসংক্রান্ত স্বার্থের প্রয়োজনের সময় যা জানলো (৩) সরকারী চাকরি করতে যেয়ে যা জানলো (৪) রাষ্ট্র সম্পর্কিত গোপন তথ্য (যার জন্য গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে মৃত্যুদন্ডও হতে পারে (৫) দোভাষীও বলতে পারবেনা (৬) কাজকর্ম করতে গিয়েও বলতে পারবে না, উকিল ও মক্কেলের ব্যাপার ফাঁস করতে পারবে না, কিন্তু বে-আইনী কাজ করতে যেতে উদ্যত হলে বলতে পারবে। (১৩২)।

১৩.৪ হলফ করে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে দন্ডবিধিতে শাস্তি হবে, কিন্তু সত্য বল্লে protection পাবে বন্দী হওয়া হতে বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্তি হতে, যদিও সাক্ষী আসামীর সাথে পরোক্ষভাবে জড়িয়ে যায় (১৩৩)। Accompliece বা দুষ্কর্মের দোসর তার বিবৃতি Corroborative evidence এ প্রমাণিত না হলে শুধু দোষ স্বীকারই অন্যান্যদের এবং তার শাস্তির কারণ হবে না (১১৪বি) ধারা মতে। (১৩৪) সাক্ষীর সংখ্যা ১ বা একাধিক হতে পারে। (১৩৫) আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতায় ফরিয়াদীর সাক্ষীকে আগে শুনা হয় CRPC বা CPC তে অন্য রকম বিধান উথাপিত না হলে (১৩৬) বিচার্য ঘটনা আগে শুনবে, না প্রাসংগিক ঘটনা আগে শুনবে এটাও আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা। ডাক্তার পরে পাওয়া না গেলে post mortem রিপোর্টই আগে, তারপর দেখা যাবে সত্যি মরেছে কিনা। মরাটাই বিচার্য বিষয়। post mortem প্রাসংগিক ।(১৩৭) Examination in Chief এর পর হয় Cross Examination; আদালতের অনুমতি নিয়ে Re-Examination হয়। সাক্ষী উল্টাপাল্টা বল্লে তাকে যে নিয়েছে তার বিরুদ্ধে বল্লে। (১৩৮) Further Re-examination হয় যদি সাক্ষী আবার নিজ দলে চলে যায়, তখন বিরোধীপক্ষ এটা পারে। বৈরী সাক্ষী আদালত কর্তৃক ঘোষণা লাগে। যে নিয়েছে তার বিরুদ্ধে বল্লেই সে হয়ে যায় বৈরী সাক্ষী। (১৩৯) দলিল হাজির করতে বল্লেই সাক্ষী হয় না, দলিলের বিষয়বস্তু না জানলে, তাকে জেরা করা যায় না (১৪০) চরিত্র সম্পর্কিত সাক্ষী যে দেয় তাকে জেরা করা ও তার পুনঃজবানবন্দী নেওয়া যাবে। (১৪১) Leading question এর উত্তর প্রশ্নেই থাকে (১৪২) একান্ত অবিতর্কিত ও প্রাথমিক

পরিচিতিমূলক না হলে Calling party তার সাক্ষীকে এটা করতে পারে না। বিরোধী পক্ষ জেরাতে এটা করতে পারে ধারা (১৪৩)। (১৪৪) দলিল থাকলে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক (সত্যায়িত নকল, জাবেদা নকল ইত্যাদি) দলিল হাজির করতে হবে। তার আগে মৌখিক সাক্ষ্য চল্‌বে না (১৪৫) Dying Declaration, বেচে অস্বীকার করলে তার স্মৃতি তাকে জাগায়ে দিতে হবে। (১৪৬) চরিত্র হননকারী প্রশ্ন করা যাবে, তার বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করার জন্য (১৪৭) সাক্ষীকে ১৩২ ধারার protection সহ যে কোন প্রশ্ন করা যাবে। (১৪৮) দেওয়ানী মামলায় চরিত্র অপ্রাসংগিক তবে, চরিত্র হননকারী প্রশ্নে দেওয়ানী ক্ষতিপূরণ দিতে হবে যদি তা হয় মেয়ে বিয়ে পাগল বলার জন্য ভালো জায়গায় বা উপযুক্ত জায়গায় বিয়ে না হলে। (১৪৯) ভিত্তিহিন প্রশ্ন ঠিক নয়। ১৫০ ধারা, যেমন যে মরা হাজার হাজার লোক দেখেছে সে সত্যি মরেছে কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা। (১৫১) অশালীন প্রশ্ন করতে আদালত নিষেধ করবেন (১৫২) অকারণ বিব্রতকর প্রশ্ন করতে আদালত নিষেধ করবেন (১৫৩) চরিত্র হননকারী প্রশ্নের উত্তর দিলে জেরা চলবে না। মিথ্যা বল্লে penal code এ শাস্তি হবে। (১৫৪) বৈরী সাক্ষী আদালত কর্তৃক ঘোষিত হতে হবে। বিরুদ্ধে গেলেই বৈরী হয়না, ঘুষ খেলে হয়। (১৫৫) সাক্ষী যে এনেছে তার কথাবার্তা শুনে সেই পক্ষ ঘুষের অভিযোগ আনতে পারে। (১৫৬) ডাকাতির পর অন্যান্য বাড়ীর দুর্ঘটনা প্রাসংগিক ঘটনা, যেমন ডাব খাওয়া ইত্যাদি। (১৫৭) পূর্ববর্তী সাক্ষ্য মনে করিয়ে দেয়া যায়, পরে অন্য রকম বল্লে। (১৫৮) Dying declaration- এর বহনকারীকে আটকা পড়া সাক্ষীদের এবং তার নিজের ব্যাপারে প্রশ্ন করা যায়। (১৫৯-১৬১) Refreshing the Memory Expert বইটি ও নথিটি দেখে নিতে পারেন। (১৬২) আদালত কোন পক্ষকে দলিল হাজির করতে বল্লে অন্য পক্ষ নিষেধ করলে ১৬৬ ধারা মতে ১ বৎসর এর জেল ও জরিমানা হবে। (১৬৩) সাক্ষী দলিল হাজির করলে তার উপর সাক্ষ্য দিতে বাধ্য থাকবে ঐ পক্ষ যে পক্ষ তা হাজির করতে বলেছে। (১৬৪) ঐ দলিল কোন পক্ষের নোটিশ পাবার পরও হাজির না করলে পরে তা ব্যবহার করা যাবে না তাতে স্বার্থ নিহিত থাকলেও। (১৬৫) সাক্ষীকে আদালত যে কোন প্রশ্ন করতে পারে বা দলিল উপস্থাপন করতে বলতে। পারে বিরোধীপক্ষ তার উপর আদালতের অনুমতি ব্যতীত জেরা করতে পারবেনা।

(১৬৬) অকার্যকর (১৬৭) উচ্চতর আদালত নিম্নতর আদালতের সামান্য ভুলভ্রান্তিতে প্রশ্ন করবে না যদি না তাতে মামলার রায়ের আমুল পরিবর্তন হয়। হাট বাজারের মত স্থানে বসেও রায় দিতে হয়, তাতে ভুলভ্রান্তি হতেও পারে।

১৩.৫ নানা সীমাবদ্ধতার কারণে বেগতিক অবস্থায় সমস্ত আইনকানুন বাস্তবায়িত করতে গেলে মানুষের জানমাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা আরো বিঘ্নিত হতে পারে। তাই

বলে বহু বছরের আইন, কুরান শরীফ বদলে ফেলা যায় না। বই লিখে আইন প্রণয়ন করা যায় না ইচ্ছামত; আইনে সংসদের অনুমোদন ও আইন মন্ত্রণালয়ের S.R.O নম্বর লাগে।

১৪.০ উপসংহার

১৪.১ সাক্ষ্য না থাকলে কোন বিচারকার্যই সম্ভবপর নয়। কী দেওয়ানী, কী ফৌজদারী, সব বিচারেই সাক্ষী লাগে। দেওয়ানী বা ফৌজদারীতে দলিলপত্র, মৌখিক সাক্ষ্য, ইট, কাঠ, ভাংগা গ্লাস, পিয়ালা ও চোকিও সাক্ষ্য সময়তে পানির ফোটা বা ফেনাও সাক্ষ্য হিসেবে কাজ করে; যে ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে; জীবিত মানুষ সাক্ষ্য না থাকলে বা না দিলে। তাই মিথ্যা সাক্ষ্য, শুনা সাক্ষ্য অপরিক্ষীত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় দেয়া ঠিক নয়।

১৪.২ লাশ পোষ্টমর্টেমে নেয়ার সময় গ্রামের বা এলাকার গণ্যমান্য দুইজন লোকের সামনে নিতে হয় এবং একই অবস্থায় ঐ দুইজন লোককে দেখায়েই দাফন করতে হয় যাতে মাঝপথে অতিরিক্ত কোন চিহ্ন লাশের গায়ে অন্য কোন চক্র, অন্য কোন উদ্দেশ্যে যেন বিভ্রান্ত করার জন্য মোটেই বসাতে না পারে। দাফন করা লাশটি কি একই লাশ না অন্য কোন লাশ তাও ভাল ভাবে দেখে নিতে হবে ঐ দুইজন লোককেই। এই দুইজন লোক সরকার পক্ষের সাক্ষী বা কোর্ট উইটনেস। লোকটিকে কে মেরেছে, কিভাবে মেরেছে, মারার পর কেস বিভ্রান্ত করার জন্য পুলিশ বা গ্রামের লোকজন বা গণ্যমান্য সাক্ষী দুইজন আসার আগে মরার পর কোন চিহ্ন বসানো হয়েছে কিনা তার সাক্ষী নয়।

১৪.৩ কোর্টে যারা যায় তারা সবাই আসামী নয়। নিরপেক্ষ বিচারের জন্য ভাল মানুষকেও সাক্ষী হয়ে কোর্টে যেতে সরকার বাধ্য করতে পারে। সাক্ষী সমন পেয়ে স্বেচ্ছায় না গেলে ওয়ারেন্ট দিয়ে নেওয়া হয়; তবে এ ধরনের ওয়ারেন্টে হাতকড়া লাগাবার নিয়ম নাই। সাক্ষ্য এ্যালাউন্স (সাক্ষীকে পাগল প্রতিপন্ন করা হয় নাই এই মত) সার্টিফিকেট কোর্ট হতে এনেই অফিস হতে সাক্ষীর এলাউন্স অথবা ভ্রমণ ভাতা গ্রহণ করতে হয়; যদি কোর্ট হতে সাক্ষীর এলাউন্স না নেওয়া হয়। পুলিশ বিভাগের কাউকে ওয়ারেন্ট দিয়ে সাক্ষী দিতে সরকার ডাকলে সেই অফিসার আসামী হিসাবে গণ্য হয়ে ভ্রমণ ভাতা, সাক্ষীর এলাউন্স কিছুই পান না বরং চাকুরী হতে সাসপেন্ড হন। পুলিশ অফিসারকে কেসের তারিখের খোঁজ খবর রাখতে হয়, অন্যত্র বদলি হয়ে গেলেও। তবে সমন এবং কেসের তারিখ না জানতে পারাটা একটি বিতর্কিত বিষয় এবং আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতার উপরেই পুলিশ অফিসারের ভাগ্য নির্ভর করে। এখানে যে কোন পুলিশ, যেমন সার্জেন্ট, কনষ্টেবলকেও পুলিশ অফিসার হিসেবে গণ্য করা হলো এবং সচরাচর যারা পুলিশ নয়, তারা এমনি গণ্য করে থাকে, এটাই রেওয়াজ।

গ্রন্থপঞ্জি

১। রহমান, গাজী শামছুর, *সাক্ষ্য আইনের ভাষ্য*, পল্লব পাবলিশার্স ৩১ মীরপুর রোড, ঢাকা, মে, ১৯৮৯ইং

২। Khan, Prof. A. A. *The Evidence Act. 1872* (First edition August 1977 As modified up to date) Khoshroz Kitab Mahal Banglabbazar, Dhaka.

৩। লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও কোর্টের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হিসেবে ভূমিকা।

৪। শাহবাগ একাডেমিতে উচ্চতর আইন ও প্রশাসন কোর্সে লেখকের অভিজ্ঞতা (ডঃ রফিকুর রহমানের বক্তৃতা)

৫। লেখকের মানিকগঞ্জ ও জামালপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ফিল্ড টেনিং এর অভিজ্ঞতা।

৬। সেক্স পিয়রের রোমিও জুলিয়েট হতে জানা যায়, মৃত ব্যক্তিকেও নির্দিষ্ট ঔষধ সেবন করায়ে নির্দিষ্ট সময় পর কবর থেকে উঠিয়ে জীবিত করা যায়।

৭। মহাশ্বেতা দেবী, '*রুদালী*', কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ১৯৯৩।

(বইটিতে আছে শুধু কেঁদেই ঘটনা প্রমাণ করানো যায় না; কাঁদার জন্য এক শ্রেণীর সম্প্রদায়ও আছে যারা টাকার বিনিময়ে কাঁদে। তেমনি কাঁদা হতেই আবেগ প্রবণ হয়ে কোন ঘটনা বিশ্বাস করা ঠিক নয়। তা ছাড়া কেঁদে না ভুলায়ে কঠিন হয়ে ঘটনার প্রমাণ উপস্থাপন করে মামলা জেতার চেষ্টা করা উচিত।)

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৭ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, আশ্বিন ১৪০৩

আঞ্চলিক সহযোগিতা ঃ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অভিজ্ঞতার তুলনামূলক পর্যালোচনা

গ্রন্থাগার সাময়িকী শাখা তারিখ... সাভার, ঢাকা

কাজী মোঃ শামসুল আলম*

১.০ ভূমিকা

দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দু'টি পরস্পর সন্নিহিত ভৌগোলিক রাজনৈতিক অঞ্চল। এ দু'টি অঞ্চলের একটিতে অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়ায় গঠিত হয়েছে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (South Asian Association for Regional Cooperation) বা সার্ক। অপরটিতে অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশীয়ায় গঠিত হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় জাতি সমূহের সংস্থা (Association of South East Asian Nations) বা আসিয়ান। দুটি সংস্থার মাঝে সার্ক অপেক্ষাকৃত নবীন। অনেকে আসিয়ানকে আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে একটি সফল ঘটনা বলে মনে করেন। আসিয়ান দেশগুলোর দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সিংগাপুর, কুয়ালালামপুর ও ব্যাংকক-কে বিশ্ব বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত করেছে। তথাপি প্রেক্ষাপট, পরিবেশ, পরিস্থিতির কারণে সার্ক-এর পক্ষে আসিয়ান-কে মডেল হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তবে সার্ক, আসিয়ান-এর বিকাশ থেকে, অনেক কিছুই শিক্ষণীয় হিসেবে পেতে পারে। এজন্যে এ দুটি সংস্থার পারস্পরিক তুলনা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দুটি সংস্থার তুলনামূলক আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা এ দুটি সংস্থার জন্ম ও বিকাশ নিয়ে আলোচনা করবো।

২.০ সার্ক ঃ জন্ম

২.১ দক্ষিণ এশিয়া পৃথিবীর অল্প কয়েকটি ভৌগোলিক অঞ্চলের একটি যেখানে আঞ্চলিক সহযোগিতার ধারণা অনেক দেরীতে বিকশিত হয়েছে। এর কারণও রয়েছে। এঅঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যকার ঐতিহাসিক শত্রুতা, সীমানা বিরোধ এবং রাজনৈতিক বৈচিত্র আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য অনুকূল ছিল না। সত্তরের দশকের শেষ দিকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে সরকারের পরিবর্তন সাধিত হয়। ভারতে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে সরিয়ে জনতা পার্টি, পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ক্ষমতাচ্যুত করে জেনারেল জিয়াউল হক এবং শ্রীলংকায় মিসেস বন্দরানয়ক-এর স্থলে জে, আর, জয়বর্ধন ক্ষমতায় আসেন। বাংলাদেশেও প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তাঁর ক্ষমতা সংহত করেন। এসব সরকারগুলো ছিল সাধারণভাবে পাশ্চাত্যের প্রতি সহানুভূতি

---

* উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সম্পন্ন। ১৯৭৮ সালে এ অঞ্চল সফরকালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রি জেমস কালাহান এই অঞ্চলের দেশগুলোর মাঝে শান্তি, সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের কথা বলেন, দেশগুলোর বহুপাক্ষিক সহযোগিতামূলক প্রকল্পে অর্থনৈতিক সহায়তারও আশ্বাস দেন।

২.২ আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রকৃত উদ্যোগ নেন বাঙলাদেশের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। ১৯৭৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান সফরকালে তিনি দু'দেশের নেতাদের সাথে এ বিষয়ে প্রাথমিক যোগাযোগ করেন। ১৯৭৮ সালে নেপালের রাজা বীরেন্দ্র-র বাংলাদেশ সফর এবং ১৯৭৯ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান-এর শ্রীলংকা সফরের সময়ও বিষয়টি আলোচনায় আসে। ১৯৮০ সালের মে মাসে তিনি অঞ্চলের সকল রাষ্ট্র নায়কদের কাছে আঞ্চলিক সংস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চিঠি লেখেন। তাঁর চিঠিতে অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকে সহযোগিতার সম্ভাব্য এলাকা হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন। সে বছরের জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে নিউইয়র্কে জাতিসংঘে তাঁদের সফরের সময় দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর পররাষ্ট্র মন্ত্রিরা প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা করেন। ২৫ নভেম্বর ১৯৮০ সালে আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্পর্কিত ওয়ার্কিং পেপার অঞ্চলের দেশগুলোর মাঝে বিতরণ করা হয়। আঞ্চলিক সহযোগিতার এই প্রস্তাব নিয়ে সাতটি দক্ষিণ এশীয় দেশের পররাষ্ট্র সচিবরা এপ্রিল, ১৯৮১ থেকে জুলাই, ১৯৮৩ পর্যন্ত পাঁচবার বৈঠকে বসেন। এসব বৈঠকের মাধ্যমে তাঁরা 'নয়াদিল্লী ঘোষণা' দলিল চূড়ান্ত করেন। দলিলে সম্মত নয়টি ক্ষেত্রে সহযোগিতার কাঠামো বর্ণনা করা হয় সাতটি দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রিরা আগষ্ট ১৯৮৩ তে নয়াদিল্লীতে মিলিত হয়ে 'নয়াদিল্লী' ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন। ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় সাতটি দক্ষিণ এশীয় দেশের সরকার প্রধানদের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে সার্ক আনুষ্ঠানিকভাবে তার যাত্রা শুরু করে।

৩.০ সার্ক ঃ বিকাশ

৩.১ সার্ক চার্টার অনুসারে সার্ক-এর অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন। বিষয়টি সার্ক-এর সূচনালগ্নে যতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল আজ এক দশক পরেও ততখানি গুরুত্বপূর্ণই রয়ে গেছে। গোঁড়াতে সার্ক সদস্য দেশগুলোর মাঝে সহযোগিতার পাঁচটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এর সংখ্যা বারোতে উন্নীত হয়। সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে ঃ-(১) কৃষি, (২) যোগাযোগ, (৩) শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং খেলাধুলা, (৪) পরিবেশ, (৫) স্বাস্থ্য এবং জনসংখ্যা কার্যক্রম, (৬) আবহাওয়া বিজ্ঞান, (৭) মাদকদ্রব্য পাচার ও মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার প্রতিরোধ, (৮) পল্লী উন্নয়ন, (৯) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, (১০) পর্যটন , (১১)পরিবহন ,(১২) উন্নয়নে নারী

৩.২ উপর্যুক্ত সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলোর প্রত্যেকটি একেকটি টেকনিক্যাল কমিটির আওতাভূক্ত। ১৯৯৬ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে পরিবেশ ও আবহাওয়া বিজ্ঞান সম্পর্কিত টেকনিক্যাল কমিটি দুটি একীভূত করা হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে আরো কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সার্ক-এর কর্মকান্ড সম্প্রসারিত হয়েছে যেমন-দারিদ্র

দূরীকরণ, সন্ত্রাস, শিশু, তরুণ ইত্যাদি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সার্ক দেশগুলো তাদের পারস্পরিক সহযোগিতার বিস্তার ঘটিয়েছে। ১৯৯১ সালে কলম্বোয় অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে সার্ক অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাণিজ্য ব্যবস্থা (সাপটা) SAARC Preferential Trading Arrangement (SAPTA) গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এর ফলে বাণিজ্যের মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সহযোগিতার সূচনা হয়। সাপটা (SAPTA) চুক্তিটি ঢাকায় ১৯৯৩ সালে এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত সপ্তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন চলাকালে স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির আওতায় আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য ধাপে ধাপে উদারীকরণের ব্যবস্থা রয়েছে। এতে মাঝে মাঝে বাণিজ্য আলোচনারও ব্যবস্থা রয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে সদস্য দেশগুলো একে অপরকে শুল্ক, আধা–শুল্ক ও অশুল্ক ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক সুবিধা দেবে। চুক্তিটি ৭ই ডিসেম্বর ১৯৯৫ সাল থেকে কার্যকর হয়েছে। ২২৬টি পণ্য বর্তমানে এর আওতাভুক্ত। সদস্য রাষ্ট্রগুলো এসব পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে পরস্পরকে বিশেষ শুল্ক রেয়াত দিতে সম্মত হয়েছে। সার্ক দেশগুলোর মধ্যকার আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্যের অবস্থা (সাপটা-পূর্ব) সারণি–১ এ দেখা যেতে পারে। ভুটান সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য না পাওয়ায় ভুটানকে বাদ দেয়া হয়েছে।

সারণি –১

সার্কভুক্ত দেশগুলোর* মোট আমদানী ও রপ্তানীর ভিতর আন্তঃ আঞ্চলিক আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ (%)

সাল	১৯৮১	১৯৮৭
শতকরা হার	৪.৯	৩.০

সূত্র ঃ IMF, Direction of Trade Statistics Yarbook, 1988.

১৯৯৩ সালে সার্ক চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর সদর দপ্তর করাচীতে অবস্থিত। সার্ক দেশগুলোর মাঝে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বিস্তারে এই সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৩.৪ ষষ্ঠ ও সপ্তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের ফলশ্রুতিতে সার্ক–এর দৃষ্টি দারিদ্র দূরীকরণের মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নিবদ্ধ হয়েছে। দক্ষিণ অঞ্চলের চল্লিশ কোটি লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। সে কারণে এর নিরসনের জন্য জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। কলম্বোতে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে দারিদ্রদূরীকরণ সম্পর্কিত স্বাধীন দক্ষিণ এশীয় কমিশন (Independent South Asian Commission on Poverty Alleviation) গঠিত হয়। সপ্তম সার্ক সম্মেলনের প্রাক্কালে কমিশন তার রিপোর্ট পেশ করে। সার্ক নেতৃবৃন্দ দারিদ্র দূরীকরণকে উচ্চ অগ্রাধিকার দিতে একমত হন। তাঁরা দারিদ্রের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি কর্মসূচি বাস্তবায়নের অংগীকার করেন যাতে সামাজিক উদ্যোগ (Social movilization) এবং বিকেন্দ্রীকৃত কৃষি ও মানবিক উন্নয়নের নীতি অন্তর্ভূক্ত থাকবে। দরিদ্রদের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়নেও নেতারা একমত হন। এরই ফলশ্রুতিতে দারিদ্র দূরীকরণের অভিজ্ঞতা

বিনিময়ের জন্য তিন স্তর বিশিষ্ট একটি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হয়। কাঠামোটিতে রয়েছে ঃ–

(১) দারিদ্র দূরীকরণ ও সামাজিক উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সচিবদের দল,

(২) অর্থ ও পরিকল্পনা সচিবগণ এবং

(৩) অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রিগণ

দারিদ্র দূরীকরণের বিষয়টিকে আরো গুরুত্ব দেয়ার অভিপ্রায়ে সার্ক ১৯৯৫ সালকে দারিদ্র দূরীকরণের জন্য সার্ক-বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে।

৩.৫ অষ্টম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন তহবিল (SADF) গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এই তহবিলের তিনটি জানালা থাকবেঃ

(১) প্রকল্প চিহ্নিত করা ও প্রকল্প উন্নয়ন,

(২) প্রাতিষ্ঠানিক ও মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ এবং

(৩) সামাজিক উন্নয়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ।

৩.৬ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সার্ক একেকটি বছরকে কোন একটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট করে সার্ক বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করছে। ১৯৮৯ সালকে 'মাদক দ্রব্য পাচার ও মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার রোধ' সার্ক বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। তেমনি ১৯৯৬ সাল 'সার্ক স্বাক্ষরতা বর্ষ' হিসেবে পালিত হচ্ছে। অধিকন্তু ১৯৯০ এর দশক 'সার্ক মেয়ে শিশু দশক' হিসেবে পালিত হচ্ছে।

৩.৭ উপর্যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে উদ্যোগ নেয়া ছাড়াও সার্ক চারটি আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। সার্ক কৃষি তথ্য কেন্দ্র (SAIC) ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সার্ক আবহাওয়া বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র (SMRC) ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সার্ক ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র (SDC) নয়া দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেন্দ্রগুলো তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে।

৩.৮ সাপ্টা (SAPTA) ছাড়াও সার্ক আরো তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক চুক্তি/সমঝোতা চূড়ান্ত করেছে। এগুলোর আওতায় রয়েছে খাদ্য, নিরাপত্তা, সন্ত্রাস এবং মাদকদ্রব্য। সন্ত্রাস ও মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত সমঝোতাগুলো ইতোমধ্যে সকল সদস্য দেশ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং সমঝোতাগুলোর সমর্থনে সদস্য দেশগুলো কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং সমঝোতাগুলোর সমর্থনে সদস্য দেশগুলো কর্তৃক আইন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে।

৩.৯ ১৯৮৬ সাল থেকেই সার্ক অঞ্চলের জনগণের মাঝে সংযোগ স্থাপনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে আসছে। সার্ক অডিও ভিজুয়াল বিনিময় কর্মসূচি (SAVE), সার্ক চেয়ার, ফেলোশীপ এবং বৃত্তি কর্মসূচি, সার্ক যুব স্বেচ্ছাসেবী কর্মসূচি এবং সার্ক ভিসা অব্যাহতি কর্মসূচি এক্ষেত্রে গৃহীত কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

৩.১০ অন্যান্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ও সহযোগিতার মাধ্যমে সার্ক তার কার্যপরিধিতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সমঝোতা স্মারক ও চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে সার্ক অনেকগুলো আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, যেমন,

আংকটাড (UNCTAD), এসকাপ (ESCAP), ইউনিসেপ (UNICEF), আপ্ট (APT), ইউএনডিপি (UNDP) এবং ইউএনডিসিপি (UNDCP) -র সাথে সহযোগিতামূলক সমঝোতায় আবদ্ধ হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে সার্ক দেশগুলো যৌথ অবস্থান গ্রহণ করছে। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতিসংঘ সম্মেলন থেকে শুরু করে সকল প্রধান আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সার্ক দেশগুলোর যৌথ অবস্থান গ্রহণ অক্ষুণ্ন রয়েছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দক্ষিণ এশিয়ার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অঞ্চলের দেশগুলো বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সাধারণ অবস্থান জোরালোভাবে প্রকাশ করতে পেরেছে।

৩.১১ উপযুক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়, যারা সার্ককে স্থবিরতায় আক্রান্ত একটি সংস্থা, যার ভবিষ্যত অনিশ্চিত বলে মনে করেন, তারা এর সঠিক মূল্যায়ন করতে সক্ষম হননি। গত এক দশকে সার্ক বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন করেছে। যদিও এ অগ্রগতি প্রত্যাশার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। কিন্তু দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও পারস্পরিক অবিশ্বাস পূর্ণ দক্ষিণ এশিয়ায় এ অগ্রগতিকে ছোট করে দেখার উপায় নেই। সার্ক এমন একটি বাহন যার মাধ্যমে শান্তি ও সমৃদ্ধির নতুন যুগে প্রবেশ করার জন্য দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো পরস্পরকে সহযোগিতা করতে পারে, যার ভিত্তি ইতোমধ্যেই স্থাপিত হয়েছে। এখন প্রয়োজন এ অঞ্চলের নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক সদিচ্ছা যা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার একশত কোটির অধিক জনগোষ্ঠিকে সমৃদ্ধ জীবন উপহার দিতে পারে।

৪.০ আসিয়ান ঃ জন্ম

৪.১ দক্ষিণ এশিয়ার চেয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার ইতিহাস পুরনো। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে প্রথম সত্যিকার প্রয়াস বলা যেতে পারে। আসা (ASA) বা দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় সংস্থা (Association of South-east Asia) গঠন। এর আগেকার আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রয়াসগুলো ছিল হয় রাজনৈতিক-সামরিক সংস্থা গড়ার অথবা এদের মূল অনুপ্রেরণা ছিল অঞ্চলের বাইরের কোন শক্তি। থাইল্যান্ড, মালয় ও ফিলিপাইনের সমন্বয়ে ১৯৬১ সালে আসা (ASA) গঠিত হয়। এই সংস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে এর পরবর্তী প্রয়াস ছিল ১৯৬৩ সালে মাফিলিন্দো (Maphilindo) গঠন। এর সদস্য দেশগুলো ছিল মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়া। আপাতঃ দৃষ্টিতে এর উদ্দেশ্যে ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তিনটি মালয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশকে একত্রিত করা। কাজেই সেদিক থেকে সংস্থাটিকে রাজনৈতিক বলা যায়। কিন্তু এর সামরিক বা তেমন কোন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছিলনা। এই সংস্থাটিও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

৪.২ এর পর আসে আসিয়ান। আসিয়ান গঠনের সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দুটি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। একটি উপ-অঞ্চল ছিল ক্ষুদ্রতর কিন্তু রাজনৈতিকভাবে অধিকতর দৃশ্যমান ইন্দোচীনের রাষ্ট্র সমূহ। অপর উপ-অঞ্চলটি ছিল দক্ষিণাঞ্চলে। এটি অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর, রাজনৈতিক দিক দিয়ে অধিকতর বৈচিত্রপূর্ণ, কম্যুনিষ্ট বিরোধী দেশসমূহের এলাকা। এদেশগুলোই আসিয়ান গঠন করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার

বিভক্তি তৎকালীন পৃথিবীর বিভক্তিকেই প্রতিফলিত করে। স্নায়ুযুদ্ধকালীন বিশ্ব তখন কম্যুনিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট বিরোধী শক্তিসমূহের মাঝে বিভক্ত ছিল। কম্যুনিষ্ট বিরোধী দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর চীন ভীতির সাথে সে সময় যোগ হয় ভিয়েতনাম সম্পর্কে তাদের উদ্বেগ। ভিয়েতনাম ইতোপূর্বে ফ্রান্সকে পরাজিত করে এবং মার্কিন সামরিক শক্তিকে সে তখন বৃদ্ধাংগুলি প্রদর্শন করছিল। কম্যুনিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট বিরোধী শক্তিসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আসিয়ান–এর জন্ম, বিকাশ ও কাঠামোকে প্রভাবিত করে। সাধারণ হুমকির মোকাবেলায় আসিয়ান দেশগুলো নিজেদের মাঝে সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভব করে। তাছাড়া এর ফলে আসিয়ান পাশ্চাত্যের সংগে অধিকতর নৈকট্য অনুভব করে। উপর্যুক্ত পরিস্থিতিতে ১৯৬৭ সালের ৮ই আগষ্ট ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, সিংগাপুর ও থাইল্যান্ড এর পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং মালয়েশিয়ার উপ–প্রধান মন্ত্রিদের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দক্ষিণ–পূর্ব এশীয় জাতিসমূহের সংস্থা আসিয়ান (ASEAN) গঠিত হয়। আসিয়ান গঠনের সময় এর প্রতিষ্ঠাতাদের চিন্তায় নিরাপত্তার বিষয়টি মুখ্য হলেও এটা প্রকাশ্যে উল্লেখ্য হয়নি। আঞ্চলিক বিবাদগুলোর মীমাংসা আসিয়ান–এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নিরাপত্তা বৃদ্ধি করবে, এমনটি ধারণা করা হয়েছিল। এ উদ্দেশ্যে পাঁচটি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার সবগুলো রাষ্ট্রকেই কালক্রমে আসিয়ান–এর সদস্য করার আশা করেছিল। কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধের অবসান না হওয়া পর্যন্ত তাদের এই আশা বাস্তবায়িত হয়নি (যদিও ব্রুনেই সালতানাত ১৯৮৪ সালের জানুয়ারীতে আসিয়ান–এ যোগ দেয়, এর দ্বারা আসিয়ান–এর উপ–অঞ্চলগত প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয়নি)। অতি সাম্প্রতিককালে অর্থাৎ ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে ভিয়েতনাম আসিয়ান–এর সদস্য হিসেবে যোগ দিয়েছে। এই অঞ্চলের অপর তিনটি রাষ্ট্র অর্থাৎ লাওস, কম্বোডিয়া ও মায়ানমার–এর আসিয়ান–এ যোগ দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

৫.০ আসিয়ান ঃ বিকাশ

৫.১ আসিয়ান–এর ঘোষিত মুখ্য উদ্দেশ্যগুলো ছিল আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, সামাজিক অগ্রগতি সাধন ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটানো। এসব উদ্দেশ্য খুব সামান্যই অর্জিত হয়েছে। তাদের মোট বাণিজ্যের তুলনায় আসিয়ান দেশগুলোর নিজেদের মধ্যকার বাণিজ্যের শতকরা হার সত্তরের দশকে হ্রাস পায়। কেবল মাত্র সাম্প্রতিককালে এই হার আসিয়ান–এর জন্মের সময়কার অর্থাৎ ১৯৬৭–র পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে (দুই নম্বর সারণি দেখুন)।

সারণি –২

আসিয়ান–এর মোট রপ্তানীর ভিতর আন্তঃ আসিয়ান রপ্তানীর পরিমাণ (%)

১৯৬৭	১৯৭০	১৯৭৫	১৯৮০	১৯৮৫	১৯৯০	১৯৯৪
২০.৯	২১.৪	১৭.২	১৭.৯	১৯.২	১৯.৩	২০.৮

সূত্র ঃ John RaVenhill, Economic Cooperation in South-East Asia : Changing incentives, Asian Survey, Vol. XXXV. No. 9. September 1995, pp. 85.

১৯৭৭ সালে আসিয়ান রাষ্ট্র/সরকার প্রধানগণ অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাণিজ্য ব্যবস্থা (Preferential Trading Arrangement -PTA) বাস্তবায়নে সম্মত হন। এর আওতায় আসিয়ান দেশসমূহের উৎপাদিত পণ্যের আঞ্চলিক বাজারে প্রবেশে বিশেষ সুবিধা লাভ করার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হচ্ছে সদস্য দেশগুলো পিটিএ (PTA)-কে একটি হাস্যাস্পদ বিষয়ে পরিণত করে। আসিয়ান দেশগুলো এমনসব পণ্যে বিশেষ শুল্ক রেয়াত দেয় যেগুলো হয় এই অঞ্চলে উৎপাদিত হয় না অথবা এসবের বাণিজ্য অঞ্চলে প্রচলিত নেই। যেমন-ইন্দোনেশিয়া পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র অথবা ফিলিপাইন সড়ক ও রেলপথ থেকে বরফ সরানোর যন্ত্রের উপর বিশেষ শুল্ক রেয়াত দেয়। এক দশক পর দেখা যায় পিটিএ (PTA)-এর আওতায় বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত পণ্য সমূহের বাণিজ্য আন্তঃআসিয়ান বাণিজ্যের শতকরা এক ভাগেরও কম। যদিও আসিয়ান দেশগুলো ষোল হাজার পণ্যের উপর পিটিএ (PTA)-র আওতায় বিশেষ শুল্ক রেয়াত দেয়। এই প্রেক্ষাপটে আসিয়ান রাষ্ট্র/সরকার প্রধানদের ১৯৯২ সালের জানুয়ারী মাসে আসিয়ান অবাধ বাণিজ্য এলাকা (ASEAN free Trade Area) গঠনের ঘোষণা বেশ কৌতূহল উদ্দীপক। আসিয়ান রাষ্ট্র/সরকার প্রধানগণ তাঁদের সিংগাপুর ঘোষণায় উল্লেখ করেন, আন্তঃআসিয়ান বাণিজ্য সকল শিল্প পণ্য এবং প্রক্রিয়া জাত কৃষি পণ্যের উপর শুল্ক হার ১৯৯৩ সালের জানুয়ারী থেকে পনের বছরের ভিতর ০-৫% এ কমিয়ে আনা হবে। ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত মন্ত্রি পর্যায়ের বৈঠকে এই সময়সীমা দশ বছরে কমিয়ে আনা হয়। আফটা (AFTA) সম্পর্কে মূল্যায়ন করার সময় এখনো আসেনি। সদস্য দেশগুলো আফটা (AFTA) বাস্তবায়নে কতখানি আন্তরিক হবে তার উপরই এর সাফল্য নির্ভর করছে।

৫.২ অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে আসিয়ান-এর অর্জন সীমিত হলেও রাজনৈতিক ঐক্য অর্জন ও কূটনৈতিক সাফল্যের ক্ষেত্রে আসিয়ান-এর অগ্রগতি অভাবনীয়। তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার তুলনায় আসিয়ান লক্ষণীয় আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করেছে। আসিয়ান পররাষ্ট্র মন্ত্রিদের সাথে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও কানাডা-র মন্ত্রি এবং ইউরোপিয় ইউনিয়নের একজন সমপর্যায়ের প্রতিনিধির বাৎসরিক মত বিনিময় অনুষ্ঠান এই সংস্থার আন্তর্জাতিক মর্যাদার ইংগিতবহ। বর্তমান বছরেই ইউরোপিয় ইউনিয়নের পনেরটি দেশের সরকার প্রধানগণ আসিয়ান দেশগুলোর সরকার প্রধান এবং চীন, জাপান ও দঃ কোরিয়ার সরকার প্রধানদের সাথে থাইল্যান্ডে এক শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়েছেন। এটাও আসিয়ান-এর আন্তর্জাতিক মর্যাদাকেই প্রতিফলিত করে।

৫.৩ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আসিয়ান-এর উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলোর মাঝে রয়েছে জপফ্যান (ZOPEAN) ঘোষণা। ১৯৭১ সালের ২৬-২৭ নভেম্বর আসিয়ান পররাষ্ট্র মন্ত্রিরা কুয়ালালামপুর-এ বৈঠকে মিলিত হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে শান্তি, স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার এলাকা (Zone of Peace, Freedom and Neutrality) হিসেবে ঘোষণা করেন। তাঁরা এলাকাটিকে বাইরের শক্তিসমূহের যে কোন প্রকার হস্তক্ষেপের আওতামুক্ত বলেও ঘোষণা দেন। ১৯৭৫ সালে ইন্দোচীনে কম্যুনিষ্ট বিপ্লব

চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছা অর্থাৎ দক্ষিণ ভিয়েতনাম, লাওস ও কম্বোডিয়ায় মার্কিন সমর্থিত সরকারের পতন পর্যন্ত জপফ্যান (ZOPEAN) ঘোষণা নিষ্ক্রিয়ই থেকে যায়। ইন্দোচীনে কম্যুনিষ্ট বিজয়ের পটভূমিতে ১৯৭৬ সালে বালী–তে অনুষ্ঠিত আসিয়ান সরকার প্রধানদের প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল গৃহীত হয়। দলিল দুটি হচ্ছে (ক) বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি এবং (খ) আসিয়ান কনকর্ড ঘোষণা। রাজনৈতিক সহযোগিতার বিষয়টিকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য বালী সম্মেলন তাৎপর্যপূর্ণ। আসিয়ান কনকর্ড–এ যৌথ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আসিয়ান–এর ভূমিকার বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করা হয় এবং শান্তির এলাকা (ZOPEAN) ফর্মুলাটি এতে অন্তর্ভূক্ত হয়। সংস্থা রাজনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সহযোগিতা অর্জনের প্রয়াস পায়। কিন্তু সংস্থার আদর্শগত পরিচয় ভৌগোলিক বিস্তারের পক্ষে বাধা হয়ে দাড়ায়, যা এ ধরনের সহযোগিতার বৃহত্তর কাঠামো প্রস্তুত করতে পারত। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য আরো সীমিত যৌথ উদ্যোগ নেয়া হয়। আসিয়ান কনকর্ড–এ আন্তঃআঞ্চলিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিষ্পত্তির বিষয়টি উল্লেখিত হয়। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বালীতে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে আঞ্চলিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা সম্পন্ন হাই কাউন্সিল (High Council) এর ব্যবস্থা রাখা হয়।

৫.৪ ১৯৭৮ সালের ২৫ শে ডিসেম্বর ভিয়েতনাম কম্বোডিয়া আক্রমণ করে। ভিয়েতনাম–এর কম্বোডিয়া দখল থাইল্যান্ড–এর নিরাপত্তাকে হুমকির সম্মুখীন করে। জাতীয় সার্বভৌমত্বের পবিত্রতার ধারণা যা আসিয়ান–এর বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার চুক্তিতে সন্নিবেশিত ছিল তাও এই দখলদারীত্বের ফলে লংঘিত হয়। ফলশ্রুতিতে আসিয়ান ঐক্যবদ্ধভাবে কম্বোডিয়ায় ভিয়েতনামী দখলদারিত্বের বিরোধিতা করে এবং কম্বোডিয়া হতে ভিয়েতনামী সৈন্য অপসারণের দাবী জানায়। ১৯৮৩ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর জাকার্তায় অনুষ্ঠিত সভায় আসিয়ান পররাষ্ট্র মন্ত্রিরা কম্বোডিয়া–র স্বাধীনতার জন্য আবেদন জানান। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে আসিয়ান–এর অব্যাহত চাপ কম্বোডিয়া থেকে ভিয়েতনামী সৈন্য অপসারণ ত্বরাণ্বিত করে।

৬.০ সার্ক ও আসিয়ান ঃ তুলনা

(১) ব্যাংকক ঘোষণা ও নয়াদিল্লী ঘোষণার উদ্দেশ্য ছিল সদস্য দেশগুলোর সহযোগিতার কতগুলো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণে একত্রিত হওয়ার বিষয়টি জানানো।

(২) উভয় দলিলেই বলা হয় সংস্থাটি হবে আন্তঃসরকার (inter-governmental) সংস্থা Supra-national সংস্থা নয়।

(৩) উভয় দলিলেই নিজস্বভাবে পরাশক্তি সংযোগ ও পরাশক্তি মৈত্রী থেকে সংস্থাকে দূরে রাখা হয়েছে।

(৪) আসিয়ান–এ কোন সদস্য রাষ্ট্রকে ভেটো ক্ষমতা দেয়া হয়নি। সার্ক–এর ক্ষেত্রে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে কার্যত সকল সদস্য রাষ্ট্রকেই ভেটো ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

(৫) সার্ক–এর ক্ষেত্রে দ্বিপক্ষীয় ও বিতর্কিত বিষয়গুলোকে আলোচনার বাইরে রাখা হয়েছে। আসিয়ান–এর ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন বিধি নিষেধ নেই। আসিয়ান–এর ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে প্রভাবিত করে অথবা আঞ্চলিক শান্তি বিঘ্নিত করে এমন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য মন্ত্রি পর্যায়ের একটি High Council-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

(৬) সার্ক ও আসিয়ান উভয়ের সদস্যপদ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অন্যান্য দেশের জন্য উম্মুক্ত রাখা হয়েছে।

(৭) আসিয়ান স্ট্যান্ডিং কমিটি (AMM) স্বাগতিক দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রি এবং অন্যান্য সদস্য দেশের রাষ্ট্রদূতদের সমন্বয়ে গঠিত। সার্ক স্ট্যান্ডিং কমিটি পররাষ্ট্র সচিবদের সমন্বয়ে গঠিত। শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনকারী দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রি স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

(৮) আসিয়ান চূড়ান্ত দলিলে (Concord) স্পষ্টভাবে রাজনৈতিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দলিলে বলা হয়েছে সদস্য রাষ্ট্রগুলো একক ও সমষ্টিগতভাবে শান্তি, স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার এলাকা (ZOPEAN) প্রতিষ্ঠায় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সার্ক চূড়ান্ত দলিলে (Charter) রাজনৈতিক বিষয়ের উল্লেখ নেই।

(৯) উভয় সংস্থাই সহযোগিতার কর্মসূচি বাস্তবায়নের চাইতে কর্মসূচি বাস্তবায়নের বাহন (Machinery) প্রস্তুতেই বেশী সময় ব্যয় করেছে।

(১০) উভয় সংস্থাই তাদের অঞ্চলের রাজনৈতিক নিরাপত্তার চাহিদার চাইতে অর্থনৈতিক চাহিদার দিকেই বেশী মনোযোগ দিয়েছে। বিশেষতঃ সামরিক দিকে খুব সামান্যই দৃষ্টি দেয়া হয়েছে।

(১১) উভয় সংস্থার ক্ষেত্রেই সহযোগিতার ফল প্রত্যাশার চেয়ে কম হয়েছে।

(১২) সদস্য দেশসমূহের মাঝে আয়তনগত ও জনসংখ্যাগত বৈষম্য সার্ককে যতখানি প্রভাবিত করেছে, আসিয়ানকে ততখানি করেনি।

(১৩) সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার বিরোধ সার্ক ও আসিয়ান উভয় সংস্থার অগ্রগতিকেই ব্যাহত করেছে। মালয়েশিয়া এবং ফিলিপাইনের মধ্যকার সাবাহ বিরোধ আসিয়ান এর অগ্রগতিকে প্রভাবিত করেছে। ঠিক তেমনি কাশ্মীর নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের বিরোধ সার্ক–এর অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে।

(১৪) সার্কভূক্ত দেশগুলোর মাঝে বাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে সার্ক অগ্রাধিকার ভিত্তিকে বাণিজ্য ব্যবস্থা (SAARC preferential Trading Arrangement—SAPTA) গত ৭ ডিসেম্বর ১৯৯৫ থেকে কার্যকর হয়েছে। ২২৬টি পণ্য বর্তমানে এর আওতাভূক্ত। সদস্য রাষ্ট্রগুলো এসব পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে পরস্পরকে বিশেষ শুল্ক রেয়াত দিতে সম্মত হয়েছে।

আসিয়ান দেশগুলো ১৯৯২ সালের সিংগাপুর ঘোষণায় আসিয়ান অবাধ বাণিজ্য এলাকা (ASEAN Free Trade Area) গঠনের সিদ্ধান্ত জানায়। তারা শিল্পজাত দ্রব্য এবং প্রক্রিয়াজাত কৃষি পণ্যের উপর আরোপিত শূল্ক হার ১৯৯৩ সালের জানুয়ারী থেকে

পনের বছরের ভিতর ০–৫% এ কমিয়ে আনার ব্যাপারে একমত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বরে এই সময়সীমা দশ বছরে কমিয়ে আনা হয়।

৭.০ উপসংহার

৭.১ এই প্রবন্ধে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে সার্ক ও আসিয়ান–এর মাঝে তুলনামূলক আলোচনা করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। আশি ও নব্বই–এর দশকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আসিয়ান দেশগুলোর অভূতপূর্ব অগ্রগতি, আসিয়ানকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি সফল আঞ্চলিক সংস্থার ভাবমূর্তি এনে দিয়েছে। উত্তরের শিল্পোন্নত দেশগুলোর সাথে দর কষাকষিতে আসিয়ান দেশগুলোর যৌথ অবস্থান তাদের অনেকখানি সুবিধাজনক পর্যায়ে উন্নীত করেছে। যদিও দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও আসিয়ান দেশগুলোর মধ্যকার আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্যের পরিমাণ আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়নি। এ কারণে অনেকে আসিয়ানকে একটি সফল আঞ্চলিক সংস্থা হিসেবে স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করেন। তথাপি সংস্থাটির রাজনৈতিক সুফল নিয়ে দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ নেই। আসিয়ান সৃষ্ট রাজনৈতিক সদিচ্ছার কারণে আসিয়ান দেশগুলো বিগত তিন দশক পারস্পরিক বিবাদ বিসম্বাদ থেকে অনেকখানি মুক্ত থেকেছে যা তাদের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ যুগিয়েছে।

৭.২ অপরদিকে সার্ক–এর বয়স এক দশক পূর্ণ হলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর ভাবমূর্তি তেমন উজ্জ্বল নয়। সংস্থাটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন করলেও এর সদস্য দেশগুলো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চমকপ্রদ অগ্রগতি অর্জনের সক্ষম হয়নি। সদস্য দেশগুলোর মধ্যকার আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়নি। সদস্য দেশগুলোর মধ্যকার বিবাদ নিরসনেও সংস্থাটি কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। কাজেই নবীন সংস্থা সার্ক তার চেয়ে পরিণত সংস্থা আসিয়ান–এর সাফল্য ও ব্যর্থতা থেকে অনেক কিছুই শিক্ষণীয় হিসেবে নিতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Nasir A. Nagash, *SAARC: Challenges And Opportunities,* Ashis Publishing House, New Delhi, 1994.
2. Emajuddin Ahmed & Abul Kalam (eds), *Bangladesh, South Asia and the World.* Academic Publishers, Dhaka. 1992.
3. Bhabani Sen Gupta (ed), *SAARC-ASEAN : Prospects and Problems of Inter-regional Cooperation,* South Asian Publishers, New Delhi, 1988.
4. Micchaeel, Leifer, *ASEAN And the Security of South-East Asia,* Routledge, London and New York, 1989.
5. SAARC IN Brief, *Information and Media Wing of SAARC Secretariat,* Kathmandu, 1995.
6. Anu Mahmud, *Economic Benefits of SAPTA,* The Independent, January 24-25, 1996.
7. John Ravenhill, *Economic Coopertion in South-East Asia: Changing Incentives,* Asian Survey, Vol. XXXV. No. 9. September 1995.
8. E Sudhakar, *SAARC : Origin, Growth and Future,* Gyan Publishing House, New Delhi, 1994.

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৭ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, আশ্বিন ১৪০৩

গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া ও বাংলাদেশের পরিবেশে তার প্রভাব

সৈয়দ শামসুল আলম*

১.০ ভূমিকা

১.১ পৃথিবীতে প্রাণীর অস্তিত্বের জন্য দরকার পরিমিত আলো, বাতাস, পানি এবং তাপসহ মৌলিক কতগুলো উপাদান। মানুষ এবং প্রাণী জগতের সবার সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার জন্য এই মৌলিক উপাদানসমূহের গুরুত্ব অপরিসীম। পৃথিবীর পৃষ্ঠে কোন স্থানে যদি কোন কৃত্রিম অথবা প্রাকৃতিক কারণে সমন্বিত এই মৌলিক উপাদানসমূহের পরিমাণের মাত্রার তারতম্য ঘটে তাহলে সেখানকার মানুষ এবং অন্য কোন প্রাণীর অস্তিত্বের উপর দেখা দেয় মারাত্মক হুমকি।

১.২ বৈজ্ঞানিকদের মতে পৃথিবীর বায়ু মণ্ডলের বাইরে এবং বায়ু মণ্ডলের ভিতরে প্রাকৃতিক কারণে আবহাওয়ার যে সামান্য পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে তার উপর মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এই পরিবর্তন এত মন্থর এবং মৃদু যে ক্রমান্বয়ে মানুষ এবং প্রাণীকুল নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। অপর দিকে মানুষের কার্যকলাপের ফলে কৃত্রিম উপায়ে বায়ু মণ্ডলের যে পরিবর্তন সাম্প্রতিক কালে দেখা যাচ্ছে, তার প্রভাব এত ব্যাপক এবং সুদূর প্রসারী যে মানুষ এবং প্রাণীকূলের স্বাভাবিক জীবন বিঘ্নিত হচ্ছে, অপর দিকে তা গোটা পৃথিবীকে একটা বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আবহাওয়ার এই বিপর্যয়ের কারণে মানব জাতি যে অকল্পনীয় ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে, সে সম্পর্কে এখন থেকে সচেতন না হলে সেই ধ্বংসযজ্ঞ কেবল আণবিক বিভীষিকার সাথে তুলনা করা যাবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

১.৩ আলোচ্য প্রবন্ধে মানুষের উন্নয়নের নামে অপরিকল্পিত কার্যকলাপের ফলে সৃষ্ট কৃত্রিম পরিবেশ প্রতিক্রিয়া, গ্রীণ হাউজ প্রতিক্রিয়া এবং আমাদের দেশে তার নেতিবাচক প্রভাব আলোচনা করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া (Green-house Effect) একটি জটিল প্রক্রিয়া (Complex mechanism)। এই প্রক্রিয়াকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা নেয়া একান্ত আবশ্যক।

১.৪ প্রবন্ধের প্রথমার্ধে বায়ুমণ্ডল ও গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার জটিল প্রক্রিয়া আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধে গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের উপর বর্তমানে যে প্রভাব পড়েছে এবং ভবিষ্যতে কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে বলে বৈজ্ঞানিকরা মনে করছেন তা আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধের তৃতীয়াংশে গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার নেতিবাচক

---

* উপ পরিচালক

প্রভাব কমিয়ে আনার কৌশল সমূহ এবং জাতীয় পর্যায়ে কি ধরনের নীতি প্রণয়ন করা সমীচীন তা আলোচনা করা হয়েছে।

(ক) বায়ুমন্ডল

১.৫ বায়ুমণ্ডল পৃথিবী পৃষ্ঠের নির্দিষ্ট উচ্চতার মধ্যে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত একটি বায়বীয় আবরণ। এই বায়ু মণ্ডল প্রাণীকুলের অস্তিত্বের জন্য অনেক কিছু করে থাকে, এর মধ্যে বেঁচে থাকার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা অন্যতম। এই বায়ুমণ্ডল ছাড়া ভূপৃষ্ঠে থাকবে না বাতাস, থাকবে না আলো, থাকবে না প্রয়োজনীয় তাপ, থাকবেনা মেঘমালা, চমকাবেনা বিদ্যুৎ, ঘটবেনা বৃষ্টিপাত ও তুষারপাত, জ্বলবে না আগুন। এছাড়া বায়ুমণ্ডল ব্যতীত বিষুবরেখা বরাবর দিনে তাপমাত্রা বাড়বে ৮২^{O} ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং রাতে এই তাপমাত্রা নেমে আসবে–১৪০^{o}সেন্টিগ্রেড হিমাংকের নিচে। মোট কথা এই বায়ুমণ্ডল ছাড়া পৃথিবীপৃষ্ঠ চন্দ্রপৃষ্ঠের ন্যায় প্রাণহীন একটি গ্রহে পরিণত হবে।

১.৬ সুক্ষ্ম বিবেচনায় বায়ুমণ্ডলের নির্দিষ্ট কোন সীমা রেখা নেই। তবে বৈজ্ঞানিকরা পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে উর্ধাকাশে বায়ুমণ্ডলের বৈশিষ্ট এবং উচ্চতার ভিত্তিতে চারটি প্রধান স্তরে ভাগ করেছেন। সারণি–১ এ বায়ুমণ্ডলের প্রধান স্তর সমূহের উচ্চতা, তাপমাত্রা এবং তাদের প্রধান রাসায়নিক উপাদান সমূহ দেখানো হলো।

সারণি–১

বায়ুমন্ডলের প্রধান স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	উচ্চতা (কি.মি.)	তাপমাত্রা ((সেন্টিঃ)	রাসায়নিক উপাদান
ট্রোপোস্ফেয়ার (Troposphere)	১০–১৬	১৫–৬০	$N_2O_2CO_2$ H_2O
ষ্টাটোস্ফেয়ার (Stratosphere)	১৬–৫০	–২–৫০	0_3
মেসোস্ফোয়ার (Mesosphere)	৫০–৮৫	–২–৯২	0_2+NO +
থার্মোস্ফেয়ার (Thermosphere)	৮৫–৫০০	–৯২ থেকে ১২০০	0_2+O+NO

সূত্র ঃ Inderjeet Sethi, et al, Environmental Pollution : Causes, Effects & Control, (Commonwealth Pub. New Delhi, 1991)

১.৭ বায়ুমণ্ডলের নির্মল বাতাস পরীক্ষা করে দেখা গেছে, পৃথিবী পৃষ্ঠের ১৬ কিলোমিটার উচ্চতার মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ এবং ৩০ কিলোমিটার উচ্চতার মধ্যে শতকরা ৯৯ ভাগ বায়ুমণ্ডলীয় উপাদান সমূহ বিদ্যমান। পরীক্ষায় আরো দেখা গেছে বায়ুমণ্ডলের এই বাতাস ১৭ প্রকার গ্যাসীয় উপাদানে গঠিত। সাম্প্রতিক কালে কোন কোন সমীক্ষায় এই সংখ্যা ৪৪টি পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। বাতাসে এই সকল উপাদান একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। কোন স্থানের নির্মল বাতাসে এই সকল উপাদান যে পরিমাণে বিদ্যমান থাকে তার একটি চিত্র নিম্নের সারণি–২ এ দেখানো হলোঃ–

সারণি –২

নির্মল বাতাসে রাসায়নিক উপাদানের উপস্থিতির বিবরণ

ক্রমিক নং	উপাদানের বিবরণ	উপস্থিতির শতকরা হার
১।	নাইট্রোজেন	৭৮.০৮৪
২।	অক্সিজেন	২০.৯৪৭
৩।	আর্গণ	০.৯৩৪
৪।	কার্বন–ডাই–অক্সাইড	০.০৩১
৫।	নিয়ণ	০.০০১
৬।	হিলিয়াম	০.০০০৫
৭।	মিথেন	০.০০০২
৮।	ক্রিপ্টন	০.০০০১
৯।	সালফার–ডাই–অক্সাইড	০.০০০০১
১০।	হাইড্রোজেন	০.০০০০৫
১১।	নাইট্রোয়াস অক্সাইড	০.০০০০৫
১২।	জিনোণ	০.০০০০০০৮
১৩।	ওজোন	গ্রীষ্মে ০–০.০০০০৭ শীতে ০–০.০০০০২
১৪।	নাইট্রোজেন–ডাই–অক্সাইড	০.০০০০২
১৫।	আয়োডিন	০.০০০০০১
১৬।	এমোনিয়া	০ থেকে অতি ক্ষুদ্রতম
১৭।	কার্বন মনো অক্সাইড	০.১ পিপিএম থেকে ০.২ পিপিএম

উৎস : B. Larson nah, "Combatting the Green house effect", in Finance and Development, Dec 1992 P.20

১.৮ সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে বায়ুমণ্ডলের প্রধান উপাদান হচ্ছে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন যথাক্রমে ৭৮ ও ২১% শতাংশ, বাকী ১৫টা স্বল্প মাত্রার অন্যান্য গ্যাস। এই গ্যাস গুলো বায়ুমণ্ডলে স্ব–স্ব পরিমাণ বিদ্যমান থেকে সৌর ও মহাজাগতিক বিচ্ছুরণ শুষে নেয়ায় এক বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমরা জানি মাধ্যাকর্ষণের কারণে পৃথিবী পৃষ্ঠের কাছাকাছি গ্যাস সমূহের ঘনত্ব বাড়ে এবং ভূ–পৃষ্ঠ থেকে দূরত্ব যত বাড়ে এই গ্যাস সমূহের ঘনত্ব তত কমে আসে। একটি সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে যে, ভূ–পৃষ্ঠে বায়ুর গড় ঘনত্বের পরিমাণ প্রতি ঘন মিটারে ১.২ কিলোগ্রাম এবং চাপ প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ১ কিলোগ্রাম বা প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১৪ পাউন্ড[১]।

১.৯ বায়ুমণ্ডলের এই গ্যাস সমূহের মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো ভূ–পৃষ্ঠের নিচের ঘন স্তরে বিচ্ছুরিত, প্রতিফলিত এবং পরিশোধিত হয়ে ৪৬ শতাংশ পৃথিবীর শক্ত মৃত্তিকা আবরণে তাপ হিসেবে শোধিত হয়[২]। শক্তির এই সংযোগ পৃথিবী পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা ৫৭° ফারেনহাইটে উন্নীত করে জীবনের উন্মেষ সম্ভব করে তোলে[২]। আসলে পৃথিবী পৃষ্ঠ যে ভাবে তাপ বিকিরণ করে, ঠিক সেই ভাবেই বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরের তাপ মহাশূন্যে ছড়িয়ে যায় এবং নিম্নাংশে ভূ–পৃষ্ঠ পুনঃশোষণ করে। এই নেয়া–দেয়ার নীট ফল দাড়ায় এই যে, দেয়া–নেয়া এক সংগে মিলে যতটা তাপ মহাশূন্যে হারিয়ে ফেলে ঠিক ততটা তাপ বিকিরণ থেকে সংগ্রহ করে, ফলে বায়ুমণ্ডলে এক ধরনের সমতা রক্ষিত হয়[৩]।

২.০ গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া

২.১ পৃথিবীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পরিশোধন এবং পরিমার্জন এর ব্যাপারে বায়ুমণ্ডল যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদ সমূহ থেকে কিছু অনুধাবন করা গেল। বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর পৃষ্ঠকে একাধারে যেমন মানুষ এবং অপরাপর সকল প্রাণী বসবাসের উপযোগী অবস্থার সৃষ্টি করছে, অপর দিকে একটি কাল্পনিক কাঁচের দেয়াল বা স্বচ্ছ ছাদের মত আমাদের মাথার উপর সার্বক্ষণিকভাবে থেকে পরিমিত তাপমাত্রা ধরে রাখছে। যেমন উন্নত বিশ্বে শীত প্রধান দেশে ফল, ফুল, শাক-সব্জী চাষ করার জন্য কাঁচে ঘেরা কৃত্রিম ঘর বা গ্রীন হাউজ তৈরী করা হয়। সুর্য কিরণ এই কৃত্রিম ঘরের স্বচ্ছ কাঁচের মধ্যে প্রবেশ করে ঘরকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উত্তপ্ত রাখে। কাঁচের ঘরে কৃত্রিম ভাবে আটকে রেখে শাক-সব্জী চাষের এই চমকপ্রদ পদ্ধতিকে বলা হয় গ্রীন হাউজ প্রক্রিয়া।

২.২ শীত প্রধান দেশের একটি প্রতিকূল এলাকাকে কৃত্রিম উপায়ে গ্রীন হাউজ কাঁচের ঘরে যে প্রক্রিয়ায় শাক-সব্জী, ফল, ফুলের গাছ চাষের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়, ঠিক অনুরূপ প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর পৃষ্ঠ বায়ুমন্ডল দ্বারা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে এবং গ্যাস সমূহ গ্রীন হাউজের কাঁচের ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে যে, মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে বায়ুমণ্ডলে এই গ্যাস সমূহের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, সেই সাথে বাড়ছে তাপমাত্রা। বায়ুমণ্ডলে উষ্ণতা বৃদ্ধির এই প্রক্রিয়াকেই বৈজ্ঞানিকগণ "গ্রীন হাউজ প্রভাব" নামে আখ্যায়িত করেছেন[৪]।

২.৩ ফরাসী বৈজ্ঞানিক জে, বি, ফরিয়ার (J. B. Fourier) ১৮২৭ সালে সর্ব প্রথম "গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া" তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন। এই তত্ত্বে ফরিয়ার বলেন, "মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে সৃষ্ট বেশ কিছু গ্যাস (কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রস অক্সাইডড, এবং ওজোন) বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করে এদের ঘনত্ব বাড়িয়ে দেবে এবং বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে যাবে"[৫]।

২.৪ এই তত্ত্বের উপর সুইডেনের বৈজ্ঞানিক সিভান্টি আরহেনিয়াস (Svante Arrhenius) ১১৮৯৬ সালে ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে বলেন, "আগামী শতাব্দীর মধ্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর ঘনত্ব জনিত কারণে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ৩.২ থেকে ৪.০ ডিগ্রী সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে"[৬]। সেই থেকে আজ পর্যন্ত, "The theory of the green-house effect has passed from conception to hypothesis, to the consensus view that it is both real and probable driving force for global climate change in our day"[৭]

২.৫ গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে যে সকল গ্যাস প্রধান ভূমিকা পালন করে চলছে তাদের মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4), নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O), ওজোন (0_3) এবং সিএফসি প্রধান। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, গত ১০০ বৎসরে বায়ুমণ্ডলে এই সকল গ্যাসের মধ্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর পরিমাণ বেড়েছে ৭০ পিপিএম এবং এর ২৫ শতাংশ বেড়েছে গত ৩০ বৎসরে। সারণি ৩-এ এই সকল গ্যাস বৃদ্ধির একটি চিত্র দেখানো হলো। এই বৃদ্ধির হার যদি অব্যাহত থাকে তাহলে ২০৭৫ সাল নাগাদ কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ শিল্প বিপ্লব সময়ের তুলনায় দ্বিগুণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই গ্যাস সমূহের বৃদ্ধির পরিমাণ রোধ না করতে পারলে সারা বিশ্বের মানব সভ্যতা এক বিরাট ধ্বংস যজ্ঞের মুখোমুখি হবে বলে

বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন। পরবর্তী অনুচ্ছেদ সমূহে গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী প্রধান গ্যাস সমূহের পরিচিতি এবং এদের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ঃ

সারণি–৩

বায়ুমন্ডলে গ্রীন হাউজ গ্যাসের তুলনামূলক চিত্র

গ্যাসের নাম	বাতাসে ঘনত্ব		বার্ষিক বৃদ্ধির হার শতাংশ
	শিল্প বিপ্লবের আগে	১৯৯০ সালে	
কার্বন–ডাই–অক্সাইড	২৬৫ পিপিএম	৩৫০ পিপিএম	০.৪ পিপিএম
মিথেন	০.৭৫ পিপিএম	১.৭ পিপিএম	১১.০ পিপিএম
ক্লোরোফ্লোরো কার্বন	অজানা	.০০০১ পিপিএম	৫.০০ পিপিএম
নাইট্রাস অক্সাইড	২৮০ পিপিবি	৩১০ পিপিবি	০.৬ পিপিবি (০.২)
ওজোন	অজানা	৩৫ পিপিবি	০.৫ পিপিবি

উৎস ঃ Erik Arrhenius E T. W. Waltz, "The Greenhouse Effect" The World Bank, Washington. D. G. 1994.

২.৬ বর্তমানে বায়ুমন্ডলে কার্বন–ডাই–অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে। সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে গত ১০০ বৎসরে পূর্বে (শিল্প বিপ্লবে) বায়ুমন্ডলে কার্বন–ডাই–অক্সাইড এর পরিমাণ ছিল প্রতি মিলিয়নে ২৮০ পিপিএম বর্তমানে ৩৫০ পিপিএম, বার্ষিক হিসেবে গড়ে প্রায় ০.৪ পিপিএম। বর্তমান বিশ্বে বায়ুমন্ডলে যে সত্যি কার্বন–ডাই–অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেছে তা বিশ্ব আবহাওয়া মডেলের মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে "Present day global climate models predict a warming of 1.5 to 4.5 degrees celcius for a CO_2 doubling withing the next century"[৮] ইউনাইটেড ন্যাশন এনভাইরনমেন্ট প্রোগ্রাম (UNEP) এবং ওয়ার্ল্ড মেটিওরলজিক্যাল অর্গানাইজেশন (WMO) কর্তৃক স্থাপিত ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অব ক্লাইমেট চেঞ্জ (IPCC) নামক একটি বিশেষজ্ঞ দল কর্তৃক পৃথিবীর ৩৫টি দেশের কয়েকশত বৈজ্ঞানিক এ ব্যাপারে একটি সমীক্ষা পরিচালন করেন। সমীক্ষার ফলাফল ১৯৯০ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড কনফারেন্সে উপস্থাপন করা হয়। গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয় "This research provides most definitive assessment so far the global warming and climate change is concern. Green house gases already emitted as a result of human activities have committed world to an unprecedently rapid warming. Earth is now 0.5.C warmer than in pre-industrial times and by the end of the next century we can expect it to be at least 3 degree warmer"[৯].

২.৭ আইপিসি কর্তৃক ১৯৯৫ সালে পরিচালিত আর একটি সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে যে, "Carbon Di-oxide has incresed 30 percent since pre-industrial time and the global average surface temperature has increased and the period since 1986 has been the warmest of past century"[১০]

২.৮ যে সকল কর্মকাণ্ডের জন্য বায়ুমণ্ডলে কার্বন–ডাই–অক্সাইড গ্যাস সৃষ্টি হচ্ছে এর মধ্যে কাঠ এবং কয়লা পোড়ানো (Fossil fuel combustion) গাছপালা কর্তন এবং সিমেন্ট উৎপাদন অন্যতম। গ্রীনহাউজ গ্যাস সৃষ্টিতে বায়ুমন্ডলে যে সকল গ্যাস অবদান রাখছে এর মধ্যে কার্বন–ডাই–অক্সাইড এর প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ, ১৮ ভাগ মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড ৬ ভাগ, ওজোন ১২ ভাগ এবং সিএফসি ও হ্যালন ১৪ ভাগ। নিম্নে সারণীতে যে সকল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে গ্রীন হাউজ গ্যাস সমুহের সৃষ্টি হচ্ছে তার পরিমাণ, বায়ুমণ্ডলে তাপ সৃষ্টিতে এদের অবদান এবং বায়ুমণ্ডল এই সকল গ্যাস কত বৎসর সক্রিয়ভাবে থাকতে পারে এর একটি বিবরণ দেয়া হলোঃ

সারণি–৪

গ্রীন হাউজ গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ এবং বায়ুমণ্ডলে প্রতিক্রিয়ার অবদান ঃ

গ্যাসের নাম	বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ (মিলিয়ন টন)	তাপ বৃদ্ধিতে অবদান (শতকরা হার)	প্রতিক্রিয়ার কাল (বৎসর)
ক) কার্বন–ডাই–অক্সাইড			
– কাঁঠ ও কয়লা দহন	৫,২০০	৫০	৫০–২০০
– গাছপালা কর্তন	২,৫০০		
– সিমেন্ট উৎপাদন	১৫০		
খ) মিথেন			
– চাল ও ধান	৬০–১৭০		
– গৃহ পালিত পশু	৬৫–১০০		
– গোবর গোচন	৫০–১০০	১৮	৮–১৫
– প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন	২৫–৪৫		
– কয়লা খনি	২৫–৪৫		
– ভূমি ব্যবহার	৩০–৭০		
গ) নাইট্রাস অক্সাইড			
– নাইটোজেন সাব	০.২–২.৪	৬	১২০–১৫০
– বিষাক্ত পানির স্তর	০.৮–১.৭		
– ভূমি ব্যবহার	১.০–১.৫		
– কাঁঠ কয়লা দহন	১		
ঘ) ওজোন		১২	
ঙ) সিএফসি এন্ড হ্যালন		১৪	২৫–২০০+

উৎস ঃ The world Bank Technical Paper on Global and Transboundary concern on Environmental issues, 1994. পৃ ঃ ১২৫

মিথেন (CH_4)

২.৯ গ্রীন হাউজ গ্যাসের মধ্যে কার্বন–ডাই–অক্সাইড–এর পর মিথেনের গুরুত্ব সর্বাধিক।মিথেন ধান ক্ষেতে ব্যাকটেরিয়া ক্রিয়ার ফলে, জলা ভূমিতে পানির নীচে জন্মানো পানা, বিভিন্ন ধরনের পাতা ও জলজ উদ্ভিদ পচনের ফলে এই গ্যাস উৎপন্ন হয়। এছাড়া গবাদি পশুর গোবর থেকে যে বায়ো গ্যাস উৎপন্ন হয় তাতে বেশ মিথেন এবং গ্যাস ফিল্ড থেকে প্রাকৃতিক ভাবে গ্যাসের নির্গমন বায়ুমন্ডলে মিথেনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা রাখছে। সারণি ৪ থেকে দেখা যাচ্ছে বায়ুমন্ডলে প্রতি

বৎসর ২৫০ থেকে ৫০০ মিলিয়ন টন মিথেন যোগ হচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বে মিথেনের পরিমাণ ১.৭ পিপিএম এবং প্রতি বৎসর বৃদ্ধির হার হচ্ছে ১.০[১১]।

২.১০ নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O)° ঃ কাঁঠ–কয়লা দহন, নাইট্রোজেন ঘটিত সার তৈরীর ও অপরিকল্পিত ব্যবহারের ফলে ননাইট্রাস অক্সাইড বায়ুমণ্ডল সংযোজিত হয়। ভূমি ব্যবহারের এক অবস্থা থেকে অন্যাবস্থায় এবং ভূগর্ভস্থ পানির স্তর কলুষিত হলেও এই গ্যাস তৈরী হয়ে থাকে। তেল খনন ও গ্যাস খনন ক্ষেত্র থেকে প্রাকৃতিক গ্যাসের সাথে অল্প পরিমাণ নাইট্রাস অক্সাইড নির্গত হয়। নাইট্রাস অক্সাইডের পরিমাণ বর্তমান বাতাসে ০.৩ পিপিএম।

২.১১ ওজোন (**0zone**)ঃ বায়ুমন্ডলের ষ্টাটোস্ফেয়ার নামক স্তরের মধ্যে ওজোন স্তর বিদ্যমান বলে আমরা প্রবন্ধের প্রথমাংশে আলোচনা করেছি। এই ওজোন স্তর পৃথিবীকে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করে থাকে বলে বায়ুমন্ডলে নির্দিষ্ট পর্যায়ে এর উপস্থিতি একান্ত অপরিহার্য। "Stratospheric ozone acts as a shield around the earth which virtually eliminate UV-C and greatly reduced the amount of ultraviolet radiation reaching the surface of the plant. A certain proportion of the sun's energy is emitted as ultraviolet radiation, DNA (Deoxyribo-nueleic acid) a genetic code present in the all living cells, is damaged by ultraviolet radiation. This damage to DNA can either kill the cell of all animals and very harmful for human being"[১২]

কিন্তু মানুষের বিভিন্ন কার্য কলাপের ফলে বিশেষ করে বিগত বৎসর গুলোতে ক্লোরো–ফ্লোরো–কার্বন (সিএফসি) গ্যাস এর উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বর্তমানে বায়ুমন্ডলে সিএফসি'র পরিমাণ আশংকাজনক ভাবে বেড়ে গেছে।" এই গ্যাস রেফ্রিজারেটর, এরোসল, গ্যাস লাইট, ফোমিং এজেন্ট এবং ইলেকট্রনিক্স পার্টস পরিষ্কারের জন্য ব্যবহৃতহচ্ছে। এছাড়া আগুন নিভানোর জন্য হ্যালন নামক গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে। মজার ব্যাপার এই যে, এই গ্যাস, দিয়ে প্রস্তুত দ্রব্য সামগ্রী মানুষ ব্যবহার করার সময় নির্গত সিএফসি গ্যাস বায়ুমণ্ডলে মিশে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় না, বরং সক্রিয় ভাবে বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়। তুলনামূলকভাবে এই গ্যাস হালকা বলে ঊর্ধ্বাকাশে ওজোন স্তরে চলে যায় এবং এখানে সিএফসির উপস্থিতির ফলে ওজোন স্তর হালকা হতে থাকে। এমনকি কোথাও কোথাও এতে ফাটল ধরতে দেখা গেছে।

২.১২ ইউএনইপি (UNEP)'র একটি সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে প্রতি বৎসর বসন্তকালে দক্ষিণ মেরু প্রদেশের এন্টার্কটিকার উপর ওজোন স্তরে একটি ফাটল দেখা যায়। এই ফাটলের দৈর্ঘ্য যুক্তরাষ্ট্রের সমান এবং এর গভীরতা হিমালয় পর্বতের সমান[১৩]।

পৃথিবীর অন্যত্রও ওজোন স্তর কমে আসছে এমনকি উত্তর গোলার্ধের আর্কটিক সার্কল থেকে সাহারা এলাকার আকাশে গ্রীষ্মকালে শতকরা ১ ভাগ এবং শীতকালে শতকরা ২০ ভাগ ওজোন কমেছে গত ২০ বৎসরে।

এখানে উল্লেখ্য ১লা জানুয়ারী ১৯৯৬ থেকে উন্নত বিশ্বে এই গ্যাস উৎপাদন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে এই গ্যাস উৎপাদন বন্ধ করার জন্য ১০ বৎসর সময় বেশী দেয়া হয়েছে।

২.১৩ সি. এফ. সি. ও হ্যালন (CFC & Halon) ঃ বায়ুমন্ডলে সি. এফ, সি এবং হ্যালন এর পরিমাণ কার্বন–ডাই–অক্সাইড এর তুলনায় কম হলে নিম্নোক্ত কারণে গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ায় এর প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঃ

ক) কার্বন–ডাই–অক্সাইড এর তুলনায় সি, এফ, সি, অনু প্রতিফলন ক্রিয়ায় ১০,০০০ গুণ বেশী কার্যকর।

খ) উর্ধাকাশে ওজোন অনু ধ্বংসে এত সক্রিয় যে ওজোন স্তর দ্রুত ক্ষয়ে গ্রীন হাউজ প্রভাব বৃদ্ধি করে।

গ) গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী সকল গ্যাসের মধ্যে সি, এফ, সি, গ্যাসই বায়ুমণ্ডলে দীর্ঘদিন (২০০ বৎসরের অধিক সময়) থাকতে পারে।

ঘ) আধুনিক সমাজে এই গ্যাসের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হওয়ায় বায়ুমণ্ডলে এর সংযোজন বাৎসরিক শতকরা পরিমাণ অপর গ্রীন হাউজ গ্যাসের তুলনায় অনেক বেশী।

২.১৪ বৈজ্ঞানিকদের মতে সি, এফ, সি, গ্যাসই কার্বন–ডাই–অক্সাইডের পর গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার প্রভাব ফেলতে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আগামীতে এই গ্যাস উৎপাদন কতটা কমে আসবে তার উপর নির্ভর করছে এর ক্ষতিকর প্রভাবের মাত্রা। এই কনভেনশনের ফলে চলতি বৎসরের ১লা জানুয়ারী থেকে উন্নত বিশ্বে সিএফসি উৎপাদন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশ সমূহে আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে এই গ্যাস উৎপাদন বন্ধের সময় সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে।

২.১৫ উপরের অনুচ্ছেদ সমূহের আলোচনায় দেখা গেল বায়ুমন্ডলে গ্রীন হাউজ গ্যাস বৃদ্ধি পেলে ভূ–পৃষ্ঠে এর নানা প্রকার প্রভাব পড়বে এর মধ্যে (১) বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধি (২) মেরু অঞ্চলে বরফের গলন (৩) সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি (৪) আবহাওয়া জনিত দুর্যোগ ইত্যাদি প্রধান। পরবর্তী অনুচ্ছেদে গ্রীন হাউজ গ্যাসের ফলে সৃষ্ট এই সকল প্রধান কারণগুলোর প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃ–

৩.০ বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধি

৩.১ গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার ফলে সর্ব প্রথম যে প্রভাবে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা হচ্ছে বায়ুমন্ডলের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি, এতে পৃথিবীপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। প্রাণী জগতের অস্তিত্বের উপর নেমে আসবে বিপর্যয়। সাধারণভাবে সকল বৈজ্ঞানিক স্বীকার করেছেন যে, গ্রীন হাউজ প্রভাবের বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী শতাব্দীর মাঝামাঝি ভূপৃষ্ঠের গড় উচ্চতা ০.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে।

৩.২ এছাড়া আবহাওয়া সংক্রান্ত অত্যাধুনিক কম্পিউটার সিমুলেশনের মাধ্যমে স্থিরভাবে জানা গেছে যে, গ্রীন হাউজ গ্যাস বেড়ে যাওয়ার ফলে বিশ্বব্যাপী বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ৪° সেলসিয়াস বেড়ে যাবে। কম্পিউটার সিমুলেশন সমীক্ষায় আরো দেখানো হয়েছে যে, ভূ–পৃষ্ঠে তাপমাত্রা আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ১.৫° থেকে ৪.৫° সেলসিয়াস হতে পারে। এই সমীক্ষায় আরো বলা হয়েছে যে, ভূ–পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়লেও এর প্রভাব পৃথিবীর সর্বত্র সমান হবে না। মেরু এলাকায় তাপমাত্রা পৃথিবীর গড় তাপমাত্রার ২ থেকে ৩ ভাগ বেড়ে যাবে এবং বিষুব এলাকায় গড় তাপমাত্রা প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে যাবে।

৩.৩ উপরন্তু এই তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে ভূপৃষ্ঠের আবহাওয়ায় দেখা দেবে পরিবর্তন। এতে পৃথিবীর কোন কোন এলাকায় (বিশেষ করে দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় আরো বেশী প্রাকৃতিক দুর্যোগ হবে, এমনকি যে সকল এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ সাধরাণত কম হয়ে থাকে সেখানেও দেখা দেবে এই সকল দুর্যোগ।[১৪]

৩.৪ মেরু অঞ্চলে বরফ গলন ঃ গ্রীন হাউজ প্রভাবে বিশ্ব বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে পর্বত ও মেরু অঞ্চলের বরফস্তূপ এবং হিমশৈল বিগলিত হবে। তাপমাত্রা প্রায় ৫° সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেলে পশ্চিম এন্টার্কটিকের তুষারস্তূপ প্রথমে হিমবাহ রূপে সমুদ্রে নেমে আসবে পরে বিগলিত হতে থাকবে। ইউএনইপি (UNEP)-র একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা যদি ৪–৫° সেলসিয়াস বৃদ্ধি পায়, তবে মেরু অঞ্চলের বরফস্তূপ ভেংগে হিমবাহের আকারে সমুদ্রে নেমে আসবে ফলে দেখা দেবে এক বিপর্যয় যার কথা বৈজ্ঞানিকরা বার বার বলছেন।

৩.৫ সমুদ্র পৃষ্ঠে উচ্চতা বৃদ্ধিতে মেরু অঞ্চলের এবং পর্বত এলাকার বরফ গলে পানি আকারে সমুদ্রে এসে পড়বে। এ সম্পর্কে ওয়ার্ল্ড মেটোলজিকাল অর্গানাইজেশন (WMO) এর আবহাওয়া বিষয়ক সবগুলো কম্পিউটার মডেল থেকে ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়েছে যে, বিংশ শতাব্দীতে সমুদ্রের গড় উচ্চতা ইতিমধ্যে প্রায় ১৫ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বব্যাপী বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা গত শতাব্দীর চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে, এই তথ্য মেনে নিলে মেরু অঞ্চলে বরফের আংশিক গলন এবং পানির সম্প্রসারণ ঘটিত কারণে এই উচ্চতা বৃদ্ধি খুবই স্বাভাবিক।

৩.৬ আগামী ৪০ বৎসরে এই হারে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে তাপাঙ্ক সম্প্রসারণের ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের গড় পানির উচ্চতা প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পাবে। এ ব্যাপারে ইন্টার গভর্ণমেন্টাল প্যানেল অব ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি)–এর একদল বৈজ্ঞানিক বলেন, In the absence of effort to cut greenhouse gas mission, sea level will rise between 10 to 30 cm by the year 2930 and by 30 to 100 cm by the ed of the next century".[১৫]

৩.৭ এই ধারা অব্যাহত থাকলে গ্রীন হাউজ প্রভাবে এবং স্থানীয় প্রতিক্রিয়ার ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের পানি স্বাভাবিক ভাবে বিশেষ করে দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় ৫–৭ মিটার পানি বৃদ্ধি পাবে। "The low lying developing countries are most vulnerable to such threats of which Bangladesh would be among the worst victims. The average hight of the country is estimated to be only 7.6 meters above the sea level. A three feet rise in sea level would innundate 11 percent of the country's land area".[১৬]

৩.৮ ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরোতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলন (Earth Summit) যোগদানকারী বিশেষজ্ঞরা বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বাড়লে পৃথিবীর যে সকল দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদের ক্ষতির তীব্রতার উপর ভিত্তি করে চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করে নিম্নোক্ত তালিকা প্রণয়ন করেছেনঃ–

অধিকতর ঝুঁকি সম্পন্ন দেশ (Highest risk)	ঃ	বাংলাদেশ, বার্মা, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, পাকিস্তান।
অধিক ঝুঁকি সম্পন্ন দেশ (High risk)	ঃ	আফগানিস্তান, চায়না, শ্রীলংকা, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ।
সাধারণ ঝুঁকি সম্পন্ন দেশ (Moderate risk)	ঃ	ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, পাপুয়া, নিউগিনি।
কম ঝুঁকি সম্পন্ন দেশ (Low risk)	ঃ	জাপান, মারোরিতা, নিউজিল্যান্ড, সিংগাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া।

৩.৯ রিপোর্টে বলা হয়েছে গ্রীন হাউজ গ্যাসের প্রভাবে এই সকল দেশকে রক্ষা করতে হলে পৃথিবী ব্যাপী এই সকল গ্যাস সীমিতকরণের জন্য (বিশেষ করে ওজোন ডিপ্লেটিং সাবস্টানশ) ভিয়েনা কনভেনশন (১৯৮৫) এবং মন্ট্রিল প্রোটকল (১৯৮৭) মোতাবেক বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি, অন্যথায় আগামী শতকের মাঝামাঝি এই সকল দেশ সত্যি সত্যি তলিয়ে যাবে।

৪.০ বাংলাদেশে সম্ভাব্য প্রভাব

৪.১ প্রবন্ধের প্রথম এবং দ্বিতীয়াংশে গ্রীন হাউজ গ্যাস সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছে তাতে দেখা গেছে যে, এ বিষয়ে যে সকল বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেছেন তারা সবাই একটা সত্য মেনে নিয়েছেন যে, "বায়ুমন্ডলে গ্রীন হাউজ গ্যাসের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আগামী শতাব্দীর প্রথমার্ধে পৃথিবী পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা ১.৫° থেকে ৪.৫° ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত বেড়ে যাবে"।[১৭]

৪.২ গ্রীন হাউজ গ্যাসের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে এর মধ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি, মরু প্রদেশে বরফ গলন, সমুদ্র স্ফিতিসহ বন্যা, খরা, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রধান। বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ, প্রতি বৎসর এই দেশের উপর ঘটে যায় নানা প্রকার দুর্যোগ। এর মধ্যে বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস অন্যতম। সংগত কারণেই বাংলাদেশের উপর গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার প্রভাব যে অভাবনীয় হবে তাতে সম্ভবত কোন সন্দেহ নেই।

৪.৩ বাংলাদেশে গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার ফলে ভূপৃষ্ঠের উত্তাপ বৃদ্ধি জনিত প্রভাব অনুধাবনে এবং সম্ভাব্য ব্যবস্থা অবলম্বনে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে দেশীয় এবং আঞ্চলিক ভাবে প্রয়োজনীয় উপাত্তের প্রভাব। এজন্য প্রবন্ধের এই অংশে বিজ্ঞান সম্মত তথ্য দেয়ার অবকাশ পাওয়া গেছে খুবই সীমিত।

৪.৪ সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে বাংলাদেশের গড় উচ্চতা ৭ থেকে ৮ মিটার হলেও ভূ-প্রকৃতির দিক থেকে এর ভূমিতলের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট রয়েছে। এছাড়া আবহাওয়া, জলবায়ু, নদ-নদী, গাছ-পালা এবং সামগ্রিক পরিবেশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ মৌসুমী এলাকার মধ্যে অন্যতম দুর্যোগ প্রবণ বলে পরিচিত। দেশের গত ১০০ বৎসরের তথ্য যদি প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও শ্রীলংকার সাথে তুলনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে, বাংলাদেশেই সব চেয়ে বেশী সংখ্যক দুর্যোগ সংঘটিত হয়েছে এবং জানমালের ক্ষয়-ক্ষতিও হয়েছে অনেক বেশী। এই সকল প্রাকৃতিক কারণে বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশকে সবচেয়ে ঝুঁকি সম্পন্ন দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

৪.৫ যুক্তরাষ্ট্রের উড হোল ওসানোগ্রাফিক ইনষ্টিটিউটের গবেষক জন, ডি, মিলিম্যান একদল বিশেষজ্ঞের প্রধান হিসেবে বাংলাদেশের একটি সমীক্ষায় দেখিয়েছেন যে, বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বেড়ে যাবে। মিলিম্যান তার গবেষকদলসহ আগামী শতাব্দীর মাঝামাঝি এবং একবিংশ শতাব্দীর দু'টি সালকে সামনে রেখে চারটি অবস্থাকে বিবেচনায় রেখে কম্পিউটার সিমুলেশনের মাধ্যমে যে ফলাফল পেয়েছেন নিম্নের সারণিতে তা দেখানো হলোঃ

সারণি—৫
সমুদ্রের পানি বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশে এর প্রভাব

সাল	বিশ্বব্যাপী সমুদ্রের পানি বৃদ্ধি	ভূমিতলের অধঃগমন	স্থানীয় সমুদ্রের পানি বৃদ্ধি	ক্ষতিগ্রস্থ জমির পরিমাণ	ক্ষতিগ্রস্থত্ত জনসংখ্যা %	এপি ক্ষতির %
বাংলাদেশ ২০৫০ সাল						
ক) ক্ষতি গ্রস্ত অবস্থা	৭৯ সেঃ মিঃ	৬৫ সেঃ মিঃ	১৪৪ সেঃ মিঃ	১৬ ভাগ	১৩ ভাগ	১০ ভাগ
খ) বেশী ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থা	৭৯ সেঃ মিঃ	১৩০ সেঃ মিঃ	২০৯ সেঃ মিঃ	১৮ ভাগ	১৫ ভাগ	১৩ ভাগ
বাংলাদেশ ২১০০ সাল						
ক) ক্ষতিগ্রস্থ অবস্থা	২১৭ সেঃ মিঃ	১১৫ সেঃ মিঃ	৩৩২ সেঃ মিঃ	২৬ ভাগ	২৭ ভাগ	২২ ভাগ
খ) বেশী ক্ষতি গ্রস্ত অবস্থা	২১৭ সেঃ মিঃ	২৩০ সেঃ মিঃ	৪৪৭ সেঃ মিঃ	৩৪ ভাগ	৩৫ ভাগ	৩১ ভাগ

উৎস ঃ World Watch Paper, No. 86, November 1992. P.34.

৪.৬ উপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে ২০৫০ সালে বিশ্ববাপী সমুদ্র পৃষ্ঠের পানি যখন গ্রীন হাউজ প্রভাবে ৭৯ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পাবে, বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরে পানি তখন বাড়বে ১৪৪ থেকে ২০৯ সেন্টিমিটার। এতে ১৬ থেকে ১৮ ভাগ জমি তলিয়ে যাবে এবং ১৩–১৫ ভাগ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অপর দিকে ২১০০ সালে গ্রীন হাউজ প্রভাবে বিশ্বব্যাপী সমুদ্র পৃষ্ঠের পানি যখন ২১৭ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পাবে, বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরের পানি তখন ৩৩২ থেকে ৪৪৭ সেঃ মিটার বেড়ে যাবে। শতকরা ২৬ থেকে ৩৪ ভাগ লোকের বসত বাড়ী জলমগ্ন হবে এবং ২৭ থেকে ৩৫ ভাগ লোক বিভিন্ন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৪.৭ অপর একটি সমীক্ষা চালিয়েছিলেন বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিশেষজ্ঞ। এই দলের প্রধান ছিলেন প্রফেসর ফসিহ উদ্দিন মাহতাব। এই বিশেষজ্ঞ দল গ্রীন হাউজ প্রভাবে বাংলাদেশে সমুদ্রতল বৃদ্ধির সম্ভাব্য পরিমাণ ৩০ সেন্টিমিটার থেকে ১.৫ মিটার পর্যন্ত হতে পারে বলে অনুমান করেছেন। এই দল সমুদ্রের পানির বৃদ্ধি পরিমাণ গড় ৯০ সেন্টিমিটার ধরে এবং ভূমিতল অধঃগমনের জন্য ১০ সেন্টিমিটার ধরে ১ মিটার পানির বৃদ্ধির সম্ভাব্য পরিণতি ধরে ফলাফল দেখিয়েছেন। নিম্নের সারণিতে বিস্তারিত দেখানো হলোঃ–

সারণি—৬

ভূমি ব্যবহারের হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ

ভূমি ব্যবহারের ধরন	জমির পরিমাণ (একর)	মোট ক্ষতিগ্রস্ত জমির শতকরা হার	দেশের হিসেবে শতকরা হার
জলাঞ্চল	৪,৭৩৯০০	৮.৫%	২১.৬৩%
বনভূমি	১৩,০৪,১০০	২৩.২%	২৮.২৯%
কৃষি জমি	২৯,১৫,৩০০	৫২.০%	১৩.৭৪%
গৃহস্থালী	৭,৪৯,৮০০	১৩.৪%	৩.৫৪%
মোট জমি	৩৮,২৯,৯০০	৬৮.৩%	১৩.৪৯%
দেশের মোট জমি	৫৬,০৭,৯০০	১০০%	১৫.৮৯%

উৎস ঃ Dr. Fasihuddin Mahtab, Effect of Climate Change and Sea-Level rise on Bangladesh Publishhed report 1989, BUET.

সারণি—৭

ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমূহের বিবরণ

বৃহত্তর জেলার নাম	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পরিমাণ (একরে)	শতাংশে ক্ষতির পরিমাণ
খুলনা	১৯,০১,৫৩৮	৬৪.৭%
বরিশাল	১৭,৫৫,৮৩৭	৯৯.১%
পটুয়াখালী	১১,৭৬,৩৮০	১০০%
ফরিদপুর	২১০,৩০৬	১২.৪%
নোয়াখালী	৫,৬৩,৮১৫	৪৪.২%

উৎস ঃ ফসিহউদ্দিন মাহতাব, প্রাগুক্ত।

৪.৮ ৬ নম্বর সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বঙ্গোপসাগরের পানির উচ্চতা ১ মিটার বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের ১৩.৭৪% আবাদী জমি, ২৮.২৯% শতাংশ বনভূমি সম্পূর্ণভাবে ক্ষতি হয়ে যাবে। ফলে ১২ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ১ কোটি মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়বে। অপরদিকে ৭ নম্বর সারণী থেকে প্রতিয়মান হচ্ছে যে, উপকূলীয় এলাকার ৫৬.০৮ লক্ষ একর জমি জলমগ্ন হবে যা দেশের মোট এলাকার ১৫.৮ শতাংশ, এর মধ্যে বৃহত্তর খুলনা জেলার ৬৪.৭%, বরিশালের ৯৯.১%, পটুয়াখালীর ১০০%, নোয়াখালীর ৪৪.২% শতাংশ এবং ফরিদপুরের ১২.৪% শতাংশ। এই হিসেবে বর্তমানে ৬৪টি জেলার মধ্যে ১৩টি জেলা এবং ৪৬৪টি উপজেলার মধ্যে ৬২টি উপজেলা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সমীক্ষায় উপকূলীয় এলাকায় ফসলের ক্ষয়ক্ষতি বসত বাড়ী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। নিম্নের ৮ নম্বর সারণিতে বিষয়টি তুলে ধরা হলো।

সারণি—৮
ক্ষতিগ্রস্ত বসতবাড়ী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য সংখ্যা

কাঠামোর ধরন	সংখ্যা	শতকরা
পাকা ঘর (ভাল মান)	২,০৭,৩৭৯	১১.১
আধা পাকা ঘর (মাঝারী মান)	৬,৮৮,৫৫২	৩৬.৯
কাচা ঘর (নিম্ন মান)	৯,৫১,২২৩	৫০.৯
ব্যবসা প্রতিষ্ঠান	২০,১৫৪	১.১
	১৮,৬৭,৩০৮	১০০%
প্রাইমারী স্কুল	৪,৯০০	–
উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল	১,২০০	–
কলেজ	১১১	–
মাদ্রাসা	২,০৬২	–
মোট	৮,২৩৭	–

উৎস ঃ প্রাগুক্ত

৪.৯ সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, উপকূলীয় এলাকার বসত বাড়ী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হবে ব্যাপক এর মধ্যে ভাল মানের পাকা ঘর ১১ শতাংশ, আধা–পাকা ঘর ৩৬ শতাংশ এবং ৫০.৯ শতাংশ কাচা ঘর বাড়ী। এছাড়া ৪,৯০০ টি প্রাইমারী স্কুল, ১,২০০ টি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল, ১১১টি কলেজ এবং ২০৬২টি মাদ্রাসা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৪.১০ গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার ফলে বাংলাদেশে আরও যে সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতি এবং পরিবর্তন সাধিত হবে তার সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ

ক) আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রভাব

আবহাওয়ার যে পরিবর্তন আসবে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ–

* তাপ পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টির মৌসুম পাল্টে যাবে, ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন–খরা, বন্যা, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস এর পরিমাণ ও তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে।
* সময়, তাপ ও বৃষ্টিপাত এর পরিবর্তন ঘটলে এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে জনসাধারণ, কৃষি, মৎস্য ও ভূমি।

খ) সুন্দরবন এলাকায় প্রভাব

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলেও লাগবে দারুণ প্রভাব। এই বনের বেশীর ভাগ অংশ তলিয়ে যাবে এতে বনের ১০টি প্রজাতির গাছের মধ্যে সুন্দরী ও গেওয়া গাছ বিনষ্ট হয়ে যাবে। দেশের আর্থ–সামাজিক ও পরিবেশের উপর মারাত্মক বিপর্যয় নেমে আসবে।

গ) লবণাক্ততা অনুপ্রবেশ

উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা এমনি একটি সমস্যা। সমুদ্রের পানি বৃদ্ধির ফলে এই সমস্যা এত প্রকট হবে যে তাতে দেশের গোটা কৃষি, মৎস্য ও বনভূমির উপর দারুণ

প্রভাব ফেলবে। ১৯৮৯ সালের এক সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে, বর্তমানে উপকূলীয় এলাকায় প্রায় ১৪ লক্ষ হেক্টর জমি লবণাক্ত পানির জোয়ার–ভাটায় বৎসরের বেশ সময় বা সর্বক্ষণ ডুবে থাকে। গ্রীন হাউজ প্রভাবে সমুদ্রের পানি বাড়লে আরো ব্যাপক এলাকা প্লাবিত হবে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে ফসলাদিসহ আরো অনেক কিছু।

ঘ) উপকূলীয় এলাকায় বাঁধে ক্ষতি

উপকূলীয় এলাকায় মোট ৫৮টি পোল্ডার বাঁধের সাহায্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বর্তমানে ভাটার সময় বাঁধের অভ্যন্তরে আটকে থাকা পানি সাধারণ ভাবেই নিষ্কাষিত হয়। অথচ সমুদ্রের পানি যখন বৃদ্ধি পাবে তখন জোয়ার–ভাটায় পানি নিষ্কাষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। যা কিনা পাম্পের সাহায্যে বের করে দেওয়াও সম্ভব হবে না। সমুদ্রের পানি বাড়লে এই সকল বাঁধ তলিয়ে যাবে ফলে নুতন করে বাঁধের উচ্চতা বাড়াতে লাগবে কয়েক মিলিয়ন কোটি টাকা।

ঙ) কৃষি ক্ষেত্রে প্রভাব

গড় আবহাওয়ার স্থানিক পরিবর্তনে শস্য উৎপন্নের ক্ষেত্রে দেখা দেবে অনিশ্চয়তা। আবহাওয়ার সাথে শস্যাদির নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে সময় লাগবে বিধায় অনেক শস্যের স্বাভাবিক ফলন কমে যাবে। কৃষকেরা এই পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে উৎপাদন অব্যাহত রাখতে পারবেনা ফলে কৃষক যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবে তেমনি ক্ষতিগ্রস্থ হবে গোটা দেশ ও সমাজ। এছাড়া অস্থিতিশীল আবহাওয়ার দরুন গোটা উকূলীয় এলাকার জমিতে শস্য–উৎপাদনের অশুভ প্রভাব ফেলবে।

৫.০ বাংলাদেশে পরিবর্তনের প্রভাব

৫.১ গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে কেবল উপকূলীয় বা দেশের বিশেষ কয়েকটি এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা নয়। বরং গোটা বাংলাদেশেই এই প্রতিক্রিয়ার নেতিবাচক প্রভাবে দারুণভাবে প্রভাবিত হবে। বর্তমানে পরিবর্তন এসেছে বাংলাদেশে আবহাওয়ার, একই ভাবে পরিবর্তন আসবে এর কৃষিতে, পরিবর্তন আসবে এর ইকোসিস্টেমে (Eco-system), পরিবর্তন আসছে পরিবেশে, পরিবর্তন আসবে বায়ো–ডাইভারসিটিতে (Biodiversity) পরিবর্তন আসবে সর্বত্র। উল্লেখ্য, এই পরিবর্তনের প্রভাব স্বল্প মেয়াদী নয় বরং দীর্ঘ মেয়াদী।

৫.২ গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে প্রধান বিবেচ্য বিষয় ও নীতি সমূহ ঃ

প্রবন্ধের প্রথম এবং দ্বিতীয়াংশের আলোচনার পর এই পর্যায়ে গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার নেতিবাচক প্রভাব কমিয়ে আনার কৌশল সমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথমতঃ দেশের সামগ্রিক পরিবেশ এবং আবহাওয়ার গতি প্রকৃতি যথার্থভাবে নিরূপণের জন্য দেশী এবং বিদেশী বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করতে হবে। কারণ আমরা যতদিন আমাদের পরিবেশ এবং আবহাওয়ার পরিবর্তন সম্পর্কে নিশ্চিত না হতে পারব ততদিন প্রতিক্রিয়ার প্রভাব এবং সম্ভাব্য সঠিক নীতি গ্রহণে সক্ষম হতে পারব না।

দ্বিতীয়ত ঃ প্রস্তাবিত বিশেষজ্ঞ কমিটির ফলাফল এবং সুপারিশের আলোকে সম্ভাব্য দুই ধরনের কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে (১) পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার কৌশল এবং (২) সংকোচন কৌশল।

৫.৩ মানিয়ে নেয়ার কৌশল সমূহ

এই কৌশলকে দু'ভাবে ভাগ করা যেতে পারে (ক) কাঠামোগত কৌশল (খ) সীমিতকরণ কৌশল।

(ক) কাঠামোগত কৌশল

- উপকূলীয় এলাকায় এবং নদীতটে নতুন বাঁধ অথবা বর্তমান বাঁধে প্রয়োজনীয় সংস্কার করে লবণাক্ত পানি বন্ধ করা,
- বসত বাড়ীসহ অপর সকল নিম্ন এলাকাকে বেষ্টনী বাঁধ দিয়ে ঘিরে ফেলা;
- রাস্তা ঘাট, কালভার্ট সমূহ প্রয়োজনীয় পরিবর্তিত অবস্থার সাথে কার্যপোযোগী করা,
- তাপমাত্রা ও পরিবেশ উন্নয়ন এর ক্ষেত্রে সরাসরি অবদান রাখে এমন গাছপালা রোপণ
- অভ্যন্তরীণ পানিতে নৌকা, ট্রলি, ষ্টীমার ইত্যাদিসহ মাছের যাতায়াত ব্যবস্থা এবং পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা।

(খ) সীমিতকরণ কৌশল

- গ্রীন হাউজ গ্যাস সৃষ্টি করতে পারে এমন সকল কর্মকাণ্ড/গ্যাস সমূহ দেশীয় ভাবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে সীমিতকরণ করা,
- যে আধুনিক প্রযুক্তি গ্রীন হাউজ গ্যাস সৃষ্টি করে তা যতই জনপ্রিয় হোক না কেন তাকে এখনই বন্ধ ঘোষণা করা,
- কয়লা ও কাঠের জ্বালানীর বিকল্প জ্বালানীর উদ্ভাবন করা,
- বন উজাড় প্রবণতা (Deforestation trend) অবশ্যই প্রতিরোধ করা,
- অক্সিজেন সৃষ্টিকারী এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রতিরোধকারী নীতিমালা প্রণয়ন করা,
- বায়ুমণ্ডল এবং পৃথিবীর পৃষ্ঠ তাপ নিরোধকারী সকল দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হওয়া।

৬.০ উপসংহার ঃ

গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার প্রভাব বিশ্বব্যাপী হলেও বাংলাদেশে এর নেতিবাচক প্রভাব এত ব্যাপক এবং ভয়াবহ যে তা একক ভাবে বাংলাদেশের পক্ষে কখনই সামলানো সম্ভব নয়। তাই দেশীয় সম্পদ এবং প্রযুক্তির সাহায্যে স্থানীয় ভাবে এই প্রতিক্রিয়া প্রতিহত করার নীতি গ্রহণ একাধারে যেমন অত্যন্ত জরুরী অপর দিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নত দেশ সমূহের সক্রিয় সহায়তায় এই প্রতিক্রিয়ার প্রভাব সীমিতকরণের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। আগামী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য সুন্দর একটি বাংলাদেশ তথা পৃথিবী রেখে যেতে হলে বিশেষজ্ঞদের প্রদত্ত সুপারিশ মোতাবেক সকল সরকারী ও বেসরকারী কর্মকাণ্ডে আলোচ্য গ্যাস সীমিত রাখে তার স্বপক্ষে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। অনুরূপভাবে বিশ্ব ব্যাংকের পরিবেশ বিষয়ক রিপোর্টের এই বক্তব্য "Without environmental policies, development will be undermined,

without development environmental protection will fail" এর আলোকে গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Sethi, Inderjeet, et al, *Environmental Pollution: Cause Effect and Control,* (Commonwealth Publishers New Delhi 1991).
2. National Centre for Dev. Studies, *The Environment,* Australian National University 1993.
3. Folland, U and Chess, R. D. *Covervd Climate Variations and change" in climate change.* the IPCC Assessment, Hantington (ed) Cambridge University Press 1990.
4. Ibid
5. Ibid
6. Hoffert, M. I. *Climate sensivity, climate feedback and policy Implications* in Confronting climate change Mintzer (ed), Cambridge University Press 1992.
7. Ibid
8. Andrasko, K, *Global warning and Forest: An overview of current knowledge,* FAO, Rome 1990).
9. Bangladesh Bureau of Statistics- *Statistical Yearbook of Bangladesh,* BSS, Dhaka, 1991.
10. Brammer, H. et al, *Effect of climate and Sea-level changes on the natural resources of Bangladesh,* (Unnayan Parished Publication 1994)
11. ESCAP, *Coastal Environmental Management Plan for Bangladesh,* Main Report, Vol. II, Bangkok, 1991.
12. Emery, K. O. and Aarby D. G. *Sea levels, Land levels and Tide* of Ganges, (New York 1991).
13. Honbrigton J. t. et al, *Climate change 1992. The Supplementary Report to the IPPC Scientific Assessment,* (Cambridge University Press 1992).
14. Dr. Fasihuddin Mahtab, *"Effect of Climate change and Sea-level rise on Bangladesh"* BUET, Dhaka 1989.
15. UNCR, *Environmental and Social dimension of Development and* Management, research Report Series, Japan 1994.
16. Rahman, A. A. (ed), *Environment andd Development in Bangladesh,* Bangladesh Centre for Advanced Studies, Dhaka 1990).
17. Govt. of Bangladesh Bangladesh, *Environment: Brazil Host the World Conference,* Dec 1993.

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৭ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, আশ্বিন ১৪০৩

পরিবেশ উন্নয়নঃ সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ*

১. পরিবেশ ও উন্নয়ন

১.১ ভূমিকা ঃ সমাজে বসবাসকারী জনগণের সম্পদ ও সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের জন্য উন্নয়ন অত্যাবশ্যক। প্রতিটি উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পদের ব্যবহার সরাসরি জড়িত। পৃথিবীতে সম্পদ অফুরন্ত, মানুষ যদিও পূর্বে এ ধারণা লালন করত, কিন্তু তা আজ সর্বজন স্বীকৃত নয়। যুগের সাথে ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। ধারণার পরিবর্তন এমনিতে হয়নি বা দু'এক দিনে আসেনি। মানুষ যখন প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়, তখনি তার কারণ খুঁজে বের করার প্রয়াস চালায় এবং এক পর্যায়ে মূল কারণ উদ্‌ঘাটনে সমর্থ হয়।

মানুষ দু'ধরনের সম্পদ উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যবহার করে থাকে– একটি পুনরাভর (Renewable resources) সম্পদ এবং অপরটি অপুনরাভর (Non-renewable resources) সম্পদ। কেউ সম্পদ ব্যবহার করে থাকে মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য; আর কেউ বা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য বা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য। কিন্তু সম্পদ ব্যবহারের দৃষ্টিভংগি সবার একই রকম–সম্পদ অপরিসীম। আজ মানুষ অভিজ্ঞতা থেকে স্বীকার করছে যে, পৃথিবীর সম্পদ অফুরন্ত নয়। সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার পৃথিবীতে সম্পদকে শুধু দুর্লভ করে তোলেনি, সৃষ্টি করেছে নানাবিধ পরিবেশগত সমস্যা। ১৯৯২ সনের জুন মাসে ব্রাজিলের রিওডিজেনারিওতে অনুষ্ঠিত "পরিবেশ ও উন্নয়ন" শীর্ষক ধরিত্রী সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ একযোগে স্বীকার করেছেন, উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য টেকসই উন্নয়ন (Sustainable Development) পদ্ধতি অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক। তবেই উন্নয়ন কার্যক্রম পরিবেশ–এর জন্য ক্ষতিকর হবে না।

১.২ উন্নয়ন ঃ সমাজে বসবাসকারী জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, শিক্ষার মানোন্নয়ন, স্বাস্থ্য এবং সুযোগের সমতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার নিশ্চয়তা বিধান উন্নয়নের বৃহত্তর লক্ষ্য। অর্থনেতিক উন্নয়ন উন্নয়নের একটি আবশ্যকীয় উপাদান। কিন্তু অর্থনেতিক উন্নয়ন সার্বিক উন্নয়নের নিশ্চয়তা দেয়না।

শিক্ষার সুযোগ, শিশুমৃত্যু ও পুষ্টির মাত্রা জিডিপি এবং জিএনপি'র অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হিসেবে দীর্ঘদিন থেকে স্বীকৃত হয়ে আসছে। কেউ কেউ এ সূচকগুলোকে

---

* উপ–পরিচালক, বাংলাদেশ লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

উন্নয়ন–এর সাথে সম্পৃক্ত করার প্রয়াস চালিয়েছে। ইউএনডিপি–এর মানব উন্নয়ন সূচক সমূহ তারই ফল বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

পরিবেশ অবক্ষয় শুধু বর্তমান প্রজন্মের জন্য ক্ষতিকর তাই নয়, বরং তা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যও সমান বা অধিক হারে ক্ষতিকর। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টিরমান সহ গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি উন্নয়ন কর্মকান্ড ধ্বংস করে দিচ্ছে এ পৃথিবীর পরিবেশকে। বিত্তশালী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন কর্মকান্ডের ফলে এ প্রজন্মের দরিদ্র জনগোষ্ঠী যেমনিভাবে দূষিত পরিবেশের ক্ষতির শিকার হচ্ছে, তেমনিভাবে ভবিষ্যত প্রজন্মের দরিদ্র জনগোষ্ঠীও উত্তরাধিকার সূত্রে পাবে অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত এবং দূষিত পরিবেশ। আর তা প্রতিরোধ করা সম্ভব একমাত্র টেকসই উন্নয়ন পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে।

১.৩ টেকসই উন্নয়ন ঃ টেকসই উন্নয়ন হচ্ছে সেই উন্নয়ন, যার ফলাফল দীর্ঘায়িত হয় অর্থাৎ আজকের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলাফল যেন ভবিষ্যত প্রজন্মের জীবনযাপনের জন্য ক্ষতিকর না হয়। অতিরিক্ত সম্পদ ব্যবহার না করে পৃথিবীতে দূষিত পরিবেশ সৃষ্টি ছাড়া যে উন্নয়ন, তাই টেকসই উন্নয়ন। Brunt-Lund কমিশন এর অর্থাৎ World Commission on Environment and Development (WCED)-এর প্রতিবেদন Our Common Future, 1987- এ সর্বজন স্বীকৃত টেকসই উন্নয়নের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

"Current generations should meet their needs without compromising the ability of future generations to meet their own needs."

১.৩.১ টেকসই উন্নয়নের কৌশল জীবন যাপনের ক্ষেত্রে বর্তমান প্রজন্ম এক ভয়াবহ প্রতিদ্বন্দ্বিতার শিকার। বেশীর ভাগ দেশ, তার জনগণের জন্য গ্রহণযোগ্য জীবনযাত্রার মান অর্জনে সমর্থ হয়নি। এ কারণে এ সমস্ত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্থাৎ মানব কল্যাণ নিশ্চিতকরণ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ আজকের বিশ্বের জনগণের সুযোগ সুবিধা উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যা তাদের পুত্র, প্রৌপুত্র এবং দৌহিত্রের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রয়োজ্য।

১.৩.১.১ ধনাত্মক সম্পর্ক স্থাপন ঃ প্রবৃদ্ধির নীতি ত্বরান্বিত করে সম্পদের কার্যকর ব্যবহার, প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং ভাল বাজার ব্যবস্থা, যা পরিবেশগত সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে পেতে সহায়তা করে। আয় বৃদ্ধি পেলে পরিবেশ উন্নয়নে বিনিয়োগ করা সম্ভব। দারিদ্র দূরীকরণের ফলপ্রসূ নীতিমালা জনসংখ্যা হ্রাসে সহায়ক এবং তা সম্পদ ও জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করে দীর্ঘ মেয়াদী কার্যক্রম গ্রহণেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

১.৩.১.২ ঋণাত্মক সম্পর্ক ছিন্নকরণ ঃ আয়বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব। সাধারণত অতিরিক্ত উৎসাহমূলক কর্মকান্ড পরিবেশের সত্যিকার মূল্যকে যেনো গ্রাস করতে না পারে, সেজন্য আবশ্যক অতিশয় কম ক্ষতিকর প্রযুক্তির ব্যবহার এবং দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন। তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাস্তবোপযোগী ও ফলপ্রসূ পরিবেশ নীতি এবং নীতিমালা সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান অত্যাবশ্যক।

১.৩.১.৩ অনিশ্চিত সম্পর্কের শ্রেণী বিভাজন এবং ব্যবস্থাপনা ঃ মানুষের কর্মকান্ডের সাথে পরিবেশ দূষণের সম্পর্ক অদ্যাবধি স্বচ্ছ নয় অর্থাৎ সহজে বোধগম্য

নয়। পবিবেশ দূষণের নিত্য নতুন প্রকৃতি ও বীভৎসতায় সচেতন সমাজের প্রতিটি মানুষকে প্রতিনিয়তই চমকে উঠতে হয়। এ জন্য প্রয়োজন সাবধানতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ যেমন – Safe Minimum standard, অনিশ্চয়তার ঝুঁকি কোথায় বেশি এবং কোথায় অপরিবর্তনীয় ক্ষতির আশংকা বেশি অথবা দীর্ঘ মেয়াদে বেশি মূল্য দিতে হবে– এ বিষয়গুলো চিহ্নিতকরণ ও তার জন্য সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেয়া অত্যাবশ্যক।

১.৪ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের পরিবেশ ও উন্নয়ন ঃ পৃথিবীর শতকরা ২০ ভাগ জনগণ বসবাস করছে উন্নত দেশসমূহে এবং শতকরা ৮০ ভাগ উন্নয়নশীল দেশসমূহে। কিন্তু, উন্নত দেশগুলো পৃথিবীর শতকরা ৮০ ভাগ সম্পদ ভোগ করছে; অপরদিকে উন্নয়নশীল দেশসমূহ মাত্র শতকরা ২০ ভাগ সম্পদ ভোগ করার সুযোগ পাচ্ছে। সম্পদের এ অসম বন্টন দরিদ্র দেশের জনগোষ্ঠীকে করে তুলছে আরও দরিদ্র, অন্যদিকে উন্নত দেশসমূহ গড়ে তুলছে সম্পদের পাহাড়।

বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর শিল্প বিপ্লবের সময় পশ্চিমা দেশসমূহ সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার করে প্রাকৃতিক সম্পদ উজাড় করে। শিল্প বিপ্লবের সময় উত্তর আমেরিকা (USA) এককভাবে ভোগ করেছে পৃথিবীর শতকরা ৮০ ভাগ পেট্রোলিয়াম, যদিও সে পেট্রোলিয়াম আসত উন্নয়নশীল দেশসমূহ থেকে। পশ্চিমা দেশসমূহ উজাড় করেছে ক্রান্তীয় বনভূমি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ইন্দোনেশিয়া, আফ্রিকাসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশের বনোজাড়ের জন্য মূলতঃ পশ্চিমা দেশগুলোই দায়ী।

দ্রুত শিল্পায়নের ফলে পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার বায়ুদূষণ, মাটি দূষণ, পানি দূষণ সহ শব্দ দূষণের শিকার হয়েছে পৃথিবীর সকল মানুষ। অতিরিক্ত শিল্পায়নের ফলে সৃষ্ট বায়ু দূষণের বিষয়টি অনস্বীকার্য । যুক্ত রাজ্যের লন্ডনে অম্লবৃষ্টি (acid rain), যা হয়েছিল বায়ুতে অতিরিক্ত সালফার-ডাই-অক্সাইড (SO_2) গ্যাস জমার কারণে। বায়ুর পানির সংস্পর্শে এসে এ গ্যাস সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4) এ পরিণত হয়ে বৃষ্টির মত পড়েছে, যার ক্ষতির পরিমাণ ছিল অপূরণীয়। অম্লবৃষ্টির ফলে বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল গাছপালা, পশুপাখি, দালান-কোটা এবং বিভিন্ন প্রাণি।

অপরদিকে উত্তর আমেরিকায় শিল্পায়নের পাশাপাশি অতিরিক্ত পেট্রোলিয়াম চালিত যানবাহন পরিচালনার ফলে লস্‌এঞ্জেলেসের আকাশে বায়ুতে নাইট্রোজেন -ডাই-অক্সাইড (NO_2) গ্যাস জমা হতে থাকে। নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড বায়ুমন্ডলের পানির সংস্পর্শে এসে নাইট্রিক এসিডে (HNO_3) রূপান্তরিত হয়ে বৃষ্টির আকারে মাটিতে নেমে আসে। তার ফলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল মানুষ, গাছপালা, পশুপাখি, দালানকোটা এবং নানাবিধ প্রাণি।

উন্নত দেশসমূহের দ্রুত শিল্পায়ন, অতিরিক্ত ও যথেচ্ছ সম্পদ ব্যবহারের ফলে সেখানকার মাটি এবং পানি সম্পূর্ণভাবে দুষিত হয়ে পড়েছে। অতিরিক্ত সি-এফ-সি (CFC) ব্যবহারের ফলে ওজোন স্তর ছিদ্র হওয়ার বিষয়টি উন্নত দেশসমূহ ১৯৮৫ সনে অস্বীকার করলেও ১৯৮৭ সনে যখন উত্তর মেরুতে ওজোন স্তরে ছিদ্র পরিলক্ষিত হয়, তখন বিষয়টি সবার মাথা ব্যথার কারণ হয়ে উঠে। তেমনি ভাবে গ্রীন হাউজ প্রভাবের বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য। এসব কিছুর জন্য দায়ী উন্নত দেশসমূহ। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশসমূহ পরিবেশের এসকল ক্ষতির শিকার হচ্ছে, কারণ পরিবেশ দূষণ কোনো ভূসীমানা মানে না। ইউরোপ এবং আমেরিকা গ্রীনহাউজ প্রভাবের জন্য দায়ী,

কিন্তু গ্রীনহাউজ প্রভাবের ক্ষতির প্রধান শিকার হবে এশিয়া, আফ্রিকা এবং ক্যারাবিয়ান
২ দেশসমূহ। অনুমান করা হচ্ছে, যদি ২০৫০ সনের দিকে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ৩ (তিন) ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পায়, তাহ'লে বংগোপসাগরের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে ১ মিটার, এতে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ১৭.৫ ভাগ এলাকা পানির নীচে ডুবে যাবে। মালদ্বীপ এবং ক্যারাবিয়ান দেশসমূহ পানির নীচে চলে যেতে পারে। ভারতের কিয়দংশ এলাকাও পানিতে নিমজ্জিত হতে পারে।

সরাসরিভাবে বলা যায়, পরিবেশ দূষণে উন্নয়নশীল দেশসমূহের ভূমিকা খুবই নগণ্য, কিন্তু তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে সবচেয়ে বেশি। উন্নত দেশসমূহের সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিবেশ দূষণ হ্রাস তথা পরিবেশ সংরক্ষণে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তারা সরকারকে বাধ্য করছে পরিবেশ সংরক্ষণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে। উন্নয়নশীল দেশসমূহে সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিবেশ সংরক্ষণে প্রশংসনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করছে। বস্তুত উন্নয়নশীল দেশসমূহে পরিবেশগত সমস্যার চেয়ে অত্যধিক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত অন্যান্য মৌলিক সমস্যা (দারিদ্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, জনসংখ্যা এবং অন্যান্য) রয়েছে; সঙ্গত কারণেই সেগুলো মেটানোর দিকে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিকতর দৃষ্টি দিতে হয়।

১৯৯২ সনের জুন মাসে ব্রাজিলের রিওডিজেনারিওতে "পরিবেশ ও উন্নয়ন" শীর্ষক ধরিত্রী সম্মেলনে এনজিওদের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। লাগামহীন উন্নয়ন পদ্ধতি পরিবেশকে ধ্বংস করছে এবং পরিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে উন্নয়নের একটি বিকল্প পদ্ধতি অবলম্বনের তথা টেকসই উন্নয়ন পদ্ধতি গ্রহণের জন্য উন্নত দেশসমূহের বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং পরিবেশবাদী দলসমূহ দাবী জানিয়েছে এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে।

২.০ পরিবেশ আন্দোলন

সমাজের অপরাপর সমস্যাবলীর ন্যায় পরিবেশ সমস্যা আজকের বিশ্বে একটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে রূপ নিয়েছে। সামাজিক সমস্যা নিরসনের জন্য প্রয়োজন সামাজিক আন্দোলন এবং সামাজিক সংগঠন। সংগঠন ছাড়া কোনো আন্দোলন সফল হতে পারেনা। সংগঠনসমূহ হতে পারে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায়, ব্যক্তিগত উদ্যোগে বা বিশেষ গোষ্ঠীর উদ্যোগে উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যুবসংগঠন, মহিলা সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন এবং কৃষক সংগঠন ইত্যাদি। পরিবেশ বিষয়ক সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন সংগঠন যে আন্দোলন করে থাকে, তা–ই পরিবেশ আন্দোলন।

বিশ্বে পরিবেশ সংরক্ষণে যে সংগঠন সমূহ কাজ করে থাকে, তারমধ্যে ৪টি সংগঠনের নাম প্রণিধানযোগ্যঃ

- ২.১ সংরক্ষণবাদী
- ২.২ সক্রিয় অংশগ্রহণকারী
- ২.৩ বিকল্প জীবন যাপন ও কৃষ্টি সংরক্ষণ
- ২.৪ সবুজ দল

২.১ সংরক্ষণবাদী (Conservationists)

১৯ শতকের দিকে উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপে কিছু সংখ্যক জনগণ একত্র হয়ে বিলুপ্ত প্রায় বা বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে, এ ধরনের প্রাণি ও উদ্ভিদ সংরক্ষণের মাধ্যমে

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটি দল গঠন করে, তারাই সংরক্ষণবাদী নামে পরিচিত। যে সকল প্রজাতি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেলে পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা দেখা দিতে পারে, সে সকল বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতি সংরক্ষণে তারা উৎসাহী (উদাহরণ – Sierra club)। বস্তুত এটি একটি ব্যক্তিগত উদ্যোগ। তারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও নীতি নির্ধারণে চাপ সৃষ্টি করতে অনাগ্রহী। তারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিলুপ্ত প্রায় প্রাণি ও উদ্ভিদ প্রজাতি সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণে বিশ্বাসী।

২.২ সক্রিয় অংশগ্রহণকারী (Activists)

সক্রিয় অংশগ্রহণকারী দল ১৯৬০ এর দশকে সারা বিশ্বে একযোগে কাজ শুরু করে এবং তারা সক্রিয় কার্যকরী দল বলেও অভিহিত। সক্রিয় অংশগ্রহণকারীরা রাজনীতিতে সরাসরি অংশগ্রহণ করে এবং সরকারকে নীতি নির্ধারণে চাপ সৃষ্টি করে। Green Peace তার একটি উদাহরণ। Green Peace একটি বহুজাতীয় কোম্পানীর ন্যায় বিভিন্ন মহাদেশে কাজ করছে। তাদের প্রধান কার্য্যালয় বিভিন্ন মহাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। গ্রীণপিস–এর প্রধান কার্যালয় এক জায়গায় নিয়ে আসার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে গ্রীণপিস এর প্রধান কার্যালয় একই স্থানে আসলে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা অনেক। একটি বিশেষ পরিবেশগত সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ৭/৮ সপ্তাহের জন্য একটি দল গঠিত হয় এবং সুনির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে, সে সংগঠন আবার অবলুপ্ত হয়ে যায়।

২.৩ বিকল্প জীবন–যাপন ও কৃষ্টি সংরক্ষণ (Alternative life style sub-culture)

এ দলটি বিভিন্নমুখী বা বিভিন্ন মতবাদের দলের সমন্বয়ে গঠিত। তারা অত্যাধুনিক পশ্চিমা জীবন যাপন পদ্ধতির চেয়ে সাধারণ জীবন যাপন পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে, যা পরিবেশের জন্য কল্যাণকামী। কোনো কোনো দল রাজনীতি বা সামাজিক জীবনে প্রভাব ফেলার চেষ্টা করে (উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ঃ Biological farming, healthy life style & age group)। ভারতের মহাত্মা গান্ধীর জীবন যাত্রা এবং তার মতবাদ পরিবেশ বন্ধুসুলভ। ভারতীয় জীবনযাত্রা প্রণালী আমেরিকাতে অত্যধিক প্রশংসিত, কারণ তাদের জীবন যাত্রা পরিবেশ বন্ধুসূলভ; যদিও তা অত্যন্ত পুরনো জীবন যাপন পদ্ধতি। এ দলটি নিজের জীবনে অনুসরণ করে অন্যদের দেখিয়ে প্রমাণ করতে চায়, পরিবেশ বন্ধুসূলভ জীবন যাপন সম্ভব।

২.৪ সবুজ দল (Green parties)

পরিবেশ বিষয়ক এ আন্দোলনটি অত্যন্ত আধুনিক আন্দোলন এবং এটি একটি রাজনৈতিক দল। উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপে সবুজ দল প্রাদেশিক সরকারে, এবং কেউ কেউ কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতায় আছে। তারা সরাসরি ক্ষমতায় থেকে নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করেথাকে।

৩.০ বাংলাদেশে পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রম

বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়টি সমাজের সচেতন গোষ্ঠীর হৃদয়কে এখনো নাড়া দিতে পারেনি। এর একটি অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে পরিবেশ বিষয়ে জ্ঞানের অভাব বা পরিবেশ সচেতনতার অভাব। বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৯ সনে পরিবেশ সংরক্ষণের

জন্য তথা পরিবেশগত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তর গঠন করে। বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় পরিবেশ নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে পরিবেশগত সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ চিহ্নিত করে বাংলাদেশের আংগিকে সমাধানের দিক নির্দেশনা দিয়েছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞের অভাবে তার সঠিক সমাধান সম্ভব হচ্ছে না। অপরদিকে, যিনি যে বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞ তিনি সে বিষয়ের উপর কাজ করছেন না বা করতে পারছেন না বিধায় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না।

আজকের বিশ্বে পরিবেশ বিষয়টি বিশেষ ভাবে আলোচিত। তার সূত্র ধরে সমাজের সুযোগ সন্ধানীরা, যাদের পরিবেশ বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই বললে চলে, তারা নিজেদেরকে পরিবেশ বিশেষজ্ঞ বলে দাবী করছে। আর্থিক সুবিধা লাভ এবং বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে বস্তুত তারাই মন্ত্রণালয়ে বা নীতি নির্ধারণের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রভাব খাটাচ্ছে। পরিবেশ বিষয়ের উপর বিদেশে প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়নের বিষয়টির উপর এ পর্যায়ে আলোকপাত করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ কোনো সরকার "গ্রীন হাউজ প্রভাব"-এর উপর প্রশিক্ষণ বা সেমিনারে অংশগ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে দু'জন/একজন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। এমন একজন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন দেয়া হলো, যার "গ্রীন হাউজ প্রভাব" বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। সে কর্মকর্তা বিদেশে গিয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং দেশের প্রতিবেদন (Country Paper) সেমিনারে উপস্থাপন করবেন। যিনি মূল বিষয়টি সম্পর্কে আলোকপাত করার মত জ্ঞান রাখেন না; তিনি কি করে Country paper প্রণয়ন করবেন এবং বিদেশে সেমিনারে প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন, এটি প্রশ্নের উর্ধ্বে নয়। মনোনীত কর্মকর্তা বিদেশীদের কাছে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারবেন না; বিদেশ থেকে লব্ধ জ্ঞান দেশে এসে কাজে লাগানোর বিষয়টি তো প্রশ্নই আসে না। তাই প্রয়োজন যথোপযুক্ত কর্মকর্তা চিহ্নিত করে তাদেরকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে তৈরি করা। তবেই তা দেশের জন্য কল্যাণকর হবে। নচেৎ অতীতের ন্যায় গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিলে দেশের ভবিষ্যত অপ্রত্যাশিত পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে। বন ও পরিবশে মন্ত্রণালয় উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি কঠোর দৃষ্টি দিলে তবেই পরিবেশ সংরক্ষণে মঙ্গলকর কিছু প্রত্যাশা করা সম্ভব। তার পাশাপাশি প্রয়োজন পরিবেশ সংরক্ষণে রাজনৈতিক অঙ্গীকার। সত্যিকারভাবে রাজনৈতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়িত না হলে যে কোনো উন্নয়ন বিঘ্নিত হওয়া অপ্রত্যাশিত নয়। পরিবেশ দূষণ সমস্যা শুধু বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে সমাধান সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক এবং সামাজিক পদ্ধতি যৌথভাবে সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমেই সত্যিকার অর্থে পরিবেশ দূষণ সমস্যার সমাধান সম্ভব।

বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বনঅধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তর আলাদাভাবে কাজ করছে। বিভাগীয় পর্যায়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যালয়সহ গবেষণাগার রয়েছে। গবেষণা পরিচালনার জন্য জনবল কর্মরত থাকলেও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, কেমিক্যালস ইত্যাদির অপ্রতুলতার কারণে সত্যিকার অর্থে পরিবেশের উপর উল্লেখযোগ্য কোনো গবেষণা পরিচালনা করা সম্ভব হয়না। গবেষণা পরিচালনার জন্য অর্থও অপ্রতুল। পরিবেশ অধিদপ্তর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণার জন্য প্রকল্প প্রস্তাব পেশ করলেও তার জন্য বাজেট না থাকায় বা দাতা সংস্থা পাওয়া না যাওয়ায়, সে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। ফলে পরিবেশ অধিদপ্তরে কর্মরত বৈজ্ঞানিকরা এক পর্যায়ে তাদের

প্রতিভা কাজে লাগাতে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন। বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, বন অধিদপ্তর এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার সহায়তায় দেশে এবং বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। ক্ষতিকর পরিবেশগত সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে সরকারী এবং দাতা সংস্থায় সহায়তায় প্রকল্প গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী।

৩.১ বাংলাদেশে উন্নয়ন কার্যক্রম

বাংলাদেশে বিদেশি এবং দেশি বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করা হচ্ছে মুক্ত বাজার অর্থনীতির সাথে তাল মেলানোর জন্য। দেশের অর্থনেতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে উদার বিনিয়োগ নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে এবং এর ফলে দ্রুত এবং অনিয়ন্ত্রিত শিল্পায়ন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে দেশের পরিবেশকে ধ্বংস করছে। পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের জন্য জরুরী ভিত্তিতে সাবধানতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

৩.২ বাংলাদেশে পরিবেশ আন্দোলন

বাংলাদেশ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের ন্যায় জনসংখ্যা, দারিদ্র, শিক্ষা এবং রাজনৈতিক সমস্যাসহ আরও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় জর্জরিত। দু'শত বৎসরের বৃটিশ শাসনের অবসানের পর ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের ঔপনিবেশ ছিল। ১৯৭১ সালে ৯ মাসে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ৩০ লক্ষ জীবনের বিনিময়ে বাংলাদেশ উন্নীত হয় একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে।

বাংলাদেশ প্রতি বৎসর প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সাইক্লোন, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস এবং খরার ন্যায় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। রাজনৈতিক অস্থিরতাও দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমকে পিছিয়ে দিয়েছে ব্যাপকভাবে।। জনসংখ্যা বাড়ছে দ্রুতগতিতে, যা দেশের ধারণ ক্ষমতার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারের পক্ষে এককভাবে জনগণের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

সমাজবিজ্ঞানী Inglehart তার এক hypothesis এ বলেন– "People tends to high priority whatever the needs are in short supply. When the physiological and physical safety at minimum level then people shifts towards non-materialistic needs." বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক ও শারীরিক নিরাপত্তা অর্জিত হয়নি এখনো, তাই এ পর্যায়ে বাংলাদেশের জনগণের কাছ থেকে অবস্তুতাত্ত্বিক মূল্যবোধ (Post materialistic Values) আশা করা অপ্রত্যাশিত। যদিও কিছু কিছু মানুষ সমাজতান্ত্রিক দল বা কমিউনিষ্ট দল করে থাকে, তাদেরকে বলা যায় ব্যতিক্রমধর্মী, যা পৃথিবীর প্রতিটি দেশে দেখা যায়। তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম। ইউরোপের ন্যায় বাংলাদেশে পরিবেশের উপর কাজ করছে এ ধরনের কোনো রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেনি অর্থাৎ Green Peace এবং Green Parties-এর ন্যায় সংগঠন অবর্তমান। তবে বাংলাদেশে খুবই সীমিত আকারে পরিবেশের উপর কয়েকটি সংগঠন কাজ করছে। এ সংগঠনগুলোর কার্যক্রমের উপর নিম্নে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে জনগণ বন উজাড় করেছে ব্যাপক হারে, যা আমাদের কাছে আজ একটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে দাড়িয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থার কারণে প্রতি বৎসর সাইক্লোন উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা

বেড়েই চলছে। ১৯৯১ সনের ২৯শে এপ্রিল-এ সংঘটিত সাইক্লোনের ধ্বংসলীলায় উপকূলীয় অঞ্চলকে কালপুরীতে পরিণত করে দিয়েছিল। ১ লক্ষ ৩০ হাজার জীবন নাশসহ যে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছিল, তা এখনো সবাইকে আঁৎকে দেয়। লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশের ফলে উকূলীয় বন উজাড় হওয়ার পথে। বাণিজ্যিক উপায়ে চিংড়ি উৎপাদিত হচ্ছে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে, তাও উপকূলীয় বনকে ধ্বংস করছে। উপকূলীয় বন উজাড়ের ফলে সাইক্লোন সরাসরি আঘাত হানছে এবং ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার এবং জনগণ বুঝতে সক্ষম হয়েছে, এ পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য যৌথ উদ্যোগে বনায়ন অত্যাবশ্যক। দাতা সংস্থার আর্থিক সহায়তায় বনবিভাগ বনায়ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। পাশাপাশি কিছু কিছু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও (NGO) সীমিত আকারে বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশে দুটি সক্রিয় অংশগ্রহণকারী (Activits) সংস্থা কাজ করছে এবং তারা রাজনীতিসহ সরকারের নীতি প্রণয়নে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এর একটি হলো Bangladesh Environmental Journalist Forum (BEJF)। এবং অপরটি Bangladesh Environmental Lawyer Association (BELA)। বাংলাদেশে কখনো কখনো সক্রিয় অংশগ্রহণকারী দল গঠিত হয় একটি বিশেষ ধরনের পরিবেশ জনিত সমস্যার সমাধানের জন্য এবং সমাধানের পর তা আবার অবলুপ্ত হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় হাজারীবাগ টেনারী এলাকার সমস্যা সমাধানের জন্য Hazaribag Tannery Area Action Committee গঠিত হয়েছিল, তাঁদের সমস্যার সমাধানের জন্য। BEFJ এবং BELA পরিবেশগত কোনো বিশেষ সমস্যার বিষয়ে পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে বিষয়টি সরকারের গোচরে নেয়ার চেষ্টা করে থাকে। সরকার তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টির উপর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। তবে ইউরোপ এবং আমেরিকার Activists জাতীয় সংস্থাগুলোর ন্যায় BEJF এবং BELA তেমন সক্রিয়ভাবে কাজ করছে না।

দেশে পরিবেশ সংরক্ষণে সীমিত আকারে আনুমানিক ৪০টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (NGO) কাজ করছে। তবে উন্নত দেশ সমূহের ন্যায় তারা রাজনীতি এবং সরকারের নীতি প্রণয়নে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারছে না। বস্তুত তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাবে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বড় আকারের কোনো কার্যক্রম হাতে নিতে পারছে না। বাংলাদেশে কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, বৈজ্ঞানিক এবং আগ্রহী জনগণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিবেশের উপর কাজ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু সমন্বয়ের অভাবে তারা তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারছে না। অপরদিকে আর্থিক সংস্থান না থাকায়ও তারা এক সময় উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় সরকারের প্রকল্প, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরসহ অন্যান্য আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের পরিবেশের উপর কাজের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে দেশের পরিবেশ দূষণ সমস্যার সমাধান করতে পারে।

দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ সরকার এবং দাতা সংস্থা সমূহের একক তহবিলে বন বিভাগ ১৯৯৫-৯৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বৃক্ষরোপণ, উদ্যান উন্নয়ন, বন্যপ্রাণি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, বন সংরক্ষণ ও বনসম্পদ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কিছু প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে।

১৯৮৯ সালে "পরিবেশ অধিদপ্তর" এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গঠনের মাধ্যমে দেশে পরিবেশ সংক্রান্ত ব্যাপক কার্যক্রমের সূচনা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্রিয় সহযোগিতায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৯২ সালে দেশে প্রথম "পরিবেশ নীতি ও এ্যাকশান প্লান" প্রণয়ন করা হয়।

ব্রাজিলের রিওডি জেনারিও–তে ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত হয় "United Nations Conference on Environment and Development" (UNCED); যা Earth Summit নামে পরিচিত। পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে উক্ত সম্মেলনের প্রধান ফসল এজেন্ডা–২১। ধরিত্রী সম্মেলনে দু'টো আন্তর্জাতিক কনভেনশন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। একটি "United Nations Framework Convention on Climate Change" এবং অপরটি "Convention on Bio-Diversity"। তাছাড়াও পরিবেশের ক্ষেত্রে সম্প্রতি বাংলাদেশে যে সকল আন্তর্জাতিক চুক্তি কার্যকরি হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে দেখা যেতে পারেঃ

— Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer,
— Basel Convention on the control of Transboundary movement of Hazardous Wastes
— International Convention to combat Desertification,

উপরোক্ত চুক্তিসমূহ ব্যতিরেকে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় আরো যে দুটি চুক্তির বাস্তবায়ন চলছে তা হলো–

— Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (RAMSAR)
— Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES),

এছাড়া সমুদ্র পরিবেশ সংক্রান্ত যে সকল চুক্তির সাতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় যৌথভাবে সম্পৃক্ত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–

— United Nations Convention on the Law of the Sea.
— International Convention for the Prevention of Pollution from Ships.

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকার এ পর্যন্ত পরিবেশ সংক্রান্ত ২২টি আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বাক্ষরিত পরিবেশ সংক্রান্ত কতিপয় আন্তর্জাতিক চুক্তি ও এগুলো বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ নিম্নে দেয়া হলোঃ

১) Agenda- 21

Agenda-21 কোন চুক্তিবদ্ধ দলিল নয়। এতে ৯০ দশক ও একবিংশ শতকে বিশ্বের দেশ সমূহে পরিবেশগত অবক্ষয় রোধ ও পরিবেশগতভাবে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করণের বিষয়ে কৌশল ও সমন্বিত কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে বিশ্বের দেশসমূহ তাদের নিজস্ব এজেন্ডা তৈরি করার কথা। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের জাতীয়

এজেন্ডা–২১ তৈরির জন্য একটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে, যা বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ও অর্থায়নের প্রক্রিয়াধীন আছে।

সম্প্রতি UNDP-এর সহায়তায় "National Environment Management Action Plan" (NEMAP) প্রস্তুত করা হয়েছে, যাতে জাতীয় এজেন্ডা –২১ এর আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে। এছাড়া পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত National Conservation Strategy (NCS)-এর সেক্টর ভিত্তিক কার্যক্রমেও এজেন্ডা–২১ প্রতিফলিত হয়েছে।

২) "Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer" Montreal - 1987.

বিশ্বব্যাপী ওজোনস্তর ধ্বংসকারী দ্রব্যাদির উৎপাদন ও ব্যবহার রোধকল্পে ১৯৮৭ সালে গৃহীত মন্ট্রিল প্রটোকলে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশ এর লন্ডন এমেন্ডমেন্ট (১৯৯০) অনুস্বাক্ষর করেছে। পরিবেশ অধিদপ্তর, প্রটোকলের আওতায় নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যাদির বছরওয়ারী আমদানি ও ব্যবহারের পরিমাণ সঠিকভাবে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে উক্ত প্রটোকলের আওতায় গঠিত মান্টিলেটারেল ফান্ডের আর্থিক সহায়তায় একটি স্থানীয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একটি Reconnaissance Study এবং পরবর্তীকালে ১৯৯৩ সালে Country Programme for Phasing out the use of Ozone Depleting Substances শীর্ষক একটি বিস্তারিত সমীক্ষা সম্পাদন করেছে।

উক্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন সরকার নীতিগত অনুমোদন করেছেন। কান্ট্রি প্রোগ্রামের আওতায় প্রস্তাবিত ৪ (চার)টি প্রকল্পের মধ্যে "মন্ট্রিল প্রটোকল মান্টিলেটারেল ফান্ড" (এম, এল, এফ) অর্থায়নে ৬৫.১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "Institutional Strengthening for the Phase out of Ozone Depleting Substances" শীর্ষক একটি প্রকল্পের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। এর আওতায় পরিবেশ অধিদপ্তরে ইতোমধ্যে "ওজন সেল" গঠন করা হয়েছে এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

৩) United Nations Framework Convention on Climate Change, Rio-de-Janeiro 1992.

এ চুক্তি বাস্তবায়ন কল্পে দেশে ইতোমধ্যে মোট ৯৯.২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আর্থিক সহায়তায় "বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন সমীক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

৪) Convention on Bio-Diversity, Rio-de-Janeiro, 1992.

এতদ্বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে "Development of Integrated Coastal Zone Management Strategy for Maintenanee of Marine Water Quality and Bio-diversity" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য Activity Initiation Brief (AIB) প্রস্তুত করেছে। উক্ত AIB এর ভিত্তিতে প্রকল্প দলিল তৈরি কল্পে PRIF সমীক্ষা প্রকল্পের প্রস্তাবনা বর্তমানে GEF কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

এছাড়া IUCN এর আর্থিক সহায়তায় NCS Implementation Project-1 শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে "Inventory of Flora and Fauna" এবং Ecosystem Maping এর কাজ চলছে।

৫। Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Waste and their Disposal, Basel 1989.

এ চুক্তি বাস্তবায়নের ইতোমধ্যে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- বাংলাদেশে বর্জ্য আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় "দেশে ক্ষতিকারক ও বিষাক্ত দ্রব্যাদি আমদানির ক্ষেত্রে আইনগত কাঠামো প্রণয়নের জন্য উপদেষ্টামূলক কারিগরী সহায়তা" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটি চলতি বছর জুন মাস নাগাদ সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়।।

৬) RAMSAR Convention

যে সকল Wetland হুমকির সম্মুখীন তা রক্ষা করাই এ চুক্তির উদ্দেশ্য। সম্প্রতি বাংলাদেশের সুন্দরবনকে RAMSAR-এর কার্যক্রম ভুক্ত করা হয়েছে।

৭) CITES

এ চুক্তির সাথে সঙ্গতি রেখে ইতোমধ্যে দেশে বণ্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন জারী করা হয়েছে। এ চুক্তি বাস্তবায়নে বন অধিদপ্তরকে দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য Wildlife Advisory Board গঠিত হয়েছে।

৪. উপসংহার

বাংলাদেশ আর দশটি উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় অত্যধিক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত অপরাপর সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত থাকা সত্ত্বেও পরিবেশগত সমস্যা সমাধানের তথা পরিবেশ সংরক্ষণের যে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে, তা সত্যি প্রশংসনীয়। সরকারের পক্ষে এককভাবে জনগণের সকল সমস্যার সমাধান করে দেয়া কখনই সম্ভব নয়। সরকার এবং জনগণ যৌথ উদ্যোগে পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করলে তবেই তা স্বার্থকভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এজন্য জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। দেশের গণমাধ্যমগুলো এ বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তবে গণমাধ্যমসমূহ ইতোমধ্যে এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সরকার ও জনগণের কার্যক্রমকে সঠিকভাবে বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রজাতন্ত্রের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের উপরও সমভাবে বর্তায়। কর্মকর্তা কর্মচারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তবে আশার বাণী না শুনিয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণে ব্রত হওয়ার জন্য আসুন আমরা একতাবদ্ধ হই, বর্তমান প্রজন্মকে রক্ষা করি এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি দুষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করি।

গ্রন্থপঞ্জি

১. World Development Report, 1992, World Bank Washington D. C. U. S. A.

২. Effect of Climate Change and Sea-level rise on Bangladesh. Dr. F. U. Mahtab. July, 1989.

৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বাংলাদেশের পরিবেশ, এম মনিরুল কাদের, মির্জা এফ সুব্রত পাল, সেন্টার এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ এন্ড রিচার্স (সিইএম আর) ৬৮/১, পুরানো পল্টন, জিপিও বক্স, ঢাকা–১০০০, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২।

৪. Hartjen C. A. 1977, Possible Trouble : an Analysis of Social Problems, Pracger Publishers, NewYork,

৫. Inglehart, R. Selections.

৬. Howard S. Becker, Social Problems: A modern Approach (New York: Wiley, 1966).

৭. Ministry of Environment and Forest, Government of the peoples Republic of Bangladesh. National Environment Management Action Plan (NEMAP). Volume 11: Main Report, (1995).

৮. Ministry of Environment and Forest, Government of the peoples Republic of Bangladesh. National Environment Management Action Plan (NEMAP) Volume la: Summary (1995)

৯. Ministry of Environment and Forest, Government of the Peoples Republic of Bangladesh, Dhaka, Bangladesh, October, 1991. Bangladesh Country Report For United Nations Confernece on Environment and Development (UNCED). Brazil, 1992.

১০. পরিবেশ অধিদপ্তর (Department of Environment), বিশ্বপরিবেশ দিবস (World Environment day, June 5, 1995) : আমরা বিশ্ববাসী: বিশ্ব পরিবেশ রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ (We the peoples: United for the Global Environment).

১১. Department of Environment, Ministry of Environment and Forest, August 1991. Department of Environment - A Brief.

১২. বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫.

১৩. পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয়, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। পরিবেশ নীতি ১৯৯২ ও বাস্তবায়নকার্যক্রম।

১৪. পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা। পরিবেশ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের অংগীকার সমূহ ও উহাদের বাস্তবায়ন অগ্রগতি।

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৭ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, আশ্বিন ১৪০৩

উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণ

কাজী হাসান ইমাম*

১.০ ভূমিকা

১.১ উন্নয়নের ক্ষেত্রে নীতি প্রণয়নে প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণের বাস্তব অবদান রিও–ঘোষণার ১৭ সংখ্যক নীতিমালায় সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয়েছে। টেকসই উন্নয়নে নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কৌশলিক পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণের গুরুত্ব অপরিসীম। বৈশিষ্টগত দিক থেকে পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণ হচ্ছে এক ধরনের নীতি বিশ্লেষণ, যার মাধ্যমে প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের স্থৈতিক পরিণতি চিহ্নিতকরণ, মূল্যায়ন ও ঋণাত্মক প্রভাব হ্রাসকরণ সম্ভব। পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণ ও তার সম্পৃক্ত অংশসমূহ যেমন, সামাজিক প্রভাব নির্ধারণ বা ঝুঁকি বিশ্লেষণ ইত্যাদি প্রাথমিক পর্যায়ে সূচনা করা হয় উন্নয়নের গুণগত ও অবাস্তব প্রতিক্রিয়া নিরূপণে অর্থনৈতিক কলা– কৌশলের ঘাটতিসমূহ পূরণের জন্য। প্রক্রিয়াগত দিক থেকে খুব স্বল্প সময়ে এ ধারার ব্যাপক বিবর্তন পরিলক্ষিত হয় এবং বর্তমানে এটি নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারসমূহের অন্যতম হিসেবে বিবেচিত। উন্নয়নের টেকসই ধারা নিশ্চিত করতে সকল উন্নয়ন বিকল্প ও কার্যক্রম বৈশ্বিক জীবমন্ডল *(global bio-sphere)* ও আঞ্চলিক বাস্তব্যরীতির *(regional ecosystems)* সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। সে কারণে কোথায় উন্নয়ন হবে, তার থেকে কিভাবে উন্নয়ন ঘটানো হবে সেটাই বিশ্বে সবচেয়ে বড় বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এ বিবেচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনা ও তার ঋণাত্মক প্রভাব হ্রাসকরণের হাতিয়ার হিসেবে পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণ ক্রমশই গুরুত্ব পাচ্ছে।

১.২ পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণ

পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণ হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে পরিবেশগত সম্পদে ও সামাজিক জীবনে উদ্ভুত সম্ভাব্য ধনাত্মক ও ঋণাত্মক/প্রতিকূল পরিবর্তনসমূহ নিরূপণ করা হয়। এ প্রক্রিয়াটি নিম্নোক্ত তিনটি ধারাবাহিক উপাদানকে অন্তর্ভুক্ত করে ঃ

ক. একটি প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে প্রাকৃতিক ও মানবিক পরিবেশে উদ্ভুত সম্ভাব্য সকল ধনাত্মক ও ঋণাত্মক প্রভাব চিহ্নিতকরণ,

খ. বিদ্যমান ভিত্তির আলোকে চিহ্নিত সকল প্রভাবের গাণিতিক মূল্যায়ন।

---

* উপ–পরিচালক, বাংলাদেশ লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,

গ. একটি উপশম পরিকল্পনা প্রণয়ন, যা বাস্তবায়িত হলে প্রকল্পের স্থৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঋণাত্মক প্রভাবসমূহকে একটি গ্রহণযোগ্য স্তর পর্যন্ত হ্রাস করবে অথবা ঋণাত্মক প্রভাবসমূহকে ধনাত্মক প্রভাবে রূপান্তরিত করবে। এ ধরনের পরিবর্তন প্রকল্পের বিকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করে বা প্রকল্পের ঈষৎ পরিবর্তন করে অথবা পরিবেশগত সংরক্ষণ পদক্ষেপের মাধ্যমে আনা যেতে পারে।

পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় একটি পরিবীক্ষণ পরিকল্পনাও অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে, যার মাধ্যমে পরিবেশগত অবক্ষয় রোধে গৃহীত উপশম পরিকল্পনার কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করা যাবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উদ্ভুত পরিবেশগত ও সামাজিক পরিবর্তনসমূহ নিবিড়ভাবে পর্যালোচিত হতে পারবে।

১.৩ পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণ ও সহায়ক যোগসূত্রসমূহ

পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণ প্রক্রিয়া মূলত টেকসই উন্নয়ন আদর্শের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। সে কারণে এ প্রক্রিয়ার সহায়ক যোগসূত্রসমূহও ব্যাপক। ঝুঁকি বিশ্লেষণ, ব্যয়–সুবিধা বিশ্লেষণ সামাজিক প্রভাব নিরূপণ এগুলো মূলত পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণ–এর অংশ *SEA* [১] উন্নয়ন নীতিমালা, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নে পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণের প্রয়োজনীয় মূল উপাদানসমূহ সম্প্রসারিত করে। আর উন্নয়ন নীতিমালা, পরিকল্পনা ও কর্মসূচির মাধ্যমেই প্রাকৃতিক মূলধনের রূপান্তর অথবা অবক্ষয় ঘটে। এ ভ্রূণাবস্থিত দৃষ্টিভঙ্গি আবশ্যিকভাবে প্রদর্শিত প্রক্রিয়া অনুসারে (চিত্র–১) পরিবেশ–অর্থনীতি সামঞ্জস্যবিধানের যন্ত্রসমূহ ও অন্যান্য কৌশলের সাথে সমন্বিত হতে হবে। এক্ষেত্রে প্রমিতাবস্থা থেকে টেকসই কর্মসূচির পথে অগ্রসর হতে *SEA*-কে একটি দিক হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে চিত্রে প্রদর্শিত এ প্রক্রিয়াটি নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করে ঃ

ক. পরিবেশগত লক্ষ্য ও আদর্শসমূহকে সর্বোচ্চ–স্তরিক নীতি প্রণয়নে সঞ্চালন ও সমন্বয় করতে সহায়তা করে;

খ. এটা নিশ্চিত করে যে, অর্থনৈতিক ও রাজস্ব সংস্থাসমূহ তাদের পছন্দ ও কার্যক্রমের ফলে উদ্ভুত পরিবেশ পরিণতির জন্য তারাই দায়ী ও জবাবদিহির জন্য দায়বদ্ধ; এবং

গ. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণায় দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনকে উজ্জীবিত করে।

এসকল দিক বিচারে বলা যায় যে, পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণের বিষয়টি সামগ্রিক অর্থনীতির প্রতিটি স্তরের সাথে গ্রোথিত। সে কারণে এর ব্যাপ্তিও যেমন ব্যাপক, তেমনি প্রক্রিয়াগত দিক থেকে বিষয়টি জটিল।

---

[১] SEA Strategic Environmental Assessment.

চিত্র–১ ঃ পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণ ও সহায়ক যোগসূত্রসমূহ

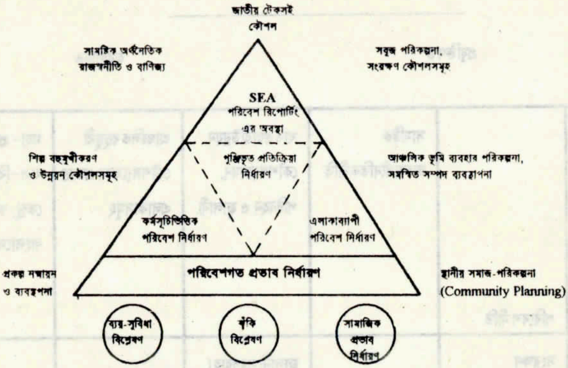

১.৪ পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণের স্তরীকরণ বিকল্প ও যোগসূত্র

সাধারণভাবে স্তরীকরণ হচ্ছে *"the sequential process of addressing issues and impacts at the appropriate levels and with the degree of effort required for decision-making"* এবং পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণের ক্ষেত্রে এটি ইতোমধ্যেই একটি পরিচিত ধারণা। যেকোন সরকার তার যৌক্তিক ভিত্তির ওপর নির্ভর করে সামষ্টিক নীতি গ্রহণ করে এবং সামষ্টিক নীতির আলোকে প্রণীত হয় খাতওয়ারী নীতিমালা; নীতিমালার আলোকে সরকার কর্মসূচি গ্রহণ করে ও কর্মসূচি পরিচালনার্থে পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং প্রকল্পের মাধ্যমে এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়। অন্যদিকে চিত্র–১ এ *SEA*-কে অন্যান্য নীতিমালা ও পরিকল্পনা–ইনস্ট্রুমেন্টের সাথে সমন্বিত করা হয়েছে, যাতে এর মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ হ্রাসের পূর্ণ মূল্যমান 'জাতীয় হিসাবে' এ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। পরিবেশ প্রতিবেদনের সাথে জাতীয় 'অর্থনৈতিক হিসাব'কে তুলনা করে 'পরিবেশ–অর্থনীতি সমন্বয়ন' প্রাথমিকভাবে সামষ্টিক নীতিমালা স্তরে সংগঠিত হতে হবে এবং এরপর সবুজ পরিকল্পনা ও টেকসই কৌশলের মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে। সবশেষে, *"full-cost accounting of development programmes must be ecologically grounded by regional planning that adjust land uses to resource potentials and provide an integrated context for project assessment"*

চিত্র–২ ঃ পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণের স্তরিক পদ্ধতি

	যৌক্তিকতা	প্রযুক্তিগত			মিটিগেশন
	প্রযুক্তিগত			অবস্থানিক	
নীতিমালা	পরিবেশ নীতি	সামষ্টিক কতঅর্থনৈতিক নীতি	খাত ওয়ারী উন্নয়ন কৌশল (যেমন, পরিবহন ও জ্বালানী	আঞ্চলিক বহুমুখী কৌশল (যেমন প্রত্যন্ত এলাকাসমূহ	মহা–প্রকল্প (যেমন, জল–বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, কাপ্তাই, এইচ বাংলাদেশ
কর্মসূচি	সংরক্ষণ		জ্বালানী সরবরাহ(যেমন, তেল, গ্যাস, আণবিক, জলবিদ্যুৎ ইত্যাদি		
পরিকল্পননা	সমন্বিত নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা			জল–সুবিধাদি পরিকল্পনা, যেমন রিজার্ভার তৈরি, সঞ্চালন করিডোর	
প্রকল্প	প্রথিত পরিবেশ যেমন, পানির গুণগত মান ও মৎস্য সংরক্ষণ				স্থান–নির্দিষ্ট প্রভাব নির্ধারণ

উৎস ঃ *Goodland, Robert and Valerie Edmundson ed.: Environemental Assessment and Development, The World Bank, Washington D. C., 1994, পৃ. ৮।*

১.৫ পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণের পদ্ধতিসমূহ

পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণ কার্যক্রম পরিচালনার্থে শতাধিক পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে। তবে এগুলোর বেশির ভাগ পদ্ধতিকেই মাত্র স্বল্প কিছু শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। উন্নয়নশীল বিশ্বের উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণের জন্য উপযুক্ত হিসেবে আটটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল ও পদ্ধতিকে বিবেচনা করা হয়। এগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। যাচাই–তালিকা *(Checklists)*, ২। ছাঁচ *(Matrices)*, ৩। আচ্ছাদন *(Overlays)*, ৪। জালাকার *(Networks)*, ৫। পরিবেশ সূচি *(Environmental Indices)*, ৬। ব্যয়–সুবিধা বিশ্লেষণ *(Cost-Benefit Analysis)*, ৭। অনুকরণ নকশায়ন কর্মশালা *(Simulation Modeling Workshops)*, ৮। পরিবেশ মূল্যায়ন পদ্ধতি *(Environmental Evaluation System)*।

এ সকল পদ্ধতিই সব ধরনের প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত নয়। এমনকি ঈষৎ পরিবর্তন/পরিমার্জন ছাড়া সকল উন্নয়নশীল দেশেও এগুলো প্রযোজ্য হয় না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে প্রতিটি পদ্ধতির সবল ও দুর্বল দিকগুলো যথার্থভাবে অনুধাবন করা, যাতে একটি দেশের বিদ্যমান প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক অবস্তা বিবেচনা করে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পের জন্য সঠিক পদ্ধতিটি বেছে নেয়া যায়। *ESCAP* ১৬টি মানের *(criteria)* ওপর ভিত্তি করে উল্লিখিত পদ্ধতিগুলোর মূল্যায়ন করেছে। নিম্নের সারণীতে *ESCAP*-এর মূল্যায়ন সারণি-১-এ প্রদর্শিত হলো ঃ

সারণি –১

পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণ পদ্ধতিসমূহের মূল্যায়ন সংক্ষেপ

	মান	যাচাই তালিকা	ছাঁচ	আচ্ছাদন	জালাকার	পরিবেশ সূচি	ব্যয়–সুবিধা বিশ্লেষণ	অনুকরণ নকশায়ন কর্মশালা	পরিবেশ মূল্যায়ন পদ্ধতি*
১.	ব্যাপকতা	S	N	L	S	S	S	L	L
২.	যোগাযোগ দক্ষতা	L	L	S	L	S	L	L	L
৩.	স্থিতিস্থাপকতা	L	S	L	L	S	S	L	L
৪.	উদ্দেশ্যমুখীতা	N	S	S	L	L	L	S	L
৫.	পুঞ্জিতকরণ	N	S	N	N	S	S	N	L
৬.	পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা	S	L	S	S	S	S	S	L
৭.	বহুমুখী কার্যক্রম	N	S	S	S	S	S	L	L
৮.	অনিশ্চয়তা	N	N	N	N	N	N	S	S
৯.	স্থান–মাত্রিকতা	N	L	N	N	S	N	S	L
১০	সময়–মাত্রিকতা	S	N	N	N	S	S	L	L
১১	উপাত্তের প্রয়োজনীয়তা	L	N	S	S	S	N	N	S
১২	সংক্ষিপ্ত রূপ	L	S	S	S	S	L	L	L
১৩	বিকল্প তুলনা	S	L	L	L	L	L	L	L
১৪	সময়ের প্রয়োজনীয়তা	L	N	S	S	S	S	N	S
১৫	জনশক্তির প্রয়োজনীয়তা	L	S	S	S	S	S	N	S
১৬	আর্থিক সংশ্লেষ	L	L	L	L	L	L	N	L

*added to the source-table

L=Completely Fulfilled or Law Resource Need, S=Partially Fulfilled or Moderate Resource Need, N=Negligibly Fulfilled or High Resource Need

উৎস ঃ Environmental Assessment : Guidelines for Planners and Decision-Makers, UN Publication, ST/ESCAP, 1985.

ESCAP উদ্ধৃত এ মূল্যায়ন সংক্ষেপ (সারণী–১) বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, প্রত্যেক পদ্ধতিরই কিছু না কিছু দুর্বল দিক রয়েছে এবং কোন পদ্ধতিই এককভাবে সকল অনুশীলনে ভাল নয়। পদ্ধতি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত সারণীটি একটি নির্দেশক মাত্র। তবে কোন একটি বিশেষ প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণে কোন্ বিষয়গুলো অবশ্যপূরণীয় এবং কোন্ পদ্ধতিটি তা সবচেয়ে বেশি পূরণ করে তা দেখে পদ্ধতি নির্বাচন করা যেতে পারে।

১.৬ আলোচনার পরিধি ও সীমাবদ্ধতা

প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণ একটি জটিল ও কারিগরী *(technical)* বিষয়। বিষয়টিকে এ প্রবন্ধে সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। প্রবন্ধটি পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণ ও সহায়ক যোগসূত্রসমূহ, স্তরীকরণ বিকল্প এবং পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণ পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রকল্পের শ্রেণী বৈশিষ্ট ও বিশেষজ্ঞ–দল গঠন, পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণ পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও প্রতিবেদন প্রণয়নের ওপর আলোচনা করা হয়েছে। সামগ্রিক বিষয়টির কারিগরী দিক সম্পর্কিত ধারণা সুস্পষ্টতর করার উদ্দেশ্যে পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণ সম্পন্ন হয়েছে বাংলাদেশের এমন একটি প্রকল্পকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রবন্ধের তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে যথাক্রমে ব্যবস্থাপনা ও সাংগঠনিক বিষয়াবলী এবং পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণের অসুবিধাসমূহ বিশ্লেষিত হয়েছে। সবশেষে, পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে উপসংহার। সামগ্রিকভাবে প্রবন্ধটিতে তৃতীয় বিশ্বের, বিশেষত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রবন্ধে চিত্র ও সারণী ব্যবহারের মাধ্যমে আলোচনা ও বিশ্লেষণকে সংক্ষিপ্ত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। কলেবর বৃদ্ধির কারণে প্রবন্ধে প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা বা *Initial Environmental Examination* সম্পর্কে তেমন কোন আলোচনা করা সম্ভবপর হয়নি। অবশ্য বিষয়টির ওপর একটি পৃথক সমীক্ষারও অবকাশ রয়েছে।

২.০ পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণ

২.১ পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণ পদ্ধতি প্রকল্পের প্রকৃতির ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। তবে, এ কাজে যে পদ্ধতিই গ্রহণ করা হোক না কেন, পদ্ধতি নক্শায়ন সম্ভাব্য সহজ হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং তা দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতির সাথে মানানসই হওয়া উচিৎ।

২.২ প্রকল্পের শ্রেণী বৈশিষ্ট ও বিশেষজ্ঞ-দল গঠন

২.২.১ কোন একটি প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার পূর্বে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে যে, উক্ত প্রকল্পের জন্য আদৌ এ প্রক্রিয়া অবলম্বন করার প্রয়োজন আছে কি–না। সাধারণত প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা প্রতিবেদন বা পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। বিশ্বব্যাঙ্ক বিশেষজ্ঞদের মতে উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণে প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে প্রকল্পসমূহকে নিম্নোক্ত চারটি শ্রেণী বৈশিষ্টে ভাগ করা যেতে পারে ঃ

শ্রেণী	প্রকল্পের বৈশিষ্ট
ক.	যেসকল প্রকল্পের বহুমুখী ও গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত প্রভাব থাকতে পারে, সাধারণভাবে সেগুলোর পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণ করতে হবে;
খ.	যেসকল প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট কতগুলি পরিবেশগত প্রভাব থাকতে পারে, সেগুলোর অপেক্ষাকৃত সীমিত আকারে পরিবেশগত বিশ্লেষণ করা বাঞ্ছনীয়;
গ.	যেসকল প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কোন পরিবেশগত প্রভাব থাকার সম্ভাবনা নেই, সাধারণভাবে সেগুলোর পরিবেশগত বিশ্লেষণ অনাবশ্যক; এবং
ঘ.	প্রকল্প প্রণয়নকালে যে সকল প্রকল্পের একটি প্রধান ফোকাস্ হচ্ছে পরিবেশ, সেগুলোর ক্ষেত্রে আলাদাভাবে পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণের প্রয়োজন নেই।

২.২.২ বিশ্বব্যাঙ্কের এ শ্রেণী বিন্যাস যেকোন প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণের প্রয়োজন হবে কি হবে না, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রয়োজনীয় সহায়ক দিক নির্দেশনা প্রদান করে। প্রকল্পের বৈশিষ্টের ওপর নির্ভর করে পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণের বিষয়টি সেক্টরভিত্তিক, আঞ্চলিক, আন্তর-জাতিক *(trans-national)*, আন্তর্জাতিক ও বৈশ্বিক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

২.২.৩ প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে কোন প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণের প্রয়োজন দেখা দিলে একাজে একটি বিশেষজ্ঞ-দল গঠন করতে হবে। বিশেষজ্ঞ-দলের গঠন প্রকৃতি প্রকল্পের ধরন ও তার স্থৈতিক প্রভাব বলয়ের ওপর নির্ভরশীল।

২.৩ পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণের পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া

২.৩.১ পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণের জন্য প্রকল্পের বৈশিষ্ট অনুসারে প্রচলিত পদ্ধতিসমূহের মধ্যে থেকে সুবিধাজনক যেকোন একটি পদ্ধতিকে অনুসরণ করা যেতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধে বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি সুনির্দিষ্ট এবং সমাপ্ত প্রকল্পের (উপজেলা সড়ক প্রকল্প) পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণের পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া উদাহরণ হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং প্রকল্পের বৈশিষ্ট ও দেশের বিদ্যমান সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করে এ ক্ষেত্রে পরিবেশ মূল্যায়ন পদ্ধতিটি অনুসরণ করা হয়েছে।

২.৩.২ সাধারণভাবে পরিবেশগত প্রভাবকে "পরিবেশগত প্রভাব-মান" বা *Environmental Impact Values (EIVs)* হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। গাণিতিকভাবে "পরিবেশগত প্রভাব-মান"কে নিম্নরূপে প্রকাশ করা হয় ঃ

$$EIV = \sum_{i=1}^{n} (Vi)\, Wi$$

এখানে, Vi = বিদ্যমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে পরিবেশগুণের দিক থেকে i ধ্রুবকের *(parameter)* মানের আপেক্ষিক পরিবর্তন;

Wi = আপেক্ষিক গুরুত্ব বা ধ্রুবক i এর জন্য প্রদত্ত গুণনীয়ক মাত্রা *(weight)*; এবং

n = প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত পরিবেশগত ধ্রুবকের মোট সংখ্যা।

২.৩.৩ অর্থাৎ এ সূত্রানুসারে প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব হিসাব করতে হলে Vi বা পরিবেশগত ধ্রুবকসমূহের পরিবর্তনের মাত্রা এবং Wi বা ধ্রুবকসমূহের স্ব-স্ব আপেক্ষিক গুরুত্ব বা গুণনীয়ক মাত্রা *(relative weight)* নির্ধারণ করতে হবে।

২.৪ পরিবেশগত পরিবর্তনের মাত্রা *(Vi)* নির্ণয়

কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে উদ্ভূত পরিবেশগত ধ্রুবকসমূহের ঋণাত্মক/প্রতিকূল পরিবর্তনকে সাধারণত গুণগতভাবে প্রকাশ করা হয়। যেমন, সড়ক নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে মৎস্য সম্পদের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া/প্রভাব সৃষ্টি হতে পারে। মাত্রাগত দিক থেকে এ প্রভাবকে শূন্য, অত্যন্ত কম, কম, পরিমিত, উচ্চ ও মারাত্মক ইত্যাদি স্কেলে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। কিন্তু সামগ্রিক পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণ করতে গেলে পরিবেশগত ধ্রুবকসমূহের মান গাণিতিকভাবে প্রকাশ করা আবশ্যক। এজন্য ধ্রুবকসমূহের গুণগত মানের পরিবর্তনের মাত্রাকে একটি গাণিতিক স্কেলে রূপান্তর করা হয়। নিম্নে এরূপ রূপান্তরের একটি নমুনা প্রদান করা হলো (সারণি-২) ঃ

সারণি - ২
পরিবেশগত ধ্রুবকের গুণগত পরিবর্তনের গাণিতিক রূপান্তর

ধ্রুবকের পরিবর্তনের মাত্রা (গুণগত)		ধ্রুবকের পরিবর্তনের মাত্রা (গাণিতিক)	
		ধনাত্মক	ঋণাত্মক
১.	শূন্য	০	০
২.	অত্যন্ত কম	+১	-১
৩.	কম	+২	-২
৪.	পরিমিত	+৩	-৩
৫.	উচ্চ	+৪	-৪
৬.	মারাত্মক	+৫	-৫

এখন, প্রস্তাবিত প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ধ্রুবকসমূহকে চিহ্নিত করতে হবে (উদাহরণস্বরূপ সারণি -৪ এর প্রথম কলামে উপজেলা সড়ক প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট

ধ্রুবকসমূহকে চিহ্নিত করা হয়েছে) এবং চিহ্নিত ধ্রুবকসমূহের স্থৈতিক প্রভাবের মাত্রা কি হবে, তা নির্ণয করতে হবে (উদাহরণস্বরূপ সারণী–৩ এর তৃতীয় কলামে পূর্বোক্ত প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট ধ্রুবকসমূহের স্থৈতিক প্রভাবের মাত্রা সারণী–২ অনুসারে প্রথমে গুণগতভাবে নির্ণয় করে পরবর্তীতে গাণিতিকভাবে রূপান্তর করা হয়েছে)।

২.৫ পরিবেশগত ধ্রুবকসমূহের আপেক্ষিক গুরুত্ব (Wi)

গৃহীত প্রকল্পের মাধ্যমে প্রভাবিত পরিবেশগত সকল ধ্রুবককে সমান গুরুত্ব দেয়া হয় না। বিভিন্ন দেশের পরিবেশ বিবেচনার প্রকৃতি বা ধরনের ওপর নির্ভর করে ধ্রুবকসমূহের গুরুত্ব নির্ধারণ করা হয়। উদাহরণত বাংলাদেশে বন্যা, চাকুরী, কৃষি, মৎস্য প্রভৃতি ধ্রুবককে অন্যান্য অনেক ধ্রুবক থেকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। দেশের বিদ্যমান পরিবেশ বিবেচনার ধরনের ওপর নির্ভর করে চিত্র–৩ এ অবকাঠামোগত প্রকল্পের বিভিন্ন পরিবেশগত ধ্রুবকের নির্ণীত আপেক্ষিক গুরুত্ব উপস্থাপিত হয়েছে এবং নির্ণীত এ আপেক্ষিক গুরুত্ব মোতাবেক সারণী–৩ এর দ্বিতীয় কলামে উপজেলা সড়ক প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট ধ্রুবকসমূহের আপেক্ষিক গুরুত্বের মান (Wi) প্রদর্শিত হয়েছে।

২.৬ পরিবেশগত প্রভাবের হিসাব নিরূপণ/গণনা

সাধারণত বিভিন্ন উপায়ে প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত ধ্রুবকসমূহের সম্ভাব্য ধনাত্মক বা ঋণাত্মক পরিবর্তন সম্পর্কে পূর্ব–পরিকল্পিত ছকে ও স্কেলে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত এ তথ্যকে পরবর্তীতে প্রবন্ধের ২.৪ সংখ্যক অনুচ্ছেদে বর্ণিত নিয়মে গাণিতিক মানে রূপান্তর করা হয়। অন্যদিকে প্রবন্ধের ২.৫ সংখ্যক অনুচ্ছেদে বর্ণিত নিয়মে দেশের বিদ্যমান পরিবেশ বিবেচনা ও পরিস্থিতির আলোকে বিশেষজ্ঞ–দলের সদস্যেরা প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত ধ্রুবকসমূহের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণ করে থাকেন। প্রকৃত বিচারে এ দু'য়ের গুণফলের (অর্থাৎ Wi X Vi বা উদাহরণত সারণী–৩, কলাম ১ X কলাম ২) মাধ্যমেই পরিবেশগত প্রভাবের হিসাব নিরূপণ করা হয়। নিম্নে উপজেলা সড়ক প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাবের হিসাব *(EIV)* নিরূপণ প্রক্রিয়া উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপিত হলো (সারণী–৩)ঃ

চিত্র–৩ ঃ বাংলাদেশের অবকাঠামোগত প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত পরিবেশগত ধ্রুবকসমূহের আপেক্ষিক গুরুত্বের মান

পরিবেশগত ধ্রুবকসমূহের মোট গুরুত্ব–মান
১০০

২৫ প্রতিবেশগত ধ্রুবকসমূহ
- [১০] মৎস্য সম্পদ
- [৩] বন্যজীবন
- [৫] বন
- [২] বৃক্ষরোপণ
- [৪] জলাভূমি
- [১] নুইসেন্স প্লান্ট /ইউট্রোফিকেশন

৩৫ ভৌত–রাসায়নিক ধ্রুবকসমূহ
- [২] ভূমিক্ষয় ও পললায়ন
- [৫] ড্রেইনেজ কঞ্জেস্‌শন / জলাবদ্ধতা
- [৬] আঞ্চলিক হাইড্রোলোজি/বন্যা
- [৬] বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ড্রেইনেজ
- [৫] মৃত্তিকার বৈশিষ্ট/মৃত্তিকার উর্বরতা
- [৩] ভূ–গর্ভস্থ পানির স্তর
- [৩] পানি দূষণ
- [২] ধুলি–দূষণ/শব্দ দূষণ
- [৩] ময়লা পানি প্রবাহে বাধা

৪০ মনুষ্য সুবিধা/স্বার্থ সম্পৃক্ত ধ্রুবকসমূহ
- [৬] স্বাস্থ্য ও পুষ্টি
- [৮] কৃষিভূমি হ্রাস,
- [৮] চাকুরী সুবিধাদি
- [৬] বাণিজ্যিক ও সেবা সুবিধাদি
- [৩] নৌ–চলাচল/পরিবহন
- [৩] শিল্প–কার্যক্রম
- [২] সেচসুবিধা
- [২] ভূমি মালিকানারি ধরন
- [২] ভূমিরূপ

[ ] ধ্রুবক–মান

☐ মোট এবং কম্পোনেন্ট মান

সারণি –৩

উপজেলা সড়ক প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাবের হিসাব নিরূপণ

পরিবেশগত ধ্রুবকসমূহ	আপেক্ষিক গুরুত্বের মান (Wi)	প্রভাব–মান (Vi)	আপেক্ষিক প্রভাব		পরিবেশগত প্রভাব–মান $EIV=\sum_{n=1}^{n}(Vi)\,Wi$
			ধনাত্মক	ঋণাত্মক	
প্রতিবেশগত					– ১৯
মৎস্য সম্পদ	১০	–২		–২০	
বন	৫	০			
বৃক্ষরোপণ	২	+১	+২		
জলাভূমি/জলাভূমির আবাস	৪	০			
নুইসেন্সপ্রান্ট/ইউট্রোফিকেশন	১	–১		–১	
ভৌত–রাসায়নিক					–১৪
ভূমিক্ষয় ও পললায়ন	২	–১		–২	
আঞ্চলিক হাইড্রোলোজি/বন্যা	৬	–১		–৬	
ড্রেইনেজ কঞ্জেস্‌শন/বন্যা	৬	–১		–৬	
ময়লা পানি প্রবাহে বাধা	৩	০			
ধূলি–দূষণ/শব্দ–দূষণ	২	০			
মনুষ্য সুবিধা সম্পৃক্ত					+২৭
কৃষিভূমি হ্রাস	৮	–৩		–২৪	
চাকুরী সুবিধা	৮	+৪	+৩২		
নৌ–চলাচল/পরিবহন	৩	–৩		–৯	
বাণিজ্যিক ও সেবা সুবিধা	৬	+৩	+১৮		
শিল্প কার্যক্রম	৩	+২	+৬		
সেচ সুবিধা	২	+৩	+৬		
ভূমিরূপ	২	–১		–২	
মোট পরিবেশগত প্রভাব–মান			+৬৪	–৭০	–৬

উৎস **:** *Local Government Engineering Bureau, : Guidelines on Environmental Issues Related to Physical Planning; 1992, p. 25.*

২.৭ ধারাবাহিক প্রক্রিয়া

প্রবন্ধের ২.২–২.৬ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতিটি প্রক্রিয়াগত দিক থেকে মূলত ধারাবাহিকভাবে অনুসৃত বিভিন্ন কার্যক্রমের *(series of activities)* ফলশ্রুতি। যেকোন প্রস্তাবিত প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব কার্যকরীভাবে নির্ধারণ করতে হলে, প্রকল্পের স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন, জরিপ পরিচালনা, মাধ্যমিক উৎসের তথ্য সংগ্রহ, স্থানীয় জনগণের মতামত গ্রহণ ইত্যাদি বহুমুখী ও নিবিড় প্রয়াস নেয়া আবশ্যক। পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণের এ প্রক্রিয়াকে নিম্নোক্ত ৬টি ধারাবাহিক পদক্ষেপে ভাগ করা যেতে পারে ঃ

২.৮ প্রথম পদক্ষেপ ঃ প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম

প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশ মূল্যায়ন প্রতিবেদন *(Initial Environmental Examination Report -IEER)* গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করতে হবে। এরপর, প্রকল্পের প্রধান প্রভাব–বলয় চিহ্নিত করতে হবে। ব্যাপক সমীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে এমন সব প্রধান পরিবেশগত ধ্রুবকের বিস্তারিত বর্ণনা উপস্থাপন করতে হবে এবং পরিবেশগত পরিবর্তন পরিমাপের জন্য মান *(criteria)* নিরূপণ করতে হবে।

২.৯ দ্বিতীয় পদক্ষেপ ঃ উপাত্ত সংগ্রহ

প্রকল্পেরর সাথে সম্পৃক্ত সম্ভাব্য সকল মাধ্যমিক উৎসের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং বিদ্যমান ভৌত, পরিবেশগত ও আর্থ–সামাজিক অবস্থার ওপর জরীপ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। প্রধান ইস্যুসমূহের ওপর বিশেষ জোর দেয়াসহ সম্পৃক্ত সকল পরিবেশগত ধ্রুবকের স্থৈতিক পরিবর্তনসমূহ পরিমাপ করতে হবে। স্থানীয় তথ্যসমৃদ্ধ লোক ও প্রকল্পের ফলভোগীদের মতামত নিতে হবে।

২.১০ তৃতীয় পদক্ষেপ ঃ উপাত্ত বিশ্লেষণ

সারণী–২ এ উপস্থাপিত নিয়মে মাঠ–পর্যায়ের মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত ধ্রুবকের পরিবেশগত পরিবর্তনের গুণগত মাত্রাকে গাণিতিক সংখ্যায় রূপান্তর করতে হবে (সারণী–৩)। যদি মূল্যায়ন–দলে একাধিক সদস্য থাকে, তবে প্রত্যেককে আলাদাভাবে তাদের মূল্যায়ন ফলাফলকে গাণিতিক সংখ্যায় রূপান্তর করতে হবে এবং সামগ্রিক ক্ষেত্রে এগুলোর গড় মান ব্যবহার করতে হবে।

২.১১ চতুর্থ পদক্ষেপ ঃ প্রভাব মুল্যায়ন

প্রতিটি ধ্রুবকের পরিবেশগত পরিবর্তনের মাত্রা–মান *(Vi)* কে (সারণী–৩, কলাম–৩) ধ্রুবকসমূহের আপেক্ষিক গুরুত্ব–মান *(Wi)* দিয়ে গুণ করলে (চিত্র–২ বা সারণী–৩, কলাম–২) প্রভাব–মান *(impact value)* পাওয়া যাবে। প্রভাব–মান নির্ণয় করার এ প্রক্রিয়াটি সারণী–৩ এ দেখানো হয়েছে। ধ্রুবকসমূহের প্রভাব মানকে যোগ করলে প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব–মান *(EIV)* পাওয়া যাবে (সারণী–৩)।

২.১২ পঞ্চম পদক্ষেপ ঃ উপশম ও পরিবীক্ষণ পরিকল্পনা

সারণী–৩ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, কিছু কিছু ধ্রুবকের ঋণাত্মক প্রভাব রয়েছে। প্রকল্পের যেসকল ধ্রুবকের এরূপ ঋণাত্মক প্রভাব থাকে, সেগুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে তার প্রভাব হ্রাসকরণ পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে ঋণাত্মক প্রভাবসমূহকে ধনাত্মক প্রভাবে রূপান্তরিত করা যায়। সারণী–৩ এ প্রদর্শিত উপজেলা সড়ক প্রকল্পের বেশ কিছু পরিবেশগত ঋণাত্মক প্রভাব রয়েছে। সঠিক উপশম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ সকল ঋণাত্মক প্রভাব হ্রাস করা যেতে পারে। উল্লিখিত প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে মৎস্য সেক্টরে যে সকল বিরূপ প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব সৃষ্টি হতে পারে তা হ্রাসকরণে নিম্নে (সারণী–৪) উদাহরণ হিসেবে একটি উপশম পরিকল্পনা উপস্থাপিত হলো। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে উপশম পদক্ষেপসমূহ যাতে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়, সেজন্য একটি পরিবীক্ষণ পরিকল্পনাও অনুসরণ করতে হবে।

সারণি — ৪

প্রতিকূল পরিবশেগত প্রভাব ও উপশম পদক্ষেপসমূহ

পরিবেশগত সম্পদ ও মূল্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী কার্যক্রম	স্থৈতিক পরিবেশগত প্রভাব	উপশম পদক্ষেপসমূহ
১. প্রাবনভূমির প্রজনন, নার্সারী ও খাদ্য হ্রাস	১. ক. উন্মুক্ত জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ হ্রাস। খ. মৎস্য জাতীয় আমিষ গ্রহণ হ্রাস। গ. মৎস্যজীবীদের বেকারত্ব	১.ক. নিয়ন্ত্রিত বন্যা অনুমোদন করতে হবে। খ. মৎস্যচাষের মাধ্যমে অভাব পূরণ করতে হবে।
২. মাছের অভিগমনে বাঁধা	২. ১ক, ১খ ও ১গ এর মত।	২. মাছের যাতায়াতের জন্য রাস্তা ও ভেড়ীবাঁধে পর্যাপ্ত সংখ্যক তোরণ রাখতে হবে।
৩. অনিয়ন্ত্রিত কীট–নাশকের ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য বিনাশ ও প্রজনন ব্যাহত হয়।	৩. ১ক, ১খ, ও ১গ এর মত।	৩. ক. সমন্বিত কীট–নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিতে হবে। খ. কৃষিভূমির পানি নিষ্কাশন থেকে উন্মুক্ত পানিকে রক্ষা করতে হবে।
৪. কৃষিকার্য্যের জন্য জলাভূমি শুকনো করা এবং মাছ, পাখি ও উভচর প্রাণির জীবন বিনাশ।	৪. ক. মৎস্য হ্রাস। খ. বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, পাখি ও উভচর প্রাণি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। গ. জলাভূমির প্রতিবেশ বিপর্যয়।	৪. ক. জলাভূমি ও বিলকে সম্পূর্ণভাবে শুকনো না করা। খ বিপন্ন জীবনের জন্য বিকল্প সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিতেহবে।

উৎস ঃ *Local Government Engineering Bureau. : Guidelines on Environmental Issues Related to Physical Planning : Dhaka, pp 29-32.*

২.১৩ ষষ্ঠ পদক্ষেপ ঃ প্রতিবেদন প্রণয়ন

সবশেষে, প্রকল্পের সাথে জড়িত কারিগরী কর্মচারীবৃন্দ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ যাতে বুঝতে পারে, এমন সহজবোধ্য আকারে পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণ প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করতে হবে।

২.১৪ পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণ প্রতিবেদন

প্রতিবেদনটি সংক্ষিপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত ইস্যুতে সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়। বিশ্লেষণের গভীরতা ও ব্যাপকতা স্থৈতিক প্রভাবের গুরুত্ব অনুসারে বিস্তৃত হতে হবে।

৩.০ পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণের ব্যবস্থাপনা ও সাংগঠনিক বিষয়াবলী

৩.১ পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণ সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও ব্যয় প্রকল্পের ধরন, আকার, জটিলতা বা বহুমুখীতা, প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান ভৌত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক অবস্থা এবং প্রাপ্ত পরিবেশগত উপাত্তের পরিমাণ ও গুণগত মানের ওপর নির্ভরশীল। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষার মতই পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণের বিষয়টি কিছুটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। সাধারণভাবে প্রকল্পের ওপর নির্ভর করে এজন্য ৬–১৮ মাস সময়ের প্রয়োজন হয়। তবে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এক বছরই যথেষ্ট।

৩.২ অনেকে মনে করেন, পরিবশেগত প্রভাব নির্ধারণের বিষয়টি সম্পন্ন করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এ কারণে দাতা সংস্থার বিশেষ চাপ না থাকলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে প্রকল্প প্রণয়নকালে এ বিষয়টি সযত্নে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু বিশ্বব্যাংক বিশেষজ্ঞদের মতে, একাজে খুব কম ক্ষেত্রে প্রকল্পের মোট বিনিয়োগ ব্যয়ের এক শতাংশের বেশি অর্থের প্রয়োজন হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এর পরিমাণ এক শতাংশের অনেক কম থাকে। আর পরিবেশগত ঋণাত্মক প্রভাব হ্রাসকরণ পদক্ষেপের জন্য প্রয়োজন হয় ০–১০ শতাংশ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ৩–৫ শতাংশ অর্থ। অবশ্য এ বিষয়গুলো সম্পন্ন না করলে যে পরিবেশগত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে তা নিয়ন্ত্রণে আনতে অনেক ক্ষেত্রে কয়েকশ' থেকে কয়েক হাজারগুণ বেশি অর্থের প্রয়োজন হতে পারে।

৩.৩ কার্যকরী পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত আন্তঃসংস্থা সমন্বয়নের বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, নক্‌শা অনুমোদন, বাজেট প্রণয়ন, অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা নিয়োজিত থাকে। এছাড়া প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে এমন সব আর্থ–সামাজিক–সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত বিভিন্ন সংস্থা এবং সর্বোপরি প্রকল্পের বিবিধ পরিসরের ভোক্তাদেরকেও সমন্বয় কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

৩.৪ পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণের সামগ্রিক ফলপ্রসূতা নির্ভর করে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের পরিবেশগত সামর্থ শক্তিশালীকরণের ওপর। যেসকল প্রকল্পের বিশেষ স্থৈতিক প্রভাব থাকতে পারে, সেগুলোর জন্য সাধারণভাবে সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা থাকা খুবই

জরুরী এবং তা শুধুমাত্র প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে সীমিত থাকলেই হবে না। বরং সরকারের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাসমূহের মধ্যেও এর প্রসার ঘটাতে হবে।

৪.০ পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণের অসুবিধাসমূহ

১. তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর, বিশেষত বাংলাদেশের আর্থ–সামাজিক অবকাঠামোয় প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণের বিষয়টি প্রায়শই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় না।

২. প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব থাকে এবং প্রণীত নীতিমালা, কর্মসূচি, পরিকল্পনা ও প্রকল্পের স্তরিক বিন্যাস খুব সুদৃঢ় হয় না।

৩. আমাদের দেশে সমন্বিত নীতি প্রণয়নের অভাব বড় তীব্র। গৃহীত পরিকল্পনা ও প্রকল্পসমূহ প্রায়শই অত্যন্ত দুর্বল তথ্য–ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

৪. সামগ্রিকভাবে দুর্বল তথ্য–ভিত্তির কারণে একই ধরনের হলেও প্রতিটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণের প্রয়োজন হয়। ফলে সমষ্টিগতভাবে কাজের দ্বৈততার কারণে এ ক্ষেত্রে অনেক দেশের তুলনায় অধিক অর্থের প্রয়োজন হয় এবং প্রকল্পের প্রকৃত প্রভাবের পরিমাণ নির্ধারণ অনেক সময় দুরূহ হয়ে পড়ে।

৫. প্রস্তাবিত বৃহৎ প্রকল্পসমূহ প্রায়শই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে বাস্তবায়িত হয়। ফলে প্রকল্পের প্রভাব যথাযথভাবে নির্ণীত হয় না, অনেক ক্ষেত্রে হলেও স্থৈতিক প্রভাবসমূহকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা না করে বরং গোপন করে রাখা হয়। উদাহরণত কাপ্তাই জল–বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প, ফ্লাড এ্যাকশন প্লান ইত্যাদি। এভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক দ্বন্দ্ব–সংঘাত ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে চিংড়ি চাষ প্রকল্পও এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৬. প্রস্তাবিত প্রকল্পে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয় না।

৭. প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পের আশু অর্থনৈতিক ফলাফলকেই প্রাধান্য দেয়া হয়; দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। অর্থাৎ টেকসই উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় না।

৮. আমাদের দেশে প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞের অভাব খুবই প্রকট।

৯. পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনের ভিত্তি তৈরি করা হয়নি। আইন যতটুকু আছে তার যথার্থ বাস্তবায়নও সুনিশ্চিত করা হয় না।

১০. বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রকল্পের পরিবেশগত বিষয়ে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ অনুপস্থিত।

১১. আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত যথার্থভাবে ও বিস্তৃত আকারে কোন "বাধ্যতামূলক পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণ প্রকল্প তালিকা" প্রণীত হয়নি।

১২. ব্যক্তি মালিকানাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে কোন ম্যাকানিজম নেই।

১৩. কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারিত হলেও উপশম পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং পরিবীক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশোধনী আনা ইত্যাদি কার্যক্রম যথার্থভাবে প্রতিপালিত হয় না।

১৪. সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষ কারিগরী জনবলের অভাব রয়েছে এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সুবিধা অত্যন্ত অপ্রতুল ও অবিন্যস্ত।

১৫. প্রযুক্তিগত পশ্চাৎমুখীনতা, সাংগঠনিক দুর্বলতা, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনগণের সচেতনতার অভাব, উন্নয়ন সিদ্ধান্তে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আইনগত কর্তৃত্বের অভাব, প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আর্থিক সংস্থানের অভাব ইত্যাদি কারণে প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণের বিষয়টি নিশ্চিত হয় না।

৫.০ উপসংহার

পরিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবশগত প্রভাব নির্ধারণ নিশ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে জবাবদিহি অত্যাবশ্যক। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারিত না হলে এবং তার উপশম পরিকল্পনা যথার্থভাবে বাস্তবায়িত না হলে, উন্নয়ন হবে ধ্বংসমুখী এং উন্নয়নের টেকসই ধারা অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। এ কারণে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে চিহ্নিত অসুবিধাসমূহ দূর করে উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণ নিশ্চিত করা একান্ত জরুরী। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াসও এক্ষেত্রে একটি অবসম্ভাবী প্রেসার-গ্রুপ সৃষ্টি করতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. Abdel, N. and M. Stocking : The Environmental Assessment Experience of Underdeveloped Countries; *Project Appraisal and Policy Review,* UK, John Wiley and Sons, 1981.

২. ADB. : *Economic Analysis of the Environment Impact of Development Projects,* 1986.

৩. ADB. : *Environmental Guidelines for Selected Argicultural and Natural Resources Development Projects,* 1987.

৪. ADB. : *Environmental Guidelines for Selected Industrial and Power Development Projects,* 1988.

৫. ADB. : *Guidelines for Integrated Regional Economic-cum-Environmental Development Planning,* Vol I; Guidelines & Vol. II: Case Studies, 1988.

৬. Andrews, R. N. L. and Others. : *Substantive Guidanc for Environmental Impact Assessment: An Exploratory Study,* Indianopolis, Indiana, Butler University, Holcomb Research Institute and the Institute of Ecology, 1977.

৭. Becker, H. A. and A. L. Porter eds, : *Methods and xperiences in Impact Assessment;* Atlanta, Georgia: International Association for Impact Assessment, 1986.

৮. Bisset, R. : Methods for Environmental Impact Analysis: Recent Trends and Future Prospects; *Journal of Environmental Management,* Vol. 11, 1980, pp. 27-43.

৯. Carley, M. J. and E. O. Derow. : *Social Impact Assessment : A Cross-Disciplinary Guide to the Literature;* Boulder, Colorado, Westview Press, 1983.

১০. Centre for International Development and Environment. : *Bangladesh Environment and Natural Resources Assessment :* World Resource Institute, Washington D. C., 1990.

১১. Conway, G. : *Agroecosystem Analysis for Research and Development;* Bangkok, Thailand, Winrock International Institute for Agricultural Development, 1986.

১২. Derman, W. and S. Whiteford. : *Social Impact Analysis and Development Planning in the Third World;* Boulder, Colorado, Westview Press, 1985.

১৩. Economic Commission for Europe. : Post-Project Analysis for Environmental Impact Analysis; New York, USA, 1990.

১৪. ESCAP. : *Environmental Impact Assessment : Guiddelines for Planners and Decision Makers;* June, 1987.

১৫. ESCAP. : *Coastal Environmental Management Plan for Bangladesh;* Vol. 1 and Vol. II, 1986.

১৬. ESCAP. : *Environmental Impact Assessment : guidelines for Water Resources Development,* 1990.

১৭. ESCAP. : *Environmental Impact Assessment : Guidelines for Agricultural Development,* 1990.

১৮. ESCAP : *Environmental Impact Assessment : Guidelines for Transport Development,* 1990.

১৯. ESCAP. : *Environmental Impact Assessment : Guidelines for Industrial Development,* 1990.

২০. Goodland, Robert and Valeriee Edmundson. ed. : *Environmental Assessment and Development;* The World Bank, Washington D. C., 1994.

২১. Gough, J. D. : *Strategic Approach to the Use of Environmental Impact Assessment and Risk Assessment within the Decision-Making Process;* Centre for Resource Management Paper 13, New Zealand : University of Canterbury and Lincoln College, 1989.

২২. Government of the People's Republic of Bangladesh. : *The National Conservation Strategy of Bangladesh;* MOEF and International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, 1991.

২৩. International Commission for Environmental Assessment. : *Final Report of the Working Group on an International Commission for Environmental Assessment;* Utrecht, The Netherlands 1990.

২৪. Lee, N. : *Environmental Impact Assessment : A Training Guideline;* Department of Town and Country Planning paper 18, Manchester, UK, University of Manchester, 1987.

২৫. Local Government Engineering Bureau, Ministry of L. G. R. D. and Cooperatives : *Manual on Land and Water Development Planning;* 1991.

২৬. Lohini, B. N. and Others. : *Handbook of Environmental Impact Assessment in Developing Countries,* 1997.

২৭. Ross, W. A. : Evaluating Environmental Impct Statement; *Journal of Environmental Management,* 24(2), 1987, pp. 137-148.

২৮. Siddique, Q. I. : *Environmental Impact of Rural Infrastructure Development;* Presented at the National Seminar on Technology and Development, IEB, Chittagong, 1991.

২৯. Tharun, G. and Others. : *Environmental Management for Developing Countries;* Vol. I, Vol. II, Vol. III, Asian Institutee of Technology, Bangkok, Thailand, 1991.

৩০. the World Bank. : *Environmental Assessment Sourcebook, Vol, I,* Washington D. C, 1991.

৩১. The World Bank.: *Environmental Assessment Sourcebook, vol, II,* Washington D. C. 1991.

৩২. The World Bank. : *Environmental Assessment Sourcebook, Vol III,* Washington D. C. 1991.

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
৭ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, আশ্বিন ১৪০৩

আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সমস্যা ও গৃহীতব্য পদক্ষেপ

মোঃ শফিকুল হক*

এ কে এম খায়রুল ইসলাম**

১.০ ভূমিকা ও গবেষণা পদ্ধতি

১.১ এদেশে কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের বিষয়টি সর্বপ্রথম গুরুত্ব পায় ১৯৬৩ সালে, যখন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ওএন্ডএম উইং কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স সংগঠিত করে। ১৯৬৬ সালে স্টাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এসটিআই) প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সচিবালয়ে এর কাজ শুরু হয়। ১৯৮০ সালে খুলনা, রাজশাহী এবং চট্টগ্রামে এসটিআই এর আরও তিনটি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এর পূর্বে সচিবালয় ভিত্তিক এসটিআই কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে দায়বদ্ধ ছিল। ১৯৮১ সালে সরকার "Pre-investment Study for a Public Administration Training and Management Improvement Project" নামে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে এবং আইডি–এর সহায়তায় কর্মচারী প্রশিক্ষণসহ সকল ধরনের লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৮২ সালে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস নামে একটি সামরিক আইন কমিটি এসটিআই–এর কাঠামো পরীক্ষা–নিরীক্ষা করে এটিকে লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাথে একত্রিকরণ করার পরামর্শ দেয়। লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সাথে এসটিআইকে একত্রিকরণের পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয় যে, সমন্বিত লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বিচ্ছিন্ন উপাদানের চেয়ে অধিক ফলপ্রসূ হবে। বাংলাদেশ লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৪ সালে এবং এসটিআইকে 'আঞ্চলিক লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আরপিএটিসি)' হিসেবে নতুন নামকরণ করা হয়।

১.২ ১৯৯৪–৯৫ প্রশিক্ষণ-বর্ষে আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহে ১৩৬টি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে ৮০০ জন কর্মকর্তা ও ৪২১০ জন কর্মচারীসহ মোট ৫০২০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার

---

* গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

** কেন্দ্রের প্রাক্তন গবেষণা কর্মকর্তা, বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত আছেন।

লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে (প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জী ঃ ১৯৯৪–৯৫, মুখবন্ধ)। গত ১৯৯৩–৯৪ প্রশিক্ষণ-বর্ষে আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহে ১৬৮টি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে মোট ৫৬০০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে সে সময়ে ৩৫৪০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যার ভিত্তিতে অর্জিত লক্ষ্যমাত্রার শতকরা হার ৬৩.২১ (সারণি-১)। কেন্দ্রভিত্তিক প্রশিক্ষণের অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, সে সময় ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা কেন্দ্রে অর্জিত লক্ষ্যমাত্রার শতকরা হার যথাক্রমে ৭৬.৪১, ৬৫.১৬, ৭১.৯১ ও ৬৫.৭১ (সারণি-১)। আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহ প্রতিষ্ঠার পর ১৯৮৪–৮৫ প্রশিক্ষণ-বর্ষ থেকে ১৯৯৩–৯৪ প্রশিক্ষণ-বর্ষ পর্যন্ত গত এক দশকে প্রশিক্ষণের অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে সর্বোচ্চ শতকরা ৮৭.৭৪ ভাগ (১৯৯০–৯১) সর্বনিম্ন শতকরা ৫৪.৩০ ভাগ (১৯৮৬–৮৭) (সারণি-২)।

১.৩ আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের এই লক্ষ্য অর্জন যথাযথ মাত্রায় নয় বলে বাংলাদেশ লোক- প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ মনে করছেন। কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করে আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও কার্যকর করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। উল্লিখিত বাস্তবতার আলোকে সমিক্ষাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য

১.৪.১ আঞ্চলিক লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার কারণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ;

১.৪.২ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সম্ভাব্য গৃহীতব্য পদক্ষেপ সম্পর্কে সুপারিশমালা প্রণয়ন।

১.৫ গবেষণার পরিধি

বর্তমান গবেষণায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হয়েছে ঃ

১.৫.১ আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহে এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অগ্রগতি;

১.৫.২ জুলাই–সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ মাসে আঞ্চলিক লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ৮টি কোর্সের ধার্যকৃত ও অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা অনুসন্ধান;

১.৫.৩ উপর্যুক্ত ৮টি কোর্সের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ কোর্সসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং ব্যর্থতার কারণসমূহ অনুসন্ধান।

১.৬ গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান সমীক্ষায় নিম্নলিখিত উৎসসমূহ হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ঃ

১.৬.১ *প্রাথমিক উৎস ঃ*

(ক) সাক্ষাৎকার ঃ আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা, অতিথি বক্তা, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপ–সচিব (সংস্থাপন মন্ত্রণালয়) সহ ২৪ (চব্বিশ) জন কর্মকর্তার নিকট থেকে অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া আঞ্চলিক কেন্দ্রের বিভিন্ন কর্মচারী ও চলমান কোর্সের অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

(খ) গবেষকদ্বয় চারটি আঞ্চলিক কেন্দ্রে অবস্থান করে পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট সমস্যাসমূহ অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন।

১.৬.২ *মাধ্যমিক উৎসঃ*

(ক) বাংলাদেশ লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত আঞ্চলিক কেন্দ্র সম্পর্কিত গবেষণা প্রতিবেদনসমূহ।

(খ)বাংলাদেশ লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আঞ্চলিক কেন্দ্র সমূহ প্রেরিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের মূল্যায়ন প্রতিবেদন।

১.৭ সীমাবদ্ধতা

প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীগণ হচ্ছেন প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রধান উপাদান। আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহে যেসব কোর্সের লক্ষ্যমাত্রা অংশগ্রহণের দিক থেকে অর্জিত হয়নি তা জানার জন্য মনোনীত যেসব অংশগ্রহণকারী সংশ্লিষ্ট কোর্সে অংশ নেননি, তাঁদের কাছ থেকে তাঁরা কেন আসেননি, সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সংগ্রহ করা যেত। কিন্তু মনোনীত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থান করছেন। তাঁদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যথেষ্ট সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। বর্তমান গবেষণায় দীর্ঘ সময় ও প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকায় সংশ্লিষ্ট মনোনীত অংশগ্রহণকারীগণের (যাঁরা কোর্সে যোগ দেননি) কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

২.০ প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ

২.১ গত এক দশকে আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষণের অগ্রগতি

২.১.১ গত এক দশকে অর্থাৎ ১৯৮৪–৮৫ প্রশিক্ষণ-বর্ষ হতে ১৯৯৩–৯৪ প্রশিক্ষণ-বর্ষ পর্যন্ত আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহ ১৪২০টি বিভিন্ন কোর্সে ৩২,৪৬৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীর লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনায় (৪৪,৬৫০ জন) অর্জিত সাফল্য ৭২,২০%। আবার ১৯৯০–৯১ প্রশিক্ষণ-বর্ষে আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহে ১৬৯টি বিভিন্ন কোর্সে ৪,৫১০ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। লক্ষ্যমাত্রার বিবেচনায় (৫,১৪০ জন), অর্জিত সাফল্যের হার ৮৭.৭৪% যা এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ (সারণি–১)। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সর্বনিম্ন হার হচ্ছে ৫৪.৩০%। ১৯৮৬–৮৭ প্রশিক্ষণ-বর্ষে ১৩৭টি বিভিন্ন কোর্সে ২,৬৫০ জনকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই সর্বনিম্ন হার অর্জিত হয়েছে।

২.১.২ কেন্দ্রভিত্তিক প্রশিক্ষণ বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, এ পর্যন্ত ঢাকা আঞ্চলিক কেন্দ্র সর্বোচ্চ ৩৫৮টি বিভিন্ন কোর্সের মাধ্যমে ৮,৮৬০ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এক্ষেত্রে অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা ৭৬.৪১%। খুলনা আঞ্চলিক কেন্দ্র সর্বনিম্ন ৩৩৩টি কোর্সে ৬৫.৭১% লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। খুলনার চেয়ে দুটি কোর্স বেশি অর্থাৎ ৩৩৫টি কোর্সের মাধ্যমে চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কেন্দ্রের লক্ষ্যমাত্রা সর্বনিম্ন ৬৫.১৬%। রাজশাহী আঞ্চলিক কেন্দ্র ৩৩৪টি কোর্সের মাধ্যমে ৭১.৯১% লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। গত দশ বছরের কেন্দ্রভিত্তিক প্রশিক্ষণের বিবেচনায় চট্টগ্রাম ও খুলনা আঞ্চলিক কেন্দ্রের সাফল্য তুলনামূলকভাবে কম (সারণি-১)।

২.২ ১৯৯৩–৯৪ প্রশিক্ষণ–বর্ষ ও জুলাই–সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ মাসে অনুষ্ঠিত কোর্সসমূহের তুলনামূলক চিত্র

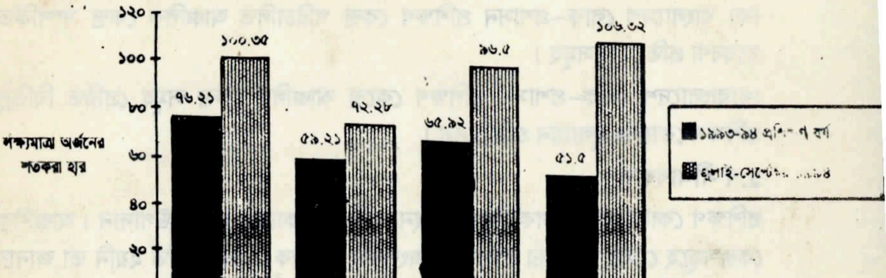

২.২.১ ১৯৯৩–৯৪ প্রশিক্ষণ-বর্ষে আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহ বিভিন্ন ধরনের ১৬৮টি কোর্সে সর্বমোট ৩,৫৪০ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রার বিবেচনায় (৫,৬০০ জন), অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা ৬১.২১%। উল্লিখিত প্রশিক্ষণ-বর্ষে ঢাকা আঞ্চলিক কেন্দ্র সর্বোচ্চ ৭৬.২১% লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। অন্যদিকে খুলনা আঞ্চলিক কেন্দ্র সর্বনিম্ন ৫১.৫০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। চট্টগ্রাম ও রাজশাহী আঞ্চলিক কেন্দ্রের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার যথাক্রমে ৫৯.২১% ও ৬৫.৯২% (সারণি-২)।

২.২.২ জুলাই–সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ মাসে আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহে বিভিন্ন ধরনের ৮টি কোর্স হিসাবে মোট ৩২টি কোর্সে ১০৭০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রার বিবেচনায় (১১৪০ জন), সাফল্য ৯৩.৮৬%। কেন্দ্রভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিবেচনায় খুলনা আঞ্চলিক কেন্দ্র সর্বোচ্চ ১০৬.৩২% সাফল্য অর্জন করেছে। অন্যদিকে চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কেন্দ্রের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার সর্বনিম্ন ৭২.২৮%। ঢাকা ও রাজশাহী আঞ্চলিক কেন্দ্রের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার যথাক্রমে ১০০.৩৫% ও ৯৬.৫% (সারণি-২)।

২.২.৩ ১৯৯৩–৯৪ প্রশিক্ষণ বর্ষ ও জুলাই–সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ মাসে অনুষ্ঠিত কোর্সসমূহের অর্জিত লক্ষ্যমাত্রার দিকে তাকালে দেখা যায় যে, সামগ্রিকভাবে এবং কেন্দ্রভিত্তিক উভয় ক্ষেত্রেই আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের সাফল্যের হার তাৎপর্যপূর্ণভাবে

বেড়েছে। ১৯৯৩–৯৪ প্রশিক্ষণ বর্ষে খুলনা আঞ্চলিক কেন্দ্রের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার যেখানে ছিল সর্বনিম্ন ৫১.৫% তা জুলাই–সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪–এই তিন মাসে বেড়ে দাঁড়িয়েছে সর্বোচ্চ ১০৬.৩২%। ঢাকা আঞ্চলিক কেন্দ্রও এক্ষেত্রে শতকরা ১০০ ভাগের বেশি সাফল্য অর্জন করেছে। চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কেন্দ্রের সাফল্য বৃদ্ধির মাত্রা এ ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে অনেক কম অর্থাৎ ৫৯.২১% থেকে ৭২.২৮% (সারণি–২)।

২.৩ ১৯৯৩–৯৪ প্রশিক্ষণ বর্ষ ও জুলাই–সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ মাসে অনুষ্ঠিত ৮টি নির্বাচিত কোর্সের তুলনামূলক চিত্র

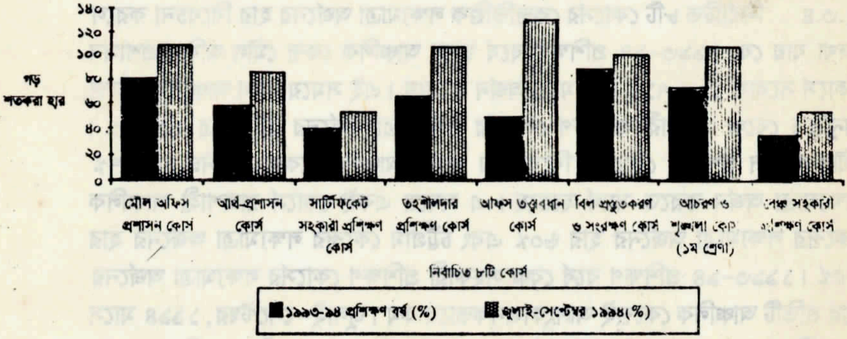

২.৩.১ উপর্যুক্ত বিষয়ের আওতায় নিম্নলিখিত ৮টি কোর্সকে বিবেচনা করা হয়েছে ঃ

(১) মৌল অফিস প্রশাসন কোর্স

(২) আর্থ–প্রশাসন কোর্স

(৩) সার্টিফিকেট সহকারী প্রশিক্ষণ কোর্স

(৪) তহশীলদার প্রশিক্ষণ কোর্স

(৫) অফিস তত্ত্বাবধান কোর্স

(৬) বিল প্রস্তুতকরণ ও সংরক্ষণ কোর্স

(৭) আচরণ ও শৃঙ্খলা কোর্স (১ম শ্রেণী)

(৮) বেঞ্চ সহকারী প্রশিক্ষণ কোর্স

উল্লেখিত কোর্সসমূহের মধ্যে ৭নং কোর্স ব্যতিত বাকী ৭টি কোর্সই তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য পরিচালিত হয়েছে।

২.৩.২ ১৯৯৩–৯৪ প্রশিক্ষণ বর্ষে অনুষ্ঠিত নির্বাচিত ৮টি কোর্সের মধ্যে বিল প্রস্তুতকরণ ও সংরক্ষণ কোর্স সর্বোচ্চ ৮৮.১৩% লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। এই সময়ে বেঞ্চ সহকারী কোর্স সামগ্রিকভাবে সর্বনিম্ন ৩৬.৪৩% লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। সার্টিফিকেট সহকারী প্রশিক্ষণ কোর্সের ক্ষেত্রেও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার উল্লেখযোগ্য কম অর্থাৎ ৪১.৪৩% (সারণি–৩)।

২.৩.৩ জুলাই–সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪– এই তিন মাসে নির্বাচিত ৮টি কোর্সের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহ তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য দেখিয়েছে। এই সময়ে বেঞ্চ সহকারী প্রশিক্ষণ কোর্স ও আর্থ–প্রশাসন কোর্স ছাড়া বাকী ৫টি কোর্সই শতকরা ১০০ ভাগ ও তারও বেশি সাফল্য অর্জন করেছে। অফিস তত্ত্বাবধান কোর্স এ সময়ে সর্বোচ্চ ১৩১.৪৩% সাফল্য অর্জন করেছে। বেঞ্চ সহকারী প্রশিক্ষণ কোর্স সর্বনিম্ন ৫৩.৫৭% লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। সার্টিফিকেট সহকারী কোর্সের অবস্থা এর কাছাকাছি অর্থাৎ ৫৪.২৯% (সারণি–৩)।

২.৩.৪ নির্বাচিত ৮টি কোর্সের কেন্দ্রভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, ১৯৯৩–৯৪ প্রশিক্ষণ বর্ষে ঢাকা আঞ্চলিক কেন্দ্র মৌল অফিস প্রশাসন কোর্সে সর্বোচ্চ ১৩০.৭১% লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। এই সময়ে ঢাকা আঞ্চলিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত বেঞ্চে সহকারী প্রশিক্ষণ কোর্সের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার মাত্র ২৫.৭১%। মৌল অফিস প্রশাসন কোর্সের বিবেচনায় খুলনা আঞ্চলিক কেন্দ্র সর্বনিম্ন ৪৮.৫৭% লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। এ সময়ে একই কোর্সে রাজশাহী আঞ্চলিক কেন্দ্রের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৬০% এবং চট্টগ্রাম কেন্দ্রের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৮৫%। ১৯৯৩–৯৪ প্রশিক্ষণ বর্ষে বেঞ্চ সহকারী প্রশিক্ষণ কোর্সের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার প্রতিটি আঞ্চলিক কেন্দ্রেই আশংকাজনকভাবে কম। জুলাই–সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ মাসে কোর্সটির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ঢাকা ছাড়া অন্য সব কয়টি আঞ্চলিক কেন্দ্রে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ঢাকা আঞ্চলিক কেন্দ্রে এ সময় এ কোর্সটির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ২৫.৭১% থেকে কমে ১৪.২৯% এ দাঁড়িয়েছে। সামগ্রিকভাবে এবং কেন্দ্রভিত্তিক উভয় ক্ষেত্রেই নির্বাচিত ৮টি কোর্সের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ১৯৯৩–৯৪ প্রশিক্ষণ বর্ষের তুলনায় জুলাই–সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ মাসে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেড়েছে (সারণি–৩)।

২.৪ অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ ও নথি–পত্রাদি পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ

২.৪.১ ঢাকা আঞ্চলিক কেন্দ্র ঃ

(১) একজন নিয়মিত উপ–পরিচালকের অভাব প্রধান সমস্যা। আঞ্চলিক কেন্দ্রটিতে উপ–পরিচালকের জন্য প্রয়োজনীয় আবাসন সুবিধা নেই।

(২) পূর্বে বিশ্বব্যাংকের প্রকল্পের আওতাধীন থাকাকালীন প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণ ভাতার ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে প্রশিক্ষণ ভাতার কোন ব্যবস্থা নেই।

(৩) অতিথি বক্তাদের ঘন্টা প্রতি ১০০ টাকা সম্মানী খুবই কম। এ কারণে ভাল অতিথি বক্তা আঞ্চলিক কেন্দ্রে আসতে অনীহা প্রকাশ করেন। অতিথি বক্তার সম্মানী বাড়ানোর ব্যাপারে কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের কোন আগ্রহ নেই বলে জানা যায়।

(৪) গাড়ীর অভাবে আঞ্চলিক কেন্দ্রের অতিথি বক্তাদের যানবাহন সুবিধা দেয়া যায় না। প্রায়শই তারা রিকসায় চড়ে আসেন যা তাদের পদমর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং এটি একই সাথে ঝুঁকিপূর্ণ।

(৫) ডরমিটরীতে আবাসন সুবিধা খুবই অপ্রতুল। ২০ জনের জন্য মাত্র একটি টয়লেট। একই সঙ্গে একাধিক কোর্স অনুষ্ঠিত হলে কোর্স ব্যবস্থাপনায় ঝামেলার সৃষ্টি হয় এবং সবাইকে আবাসন সুবিধা দেওয়া যায় না।

(৬) গ্রন্থাগারে মূল্যবান বই থাকলেও তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর জন্য আয়োজিত কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের উপযোগী বই এর সংখ্যা খুবই কম।

(৭) বিপিএটিসিতে অধিক সংখ্যক কর্মকর্তা থাকায় তাদের উপর কোর্স ব্যবস্থাপনার চাপ তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু আঞ্চলিক কেন্দ্রের ৩ জন কর্মকর্তার মাথাপিছু কোর্স ব্যবস্থাপনার চাপ সে তুলনায় অনেক বেশি। ঢাকা আঞ্চলিক কেন্দ্রে যোগ্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অভাব রয়েছে। বিপিএটিসির যেসব কর্মকর্তা/কর্মচারী দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখতে সমর্থ নন, তাঁদেরকেই আঞ্চলিক কেন্দ্রে পাঠান হয়। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যাল্পতার কারণে এই ত্রুটি সহজেই চোখে পড়ে।

(৮) আঞ্চলিক কেন্দ্রের প্রশাসনিক ভবনটির প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ নেই। প্রশিক্ষণ ভবন থেকে দূরত্বের জন্য ও কর্মকর্তাদের সংখ্যাল্পতার কারণে কোর্স সমন্বয় বাধাগ্রস্ত হয়। ক্ষেত্র বিশেষে উচ্চ পদমর্যাদার অতিথি বক্তাদের অভ্যর্থনা জানানো সম্ভব হয় না।

(৯) প্রশিক্ষণ ভবনটি অপরিচ্ছন্ন। পর্যাপ্তভাবে ব্যবহার হচ্ছে না।

২.৪.২ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কেন্দ্র

(১) প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ ভাতা নেই। যার কারণে প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণে আসতে আগ্রহবোধ করে না।

(২) বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ সংকুলান না থাকায় আবশ্যকীয় প্রশিক্ষণ-সামগ্রী সরবরাহ করা সম্ভবপর হয় না।

(৩) গ্রন্থাগারে ক্যাটালগার নেই। প্রচুর দামী বই থাকলেও কোর্সের উপযোগী বই–এর সংখ্যা খুবই কম।

(৪) ডরমিটরীর আবাসন সুবিধা নিয়ে প্রথম শ্রেণীর অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ সন্তষ্ট নন।

(৫) প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য চিত্তবিনোদনের সুবিধাদি খুবই অপ্রতুল।

(৬) বিপিএটিসির সংগে চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কেন্দ্রের যোগাযোগ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নয়।

(৭) চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কেন্দ্রের তিনজন কর্মকর্তাই মহিলা। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সংগে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এটি একটি অন্যতম প্রতিবন্ধক।

(৮) কর্মকর্তাদের আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের উপযোগী নয়। চট্টগ্রামে অবস্থানগত সুবিধা বিবেচনা করেই কর্মকর্তাগণ আঞ্চলিক কেন্দ্রের নিয়োগ পছন্দ করেছেন। প্রশিক্ষণের প্রতি আগ্রহের পরিবর্তে চট্টগ্রামে অবস্থানই অগ্রাধিকার পাচ্ছে।

(৯) কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয়ভাবে প্রশিক্ষিত নন।

(১০) আঞ্চলিক কেন্দ্রের সাথে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগের ক্ষেত্রে দূরত্ব রয়েছে, যা প্রয়োজনীয় সংখ্যক মনোনয়ন ও অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করে।

(১১) মিনিবাস ছাড়া অন্য কোন কার/মাইক্রোবাস না থাকায় অতিথি বক্তা এবং কর্মকর্তারা প্রয়োজনীয় পরিবহন সুবিধা পান না।

(১২) অতিথি বক্তাদের বক্তব্য অনুযায়ী তাঁদেরকে (অতিথি বক্তাদেরকে) স্বাগত জানানোর জন্য সকাল বেলা কোন কর্মকর্তাকে প্রায়শ পাওয়া যায় না।

(১৩) আঞ্চলিক কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের ঐচ্ছিক ছুটির বিষয়টি বিপিএটিসির নিয়ন্ত্রণে থাকায় কর্মচারী প্রশাসনে অসুবিধা হচ্ছে।

(১৪)চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কেন্দ্রে বিকেল থেকেই অনভিপ্রেত লোকজনের সমাগম (আড্ডা) ঘটে। এদের মধ্যে কেউ কেউ নেশাগ্রস্ত। বয়সে তরুণ এসব লোকজন আঞ্চলিক কেন্দ্রে গোসল করতে আসে। বলপূর্বক কেন্দ্রের টেলিভিশন কক্ষটি ব্যবহার করে। আঞ্চলিক কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত গার্ড প্রতিবাদ করতে যেয়ে লাঞ্ছিত হয়েছে বলে জানা যায়। উপ–পরিচালক মহোদয়ের পক্ষেও এর সুরাহা করা সম্ভব নয়।

(১৫) ক্যাটালগার, প্রশিক্ষণ সহকারী, হিসাবরক্ষক, ষ্টেনো–টাইপিষ্ট ও এম এল এস এস–এর ১টি করে পদ শূন্য রয়েছে।

২.৪.৩ রাজশাহী আঞ্চলিক কেন্দ্র

(১) প্রশিক্ষণ ভাতার অভাবে অনেকেই প্রশিক্ষণে আসতে আগ্রহী হয় না। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে একজন প্রশিক্ষণার্থীকে একই সাথে তার নিজের এবং পরিবারের ব্যয় আলাদাভাবে বহন করতে হয়, যা তার আর্থিক সংগতির বাইরে। তাছাড়া নিজ দপ্তরে টিএ, ডিএ'র জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল থাকে না বা সময়মত পাওয়া যায় না, যা তাদেরকে প্রশিক্ষণে আসতে নিরুৎসাহিত করে।

(২) প্রশিক্ষণের সাথে কর্মজীবন উন্নয়নের সম্পর্ক না থাকায় প্রশিক্ষণার্থীরা একে গুরুত্ব দেয় না। ফলে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের অনীহা লক্ষ্য করা যায়।

(৩) দাপ্তরিক কর্তৃপক্ষ অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করে তহসিলদার, সার্টিফিকেট সহকারী, বেঞ্চ ক্লার্কদের প্রশিক্ষণে অংশ নিতে অনুমতি দেয় না। যা উল্লিখিত ৩টি কোর্সের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে ব্যাহত করে।

(৪) প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ডরমিটরীতে আবাসন সুবিধা খুবই অপ্রতুল। একই সময়ে দুই বা ততোধিক কোর্স অনুষ্ঠিত হলে আবাসনের ক্ষেত্রে মারাত্মক অসুবিধা দেখা দেয়।

(৫) প্রশিক্ষণার্থীদের বিনোদনের জন্য খেলাধূলার কোন ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া রাজশাহী

আঞ্চলিক কেন্দ্রের আয়তন কম, যা একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য কাম্য নয়।

(৬) ড্রাইভারের পদ শূন্য থাকায় রাজশাহী আঞ্চলিক কেন্দ্রের গাড়ীটি দেড় বছর যাবত অব্যবহৃত অবস্থায় অকেজো হয়ে পড়ে আছে। যে কারণে শিক্ষা–সফর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে আছে।

(৭) গ্রন্থাগারে মূল্যবান প্রচুর বই থাকলেও এগুলোর অধিকাংশই প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য উপযোগী নয়।

(৮) আঞ্চলিক কেন্দ্রের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে বিপিএটিসি'র ভূমিকা পরিকল্পিত নয়। প্রশিক্ষণযোগ্য কর্মচারীদের মোট সংখ্যার সংগে সংগতিপূর্ণ কোন দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা নেই।

(৯) অতিথি বক্তাদের সম্মানীর পরিমাণ খুবই কম। যা তাঁদেরকে আঞ্চলিক কেন্দ্রে আসতে উৎসাহিত করে না।

(১০) আঞ্চলিক কেন্দ্রের প্রতি বিপিএটিসি'র দৃষ্টিভঙ্গী কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় অনুকূল নয়। আঞ্চলিক কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের জন্য বৈদেশিক প্রশিক্ষণের কোন সুযোগ নেই বললেই চলে।

২.৪.৪ খুলনা আঞ্চলিক কেন্দ্র

(১) নিকট অতীতে দায়িত্ব পালনকারী উপ–পরিচালকের অনীহা খুলনা আঞ্চলিক কেন্দ্রের প্রশিক্ষণের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে দারুণভাবে ব্যাহত করেছে বলে জানা যায়। বর্তমানে আঞ্চলিক কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের মধ্যে আন্তব্যক্তিক সম্পর্ক কাঙ্খিত মাত্রায় ইতিবাচক নয়।

(২) অতিথি বক্তাদের সম্মানী কম। তাছাড়া অতিথি বক্তার সাথে বিপিএটিসি'র সম্পর্ক আন্তরিক নয় বলে জানা গেছে।

(৩) প্রশিক্ষণ ভাতার কোন ব্যবস্থা নেই। প্রশিক্ষণে আগত গরীব কর্মচারীদের পক্ষে একাধারে নিজের ও পরিবারের ব্যয় বহন করা সম্ভব হয় না।

(৪) প্রশিক্ষণে শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা নেই। খেলাধুলা এবং চিত্ত বিনোদনের সুযোগ নেই। খেলাধুলার জন্য আঞ্চলিক কেন্দ্রের অব্যবহৃত জমি ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৫) প্রশিক্ষণের সাথে কর্মজীবন এবং বদলির কোন সম্পর্ক নেই। ক্ষেত্র বিশেষে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ যাঁদেরকে পছন্দ করেন, তাঁদেরকেই প্রশিক্ষণে পাঠান।

(৬) আঞ্চলিক কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের জন্য বৈদেশিক প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রায় অনুপস্থিত।

(৭) গ্রন্থাগারে কোন ক্যাটালগার না থাকায় প্রশিক্ষণার্থীরা গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারেন না।

(৮) মিনিবাসটি অধিকাংশ সময় অচল থাকার কারণে প্রশিক্ষণ কাজে ও শিক্ষা সফরে এটি ব্যবহার করা যায় না।

(৯) খুলনা আঞ্চলিক কেন্দ্রে পানি সরবরাহ খুবই সংকটময়। বর্তমানে যে পাম্পটি

রয়েছে সেটি চাহিদার তুলনায় প্রয়োজনীয় পানি উঠাতে সক্ষম নয়। একটি পাম্প সরবরাহের ক্ষেত্রে বিপিএটিসি'র দীর্ঘসূত্রিতা প্রশিক্ষাণার্থীদের অসুবিধায় ফেলেছে।

(১০) উপ–পরিচালকের বাড়ী বসবাসের অযোগ্য। কর্মকর্তাদের আবাসন ব্যবস্থা আঞ্চলিক কেন্দ্রের বাইরে এবং এতে কোন সীমানা প্রাচীর নেই।

(১১) ডরমিটরীর দরজা, জানালা লক্ষ্যণীয়ভাবে ত্রুটিপূর্ণ। অধিকাংশ দরজা জানালা ভাঙ্গা।

(১২) পদোন্নতির ব্যাপারে আঞ্চলিক কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের মধ্যে লক্ষ্যণীয় হতাশা বিরাজমান, যা প্রশিক্ষণকে ফলপ্রসূ করার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক।

২.৫ অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশ

২.৫.১ আঞ্চলিক কেন্দ্রের কর্মকর্তা/কর্মচারী, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, উপ–সচিব, অতিথি বক্তা এবং অংশগ্রহণকারীদের সাথে অনানুষ্ঠানিক আলোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(১) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য কর্মচারীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা প্রয়োজন।

(২) আঞ্চলিক কেন্দ্রের প্রশিক্ষণকে ফলপ্রসূ করার জন্য নেতা হিসাবে উপ–পরিচালকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আঞ্চলিক কেন্দ্রে উপ–পরিচালক হিসেবে যিনি নিযুক্ত হবেন, প্রশিক্ষণের প্রতি তার যাতে প্রয়োজনীয় আগ্রহ থাকে সে বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার।

(৩) প্রশিক্ষণকে আকর্ষণীয় করার জন্য শিক্ষা সফর, খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

(৪) গ্রন্থাগার প্রশিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণের উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণ বই যাতে থাকে এবং গ্রন্থাগারটি যাতে নিয়মিত ব্যবহার করা যায়, সে ব্যবস্থা থাকা দরকার।

(৫) প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থীর মনোনয়ন লাভের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানমূহের সাথে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিয়মিত যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন।

(৬) প্রশিক্ষণকে কর্মজীবন উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা দরকার।

(৭) অতিথি বক্তাদের সম্মানী বাড়ানোর মাধ্যমে যোগ্য অতিথি বক্তাদের আকৃষ্ট করা যেতে পারে।

(৮) যেহেতু আঞ্চলিক কেন্দ্রে কর্মকর্তার সংখ্যা কম সেজন্যই অধিক দক্ষ ও আগ্রহী কর্মকর্তাদের আঞ্চলিক কেন্দ্রে নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন।

(৯) দেশীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে আঞ্চলিক কেন্দ্রে কর্মরত কর্মকর্তাদের হতাশা দূর করে তাদের কর্মদক্ষতা বাড়ানো যেতে পারে।

৩.০ ফলাফল ও সুপারিশ

৩.১ গবেষণায় নিম্নলিখিত ফলাফলসমূহ চিহ্নিত করা যায় ঃ

(১) আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৯৩–৯৪ প্রশিক্ষণ-বর্ষ পর্যন্ত সময়ে আঞ্চলিক কেন্দ্রের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের যে হার ছিল, তা ১৯৯৪–৯৫ প্রশিক্ষণ বর্ষের প্রথম তিন মাসে তাৎপর্যপূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এবং পরিবর্তন ইতিবাচক (সারণি–১ ও ২) ।

(২) ১৯৯৩–৯৪ প্রশিক্ষণ-বর্ষের তুলনায় বর্তমান প্রশিক্ষণ-বর্ষে অনুষ্ঠিত কোর্সসমূহের প্রথম তিন মাসে (জুলাই–সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের এই তাৎপর্যপূর্ণ বৃদ্ধির পেছনে আঞ্চলিক কেন্দ্রের উপ–পরিচালকগণ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। তবে এক্ষেত্রে চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কেন্দ্রের সাফল্যের হার তুলনামূলকভাবে বেশ কম (সারণি–২)। বর্তমান প্রশিক্ষণ বর্ষের শুরুতে চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কেন্দ্রে নতুন উপ–পরিচালক যোগদান করায় তাঁর পক্ষে সবকিছু বুঝে ওঠা এখনও সম্ভবপর হয়নি। তবে বর্তমান উপ–পরিচালককে প্রশিক্ষণের ব্যাপারে আগ্রহী বলে মনে হয়েছে।

(৩) ১৯৯৩–৯৪ প্রশিক্ষণ-বর্ষ ও বর্তমান প্রশিক্ষণ-বর্ষের প্রথম তিন মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচিত ৮টি কোর্সের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার গত বছরের তুলনায় সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণি–৩)। নির্বাচিত ৮টি কোর্সের মধ্যে সার্টিফিকেট সহকারী প্রশিক্ষণ কোর্স, তহসীলদার প্রশিক্ষণ কোর্স ও বেঞ্চ সহকারী প্রশিক্ষণ কোর্সের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার গত বছরের তুলনায় বর্তমান প্রশিক্ষণ বর্ষের প্রথম তিন মাসে (জুলাই–সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪) ঢাকা আঞ্চলিক কেন্দ্র ছাড়া অন্য তিনটি আঞ্চলিক কেন্দ্রে কিছুটা বেড়েছে। তবে এই তিনটি কোর্স যাদের জন্য প্রযোজ্য তাদের সংখ্যা কম থাকায় কোর্স তিনটির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার সব সময়ই কম থেকে যাচ্ছে। তাছাড়া লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের সময় প্রযোজ্য অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যাকে বিবেচনা করা হচ্ছে না।

(৪) প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী, অতিথি বক্তা নির্বিশেষে সকলেই প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণ ভাতাকে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

(৫) প্রশিক্ষণের প্রতি কর্মচারীদের অনীহার পেছনে অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনার অভাব।

(৬) গ্রন্থাগার, শিক্ষা সফর, খেলাধুলা এবং চিত্তবিনোদন সুবিধা প্রশিক্ষণকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে।

(৭) আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের সংগে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত ও কার্যকর যোগাযোগ প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। সাম্প্রতিককালে আঞ্চলিক

কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি এই মতকে সমর্থন করে।

(৮) প্রশিক্ষণকে ফলপ্রসূ করার জন্য প্রশিক্ষকের ভূমিকার কোন বিকল্প নেই। প্রশিক্ষকের আগ্রহ ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করতে পারে। আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের কর্মকর্তাগণ দেশি–বিদেশি প্রশিক্ষণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত, যা ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণের অন্যতম অন্তরায়।

(৯) আঞ্চলিক কেন্দ্রে কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্যে এক ধরনের হতাশা ও বিপিএটিসি'র প্রতি চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে।

(১০) রাজশাহী ছাড়া তিনটি আঞ্চলিক কেন্দ্রেই ক্ষেত্রবিশেষে অদক্ষতা এবং আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে যা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে কিছুটা হলেও ব্যাহত করছে।

(১১) প্রয়োজনীয় পরিবহন সুবিধা না থাকায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

(১২) বিপিএটিসি'র সাথে আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের যোগাযোগ যথেষ্ট দৃঢ় নয়।

৩.২ সুপারিশ

(১) আঞ্চলিক কেন্দ্র যাতে সব সময় একজন নিয়মিত দক্ষ এবং প্রগতিশীল উপ–পরিচালক দ্বারা পরিচালিত হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। অদক্ষ ও প্রশিক্ষণের প্রতি আগ্রহ নেই এমন কর্মকর্তাকে আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহে নিয়োগদান করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

(২) যাদের জন্য প্রশিক্ষণ তাদের সঠিক সংখ্যার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে বিপিএটিসি'র দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা থাকা দরকার।

(৩) প্রশিক্ষণের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদানের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা যেতে পারে।

(৪) কর্মচারীদের প্রশিক্ষণকে পদোন্নতির সাথে সম্পর্কিত করে একটি সুস্পষ্ট কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

(৫) প্রশিক্ষণকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য গ্রন্থাগার, শিক্ষা সফর, খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন সুবিধা প্রদান ও সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। খুলনা ও চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কেন্দ্রের গ্রন্থাগারের জন্য ক্যাটালগারের শূন্য পদ জরুরি ভিত্তিতে পূরণ করা প্রয়োজন।

(৬) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করার স্বার্থে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে আঞ্চলিক কেন্দ্রের যোগাযোগের মাত্রা আরো বাড়ানো প্রয়োজন। আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র দেওয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে বিপিএটিসি কর্তৃপক্ষ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানাতে পারেন।

(৭) আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহে কর্মরত কর্মকর্তাগণকে দেশি–বিদেশি প্রশিক্ষণের সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন, এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে বিরাজমান হতাশা ও ক্ষোভ দূরীভূত করে তাদেরকে আরো দক্ষ ও প্রশিক্ষণের প্রতি অধিকতর আগ্রহী করে তোলা যেতে পারে।

(৮) যে সব আঞ্চলিক কেন্দ্রে ক্ষেত্রবিশেষে দক্ষতার অভাব রয়েছে এবং আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক নেতিবাচক, সেখানে বিপিএটিসি কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

(৯) আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের সহায়তা প্রদানের জন্য পরিবহন সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে।

(১০) বিপিএটিসি'র সঙ্গে আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের যোগাযোগ আরো সুদৃঢ় হওয়া প্রয়োজন। বিপিএটিসি'র বাইরে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হলে সেখানে সংশ্লিষ্ট এমডিএস–এর উপস্থিতি বিবেচনা করা যেতে পারে। সমন্বয় সভা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হলে তা তুলনামূলকভাবে অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসূ হতে পারে।

সারণি-১

আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের এক দশকের (১৯৮৪/৮৫-১৯৯৩/৯৪) প্রশিক্ষণ

ক) বৎসরভিত্তিক

বৎসর	কোর্সের সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা	শতকরা হারে অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা
১৯৮৪–৮৫	৬০		১২৬২	
১৯৮৫–৮৬	৭৮	২৬৮০	১৭৪৫	৬৫.১১
১৯৮৬–৮৭	১৩৭	৪৮৮০	২৬৫০	৫৪.৩০
১৯৮৭–৮৮	১৪৪	৫০২০	৩৪৫৫	৬৮.৮২
১৯৮৮–৮৯	১৫৬	৪৫৮০	৩৫১৯	৭৬.৮৩
১৯৮৯–৯০	১৭২	৫৫২০	৪৩৭৬	৭৯.২৭
১৯৯০–৯১	১৬৯	৫১৪০	৪৫১০	৮৭.৭৪
১৯৯১–৯২	১৬৬	৫৭৫০	৩৬৭৪	৬৩.২৫
১৯৯২–৯৩	১৭০	৫৪৮০	৩৭৩৪	৬৮.৩০
১৯৯৩–৯৪	১৬৮	৫৬০০	৩৫৪০	৬৩.২১
মোট	১৪২০	৪৪৬৫০	৩২৪৬৫	৭২.৭০

খ) কেন্দ্রভিত্তিক

কেন্দ্রের নাম	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীদের লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা	শতকরা হারে অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা
—	৬০	—	১২৬২	—
ঢাকা	৩৫৮	১১৫৭৫	৮৮৬০	৭৬.৪১
চট্টগ্রাম	৩৩৫	১১০৪৫	৭১৯৭	৬৫.১৬
রাজশাহী	৩৩৪	১১০১৫	৭৯২১	৭১.৯১
খুলনা	৩৩৩	১০৯৯৫	৭২২৫	৬৫.৭১
মোট	১৪২০	৪৪৬৫০	৩২৪৬৫	৭২.৭০

উৎস ঃ আঞ্চলিক কেন্দ্র শাখা, বিপিএটিসি, সাভার ঢাকা।

বিঃ দ্রঃ ১৯৮৪–৮৫ অর্থ–বছরে অংশগ্রহণকারীদের কোন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল না। ঐ বছর চারটি আঞ্চলিক কেন্দ্রে মোট ৬০টি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঐ সকল কোর্সে মোট ১২৬২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জি

Bala, Hiralal and et al. (1990). *An Evaluation of the Training Programme For Class-II Government Officials*. Dhaka: BPATC.

DEB, S. R., M. A. Moqbul and M. M. Haque (1990). *Evaluation System of Training Programmes For Class-III & IV employees : A Study*. Dhaka : BPATC.

Farid, S. M. and et al. (1990). *Assessment of Training Needs of Class II Employees : A Case Study*. Dhaka: BPATC.

Khan, M. A. and et al. (1990). *Training Needs Assessment And Curriculum Development For the Bench Clarks*. Dhaka: BPATC.

Muslim, S. N. and S. S. Alam (1990). *On-The-Job Training Needs Assessment For Class II Level Officers : The Case of Administrative Officers of the District Collectorates*. Dhaka: BPATC.

Muznu-nul-Huq, S. K. M and et al. (1990) *Performance Appraisal System For Class III Employees in Bangladesh : A Case Study*. Dhaka : BPATC.

Samad, S. A. and A. Kar (1990). *A Study of Regional Public Administration Training Centre (RPATC) Project*. Dhaka : BPATC.

আলী, এম, ইদ্রিস ও অন্যান্য (১৯৯০), *চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের প্রশিক্ষণচাহিদা নিরূপণ ও পাঠ্যসূচি উন্নয়ন*, ঢাকা: বিপিএটিসি।

রাজ্জাক, মোঃ আব্দুর, মোঃ সফিউল্লাহ ও এ কে এম এনামুল হক (১৯৯০) *দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ ও পাঠ্যসূচি উন্নয়ন ঃ একটি সমীক্ষা*, ঢাকাঃ বিপিএটিসি।

হক, এ কে ফজলুল ও কেশব আচার্য, (১৯৯০) তৃতীয় *শ্রেণীর কর্মচারিদের আর্থ–ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ ও পাঠ্যসূচি উন্নয়ন, ঢাকাঃ* বিপিএটিসি।

সারণি –২

১৯৯৩–৯৪ প্রশিক্ষণ বর্ষ ও জুলাই সেপ্টেম্বর ৪ মাসে অনুষ্ঠিত কোর্সসমূহের তুলনামূলক চিত্র

	কেন্দ্রভিত্তিক কোর্স সংখ্যা		অনুষ্ঠিত কোর্স সংখ্যা		প্রশিক্ষণার্থীর লক্ষ্যমাত্রা		অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের শতকরা হার	
কেন্দ্রের নাম	১৯৯৩–৯৪ প্রশিক্ষণ বর্ষ	জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৪	১৯৯৩–৯৪ প্রশিক্ষন বর্ষ	জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৪	১৯৯৩–৯৪ প্রশিক্ষণ বর্ষ	জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৪	১৯৯৩–৯৪ প্রশিক্ষণ বর্ষ	জুলাই=সেপ্টেম্বর ১৯৯৪	১৯৯৩–৯৪ প্রশিক্ষণ বর্ষ	জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৪
ঢাকা	৪২	৮	৪০	৮	১৪০০	২৮৫	১০৬৭	২৮৬	৭৬.২১	১০০.৩৫
চট্টগ্রাম	৪২	৮	৩৫	৮	১৪০০	২৮৫	৮২৯	২০৬	৫৯.২১	৭২.২৮
রাজশাহী	৪২	৮	৩৯	৮	১৪০০	২৮৫	৯২৩	২৭৫	৬৫.৯২	৯৬.৫০
খুলনা	৪২	৮	৩৭	৮	১৪০০	২৮৫	৭২১	৩০৩	৫১.৫০	১০৬.৩২
মোট	১৬৮	৩২	১৫১	৩২	৫৬০০	১১৪০	৩৫৪০	১০৭০	৬৩.২১	৯৩.৮৬

উৎস ঃ আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহ থেকে সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে।

সারণি-৩

১৯৯৩-৯৪ প্রশিক্ষণন বর্ষ ও জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ মাসে অনুষ্ঠিত ৮টি নির্বাচিত কোর্সের তুলনামূলক চিত্র (শতকরা হারে)

	ঢাকা		চট্টগ্রাম		রাজশাহী		খুলনা		গড়	
কেন্দ্রের নাম কোর্সের নাম	১৯৯৩-৯৪ প্রশিক্ষণ বর্ষ (%)	জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ (%)	১৯৯৩-৯৪ প্রশিক্ষন বর্ষ (%)	জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ (%)	১৯৯৩-৯৪ প্রশিক্ষণ বর্ষ (%)	জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ (%)	১৯৯৩-৯৪ প্রশিক্ষণ বর্ষ (%)	জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ (%)	১৯৯৩-৯৪ প্রশিক্ষণ বর্ষ (%)	জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ (%)
মৌল অফিস প্রশাসন কোর্স	১৩০.৭১	১৪৫.৭১	৮৫	১০০	৬০	৮২.৮৬	৪৮.৫৭	১০৮.৫৭	৮১.০৭	১০৯.২৯
আর্থ-প্রশাসন কোর্স	৭৩.৩৩	৭৪.২৯	৮৫	৪৩.৩৩	৫৬.৬৬	১৪০	২১.৬৬	১১৪.২৯	৫৯.১৭	৮৬.৪৩
সার্টিফিকেট সহকারী প্রশিক্ষণ কোর্স	৯৪.২৯	৬৮.৫৭	০	৪৫.৭১	৭১.৪৩	৬০	০	৪২.৮৬	৪১.৪৩	৫৪.২৯
তহশীলদার প্রশিক্ষণ কোর্স	৯৭.১৪	৩৭.১৪	১০	৫৭.১৪	৮৭.১৪	১৬৮.৫৭	৭৪.২৯	১৬৫.৭১	৬৭.১৪	১০৭.৭৪
অফিস তত্ত্বাবধান কোর্স	৬২.৮৬	১৮৫.৭১	৪৫.৭১	৯৪.২৯	৩২.৩৮	৮৮.৫৭	৬১	১৫৭.১৪	৫০.৪৮	১৩১.৪৩
বিল প্রস্তুতকরণ ও সংরক্ষণ কোর্স	১১৩.৭৫	৯৫	৯৩.৭৫	৭৭.৫	৬৭.৫	১০২.৫	৭৭.৫	১৪২.৮৬	৮৮.১৩	১০০
আচরণ ও শৃঙ্খলা কোর্স (১ম শ্রেণী)	৮৮.৫৭	১৮২.৮৫	৬৮.৫৭	১১৪.২৯	৭৪.২৯	৭৭.১৪	৫৭.১৪	৫৭.১৪	৭২.১৪	১০৭.৮৬
বেঞ্চ সহকারী প্রশিক্ষণ কোর্স	২৫.৭১	১৪.২৯	১৪.২৯	৫১.৪৩	৫৪.২৯	৭১.৪৩	৫১.৪৩	৭৭.১৪	৩৬.৪৩	৫৩.৫৭

উৎস ঃ আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহ থেকে সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে।

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
সপ্তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, আশ্বিন ১৪০৩

বাঙলা উচ্চারণ রীতি ঃ 'অন্ত্য–অ'এর প্রমিত উচ্চারণ

আ.ক.ম.মাহবুবুজ্জামান*

১.০ ভূমিকা

১.১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদেশিদেরকে বাঙলাভাষা শেখাতে গিয়ে অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেন যে, বাঙলা ভাষা বানান অনুযায়ী উচ্চারিত হয় না। যেমন, 'কোন্ ও কোনো' এবং 'মত্ ও মতো' শব্দগুলো বাঙলা ভাষায় 'কোন' ও 'মত' এভাবে লেখা হয়। এতে বিদেশিরা বানান শিখেও সঠিক উচ্চারণ করতে সক্ষম হয়না। তিনি আরও আবিস্কার করেন যে, 'কষ্ট' ও 'ব্যস্ত' শব্দদ্বয়ের 'স'এর উচ্চারণে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। এ পার্থক্য বোঝার ও বোঝাবার উপায় খুঁজতে তিনি হিমশিম খান।

১.২ বাঙলা ভাষায় প্রমিত উচ্চারণ যথেস্ট আয়াসলব্ধ বিষয়। প্রতিটি শব্দের আদ্য, মধ্য ও অন্ত্যবর্ণে কীরূপ উচ্চারণ করলে তা প্রমিত হবে, সেটি জেনে বহুদিন তা আত্মস্থ করতে হয়। এ প্রবন্ধে বাঙলা ভাষার অ–কারযুক্ত অন্ত্যবর্ণের উচ্চারণ নিয়েই কেবল আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। অন্ত্যবর্ণ যুক্তাক্ষর বা সমাসবদ্ধ হলে তার উচ্চারণ ভিন্নতর হবে, যা এ প্রবন্ধের পরিধিভুক্ত নয়।

২.০ ব্যঞ্জন বর্ণে 'অ' এর অবস্থান

বাঙলা ব্যাকরণে ব্যঞ্জনবর্ণকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলা হয়ে থাকে যে, "যে বর্ণ স্বরধ্বনির সাহায্য ব্যতীত উচ্চারিত হতে পারে না, অথবা স্বরধ্বনিকে আশ্রয় করে উচ্চারিত হয়, তাকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে।" অর্থাৎ আমরা যখন 'ক' নামক ব্যঞ্জনবর্ণটি উচ্চারণ করি, তখন অজান্তে 'অ'স্বরবর্ণটি যুক্ত হয়ে যায়। ফলে ক+অ=ক, খ+অ=খ, চ+অ =চ, ন+অ=ন, ইত্যাদি উচ্চারণে 'অ' বর্ণের সাহায্য নিতে হয়। এভাবে প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে 'অ' অদৃশ্যমান ভাবে যুক্ত থাকে, এবং এরূপ 'অ' কে 'ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত–অ' বা 'ব্যঞ্জনে যুক্ত–অ' বলে। ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে "অ–কার ব্যঞ্জনবর্ণের গায়ে নিলীন থাকে।"

---

* উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশে লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

৩.০ অন্ত্য–অ এর উচ্চারণ

৩.১ যখন দুই বা ততোধিক বর্ণ দ্বারা একটি শব্দ গঠিত হয় এবং শেষ বর্ণটি অ–কার যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ হয়; তখন শেষ বর্ণটির উচ্চারণ দু'প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন ঃ

	শব্দ	উচ্চারণ	বৈশিষ্ট্য
ক)	আম	আম্	অন্ত্য–অ' এর উচ্চারণ বর্জিত
খ)	আহত	আহতো	অন্ত–অ' এর উচ্চারণ সংযুক্ত

৩.২ এখানে উল্লেখ্য, 'অ'এর উচ্চারণ বাঙলাভাষায় দু'প্রকারের। একটি 'অ'এর নিজস্বরূপে,যাকে ব্যাকরণের ভাষায় বলা হয় 'অর্ধ–বিবৃত স্বরধ্বনি', যেমনঃ 'অমানুষ' শব্দের আদ্যাক্ষরের 'অ'এর উচ্চারণ। অন্যটি 'ও' এর মত, যাকে ব্যাকরণের ভাষায় বলা হয় 'অর্ধ'–সংবৃত স্বরধ্বনি' যেমনঃ 'অতি(ওতি)' শব্দের আদ্যাক্ষরে 'অ'এর উচ্চারণ। শব্দের অন্ত্যবর্ণে যখন ব্যঞ্জনে যুক্ত –অ থাকে এবং অ–এর উচ্চারণ সংযুক্ত বা প্রকাশিত হয়, তখন তা 'ও' এর মত (অর্ধ–সংবৃত স্বরধ্বনি) হয়ে থাকে।

৩.৩ এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোন্ শব্দের 'অ–কার' যুক্ত অন্ত্য বা শেষ বর্ণের উচ্চারণে অ–কার সংযুক্ত হবে, আর কোন্ শব্দে বর্জিত হবে? এর সমাধান বেশ কঠিন। কেননা, কতিপয় সূত্র বা বিধি দিয়ে এটি সার্বিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়না। প্রধান সূত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

৪.০ অন্ত্য–অ এর উচ্চারণ সূত্র

৪.১ অন্ত্য–অ বর্জিত উচ্চারণ সূত্র ঃ

সাধারণত একাক্ষর বা একমাত্রাবিশিষ্ট (monosyllebic) শব্দের 'অন্ত্য–অ' এর উচ্চারণ বর্জিত হয়, তাই অন্ত্য বর্ণটি হসন্ত বর্ণরূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। যেমনঃ নাক (নাক্), কান (কান্), ঠিক (ঠিক্), মন (মোন্), ধন (ধন্), মাল (মাল্), রাজ (রাজ্), ভূত (ভূত্), কুল (কুল্), বেত (বেত্), চোখ (চোখ্), ইত্যাদি।

৪.২ কোন প্রকার সূত্র ছাড়াই অনেক শব্দের "অন্ত্য–অ' এর উচ্চারণ বর্জিত বা হস্‌যুক্ত (হসন্তবর্ণ) হয়ে থাকে। যেমনঃ এখন (এ্যাখোন্), যতন (যতোন্), পাদপ (পাদোপ্), মলিন (মোলিন্), দিবস (দিবোস্), অকারণ (অকারোন্), বিলক্ষণ (বিলক্‌খোণ্), অনিল (অনিল্), লোকনাথ (লোক্‌নাথ্), করুণ (কোরুণ্), নির্মল (নির্‌মল্), প্রান্তিক (প্রাণ্‌তিক্), ভোজন (ভোজোন্) ইত্যাদি। বাঙলা ভাষায় অধিকাংশ শব্দেরই বলতে গেলে 'অন্ত্য–অ' এর উচ্চারণ বর্জিত বা হস্‌যুক্ত হয়ে থাকে। ফলে সাধারণের ধারণা এরূপ যে, অন্ত্য–অ এর উচ্চারণ নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে, ওটা ব্যঞ্জণবর্ণের সঙ্গেঁ যুক্ত থাকলেও উচ্চারণ করার প্রয়োজন নেই। সুতরাং অন্ত্য–অ উহ্য রেখে যে কোন শব্দের উচ্চারণ

করা যাবে, এবং প্রায়শ অনেকই তা করে থাকেন। গোলামালটা বাধে ঠিক এখানেই। কারণ, এমন অনেক শব্দ আছে, যার অন্ত্য–অ এর উচ্চারণ সংযুক্ত না করা হলে কেবল প্রমিত উচ্চারণ বিধি লংঘিত হবে তাই নয়, বরং শব্দের অর্থও পাল্টে যেতে পারে। সেজন্য যে সব শব্দের অন্ত্য–অ উচ্চারিত হবে, তার সূত্রগুলো জেনে নেয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

৫.০ অন্ত্য–অ সংযুক্ত উচ্চারণ সূত্র ঃ

৫.১ বাঙলা ভাষায় বেশ কিছু শব্দ আছে যা একই বানানে বিশেষ্য এবং বিশেষণ পদে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্ত্য–অ উচ্চারিত হবে না, কিন্তু বিশেষণে ব্যবহার করতে হলে অন্ত্য–অ এর উচ্চারণ সংযুক্ত করতে হবে। যেমন ঃ

বিশেষ্য পদ			বিশেষণ পদ		
শব্দ	অর্থ	উচ্চারণ	শব্দ	অর্থ	উচ্চারণ
কাল	(সময়)	কাল্	কাল	(রঙ)	কালো
ভাল	(কপাল)	ভাল্	ভাল	(শুভ)	ভালো
খাট	(শয়নাধার)	খাট্	খাট	(বেঁটে)	খাটো
জাত	(বংশ)	জাত্	জাত	(উৎপন্ন)	জাতো
গীত	(গানবিশেষ)	গীত্	গীত	(গাওয়া হয়)	গীতো
পতিত	(কোন কাজে না লাগানো)	পতিত্	পতিত	(উপর থেকে পড়া)	পতিতো

৫.২ দ্বিরুক্ত শব্দাবলীর অন্ত্য–অ এর উচ্চারণ ভীষণ ঝামেলাপূর্ণ। কোথাও ও–কাররূপে, আবার কোথাও হসন্তরূপে ও–কার ছাড়া উচ্চারিত হয়। যেমন ঃ

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
ঢল–ঢল	(ঢলো–ঢলো)	কাঁদ–কাঁদ	(কাঁদো–কাঁদো)
পড়–পড়	(পড়ো–পড়ো)	মর–মর	(মরো–মরো)
ছল–ছল	(ছলো–ছলো)	কল–কল	(কলো–কলো)
ছাড়–ছাড়	(ছাড়ো–ছাড়ো)	ধর–ধর	(ধরো–ধরো)
আধ–আধ	(আধো–আধো)	ঘন–ঘন	(ঘনো–ঘনো)
ভাল–ভাল	(ভালো–ভালো)	কত–কত	(কতো–কতো)
বড়–বড়	(বড়ো–বড়ো)	বাধ–বাধ	(বাধো–বাধো)

ব্যতিক্রমঃ (নিম্নবর্ণিত শব্দাবলীতে হস্ চিহ্ন থাকেনা, কিন্তু উচ্চারণে সর্বদাই 'অ' বর্জিত হয়।)

গড়্–গড়্	ঝর্–ঝর্	সড়্–সড়্	চড়্–চড়্
ফিক্–ফিক্	ঝির্–ঝির্	সুড়্–সুড়্	মড়্–মড়্
কর্–কর্	টিপ্–টিপ্	ঢিপ্–ঢিপ্	শন্–শন্
বন্–বন্	কুল্–কুল্	চিক্–চিক্	চক্–চক্
দর্–দর্	টিক্–টিক্	ঘিন্–ঘিন্	দুম্–দুম্
পট্–পট্	ম্যাজ্–ম্যাজ্	ঘর্–ঘর্	পর্–পর্

৫.৩ 'আন' প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দাবলীর 'অন্ত্য–অ' উচ্চারিত হবে। যেমনঃ জানান (জানানো), পড়ান (পড়ানো), সাঁতরান (সাঁতরানো), করান (করানো), নাচান (নাচানো) ইত্যাদি। 'আন' প্রত্যয়যুক্ত শব্দের অন্ত্য–অ এর উচ্চারণে প্রায়শ জনসাধারণ ভুল করে বলে পশ্চিবঙ্গের অনেক পণ্ডিত ও লেখক 'ও–কার' যোগে অন্ত্যবর্ণ লেখার প্রচলন ঘটিয়েছেন। বাংলাদেশের লেখকদের মধ্যেও অনেকে অন্ত্যবর্ণে 'ও–কার' ব্যবহার করে অন্ত্য–অ এর উচ্চারণ নিশ্চিত করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতি (১৯৩৬) এসব 'আন' প্রত্যয়ান্ত শব্দে 'ও–কার' যোগকরণ বিধেয় বলে মত প্রকাশ করেছিলেন, যা সর্বত্র পালিত হয়না।

৫.৪ ক্রিয়াপদের সাধুরূপ শব্দ যদি ইল, ইব, ইত, ইতেছ, ইয়াছ, ইতেছিল, ইয়াছিল প্রভৃতি প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাহলে সেগুলোর অন্ত্য–অ 'ও–কার' রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যেমনঃ 'সে খেলা করিল' এ বাক্যে 'করিল' শব্দের অন্ত্য–অ 'ও–কার' রূপে উচ্চারিত (কোরিলো)। এরূপ সাধু শব্দ যখন চলিতের রূপ ধারণ করে, তখন তা করল, করত, করব, হত, চলল, করছ, ধরছিল, ধরেছ, করেছিল ইত্যাদি রূপে লিখিত হয়। অবশ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতির সুপারিশ মতে চলিত রূপের ওইসব শব্দের প্রথম বর্ণের পরে একটি উর্ধ্ব কমা (') প্রদানের নিয়ম ছিল। সুনীতিকুমার সহ অন্যান্য বৈয়াকরণবৃন্দ তা অনুসরণ করেছেন। বর্তমানে এই উর্ধ্বকমা প্রদানের প্রচলন প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে। বাংলা একাডেমীর সংক্ষিপ্ত বাংলা বানান অভিধানে উর্ধ্বকমা এসব ক্ষেত্রে প্রদত্ত হয়নি। ফলে 'চলল' (চোল্‌লো) ক্রিয়া পদটিকে কেউ যদি 'চলোল্' পড়ে কিংবা 'হল' (হোলো) ক্রিয়া পদকে কেউ 'হল্' উচ্চারণ করলে বাধা দেবার উপায় খুঁজে পাওয়া যায় না।

যাহোক, সাধু থেকে চলিতে রূপান্তরিত ক্রিয়া পদগুলোর অন্ত্যবর্ণে 'ও–কার' দিয়ে উচ্চারণ করতে হবে, এটাই নিয়ম। অবশ্য বর্তমানে অনেক লেখক চলিত ক্রিয়া পদের

অন্ত্যবর্ণে 'ও-কার' দিয়ে লিখছেন, এবং কালক্রমে এটি প্রাধান্য পাবে বলে অনুমিত হচ্ছে।

৫.৫ কোন শব্দের (বিশেষ্য, ক্রিয়া বা অন্যান্য যে কোন পদ) শেষে যদি 'ইত' বা 'ত' থাকে তাহলে অন্ত্য-অ 'ও-কার' রূপে উচ্চারিত হবে। যেমনঃ চলিত (চোলিতো), রত (রতো), শানিত (শানিতো), আহত (আহতো), মৃত (মৃতো), পঠিত (পোঠিতো), ব্যাহত (ব্যাহোতো), শত (শতো), বিকৃত (বি-কৃতো)।

এছাড়া যে সব শব্দের অন্ত্যে 'তঃ' (ত+বিসর্গ) ছিল কিন্তু 'বিসর্গ' বর্জন করে লেখার নিয়ম ইদানীং প্রচলিত হয়েছে, সেগুলোর অন্ত্য-অ 'ও-কার' রূপে উচ্চারিত হবে। যেমনঃ করতঃ-- করত (করোতো), সাধারণতঃ--সাধারণত (সাধারোণ্‌তো), ইত্যাদি।

৫.৬ কোন বিশেষ্য পদের শেষ বর্ণ 'হ' হলে সেই 'হ' কে 'ও-কার' দিয়ে উচ্চারণ করতে হবে। যেমন ঃ বিবাহ (বিবাহো), মোহ (মোহো), বরাহ (বরাহো), অহরহ (অহোরহো), ইত্যাদি। (ব্যতিক্রমঃ আল্লাহ্‌, শাহ্‌ ইত্যাদি বিদেশি শব্দাবলী)।

৫.৭ কোন বিশেষণ পদের শেষ বর্ণ 'ঢ়' হলে তাকে 'ও-কার' দিয়ে উচ্চারণ করতে হবে। যেমনঃ গূঢ় (গূঢ়ো), নিগূঢ় (নিগূঢ়ো), গাঢ়(গাঢ়ো), রূঢ় (রূঢ়ো), প্রগাঢ় (প্রগাঢ়ো), মূঢ় (মূঢ়ো), দৃঢ় (দৃঢ়ো) ইত্যাদি।

৫.৮ কোন শব্দের শেষে যদি 'জ' থাকে এবং 'জ' এর অর্থ যদি 'জাত' বা 'উৎপন্ন' বুঝায়, তাহলে সেই 'জ' কে 'ও-কার' দিয়ে উচ্চারণ করতে হবে। বাঙ্গালী সমাজে এ উচ্চারণটি প্রায়শ ভুল করতে দেখা যায়, তাই সাবধানতা অবলম্বন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। যেমনঃ অগ্রজ (অগ্‌গ্রোজো), অনুজ (ওনুজো), বনজ (বোনোজো), জলজ (জলোজো), দেশজ (দেশোজো), খনিজ (খোনিজো), ভেষজ (ভেষোজো), ইত্যাদি।

৫.৯ ই-কার ও এ-কার যদি পূর্ব বর্ণে থাকে এবং অন্ত্যবর্ণ যদি 'য়' (অন্ত্যস্থ-য়) হয়, তাহলে সেই 'য়'এর উচ্চারণ 'ও-কার'যুক্ত হবে। যেমন, প্রিয় (প্রিয়ো), দেয় (দেয়ো), বিধেয় (বিধেয়ো), শ্রেয় (শ্রেয়ো), অনুমেয় (ওনুমেয়ো), শ্রদ্ধেয় (শ্রোদ্‌ধেয়ো), অনুষ্ঠেয় (ওনুষ্ঠেয়ো), পাথেয় (পাথেয়ো), ইত্যাদি।

৫.১০ অন্ত্যবর্ণের পূর্বে যদি ঐ, ঔ, অনুস্বার (ং), বিসর্গ (ঃ) এবং 'ঋ' থাকে, তাহলে অন্ত্যবর্ণ 'ও-কার' ধারণ করবে। যেমনঃ তৈল (তোইলো), শৈল (শোইলো), গৌণ (গোউণো), সৌধ (সৌউধো), মৌন (মৌউনো), বংশ (বংশো), হংস (হংসো), কংস (কংসো), বিংশ (বিংশো), দুঃখ (দুক্‌খো), কৃশ (কৃশো), বৃষ (বৃষো), তৃণ (তৃণো), ঘৃত (ঘৃতো), ইত্যাদি।

৫.১১ কিছু কিছু শব্দের শেষ বর্ণে 'ধ' থাকলে ও–কার দিয়ে উচ্চারণ করতে হয়। যেমনঃ বিবিধ (বিবিধো), বহুবিধ (বোহুবিধো), উভয়বিধ (উভয়বিধো), নানাবিধ (নানাবিধো) ইত্যাদি।

কিন্তু বাঁধ, সাধ, বিরোধ, বধ, প্রভৃতি শব্দের অন্ত্য–অ উচ্চারিত হবেনা।

৫.১২ যে সব শব্দের অন্ত্যে তর, তম, তন প্রত্যয় যুক্ত হয়ে শব্দ গঠিত হয়, সেগুলোর অন্ত্য–অ 'ও–কার' রূপে উচ্চারিত হবে। যেমনঃ ঊর্ধ্বতন (উর্‌ধোতনো), উচ্চতর (উচ্‌চোতরো), নিম্নতম (নিম্‌নোতমো)।

৫.১৩ শব্দের অন্ত্যবর্ণে যদি ক্ষ (ক+ষ), য–ফলা, ও রেফ থাকে, অথবা যদি অন্ত্যবর্ণটি যুক্ত বর্ণ হয়, তাহলে স্বাভাবিক নিয়মেই অন্ত্যবর্ণে 'ও–কার' যোগ করে উচ্চারণ করতে হয়। যেমনঃ অদ্য (ওদ্‌দো), গদ্য (গোদ্‌দো), অসভ্য (অসোব্‌ভো), পূর্ব (পূর্‌বো), পূর্ণ (পূর্‌ণো), শান্ত (শান্‌তো), অন্ন (অন্‌নো), ক্লান্ত (ক্লান্‌তো), শক্ত (শক্‌তো), মোক্ষ (মোক্‌খো), বক্ষ বোক্‌খো), ইত্যাদি।

৫.১৪ অন্ত্যবর্ণের পূর্ব বর্ণে যদি রেফ থাকে তাহলে অন্ত্যবর্ণের উচ্চারণ হস্‌ যুক্ত হয়। যেমন: অর্পণ্‌, কর্কশ্‌, দর্শন্‌, সর্দার্‌ ইত্যাদি। কিন্তু ব্যতিক্রমী শব্দ 'কর্মঠ' (করমোঠো), 'গর্হিত' (গোর্‌হিতো)।

৬.০ উপসংহার

৬.১ ১৯৩৬ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতি কর্তৃক গ্রহীত সুপারিশের পরে ৬০ বছর পেরিয়ে গেছে। বাঙলা বানানোর ক্ষেত্রে পশ্চিম বঙ্গ ও বাংলাদেশে বেশ কিছু সংস্কারও সাধিত হয়েছে। কিন্তু আজও বাঙলা শব্দের বানান উচ্চারণুগ হয়নি। তাই আমরা প্রতিনিয়ত বিবিধ্‌, বনোজ্‌, উচ্চোতর্‌, কৃশ্‌, মূঢ়, বিধেয়্‌, জানান্‌, তৈল্‌, সৌধ্‌, কর্মঠ্‌ ইত্যাদি উচ্চারণ করি এবং শুনে থাকি। এতে প্রমিত উচ্চারণ ব্যাহত হচ্ছে।

৬.২ এরূপ বিচ্যুতি দূর করার জন্য বৈয়াকরণবৃন্দ যদি অন্ত্য–বর্ণের বানান সংস্কারে উদ্যোগী হন, তাহলে প্রভূত উপকার সাধিত হয়। যেখানে অন্ত্য–অ 'ও–কার' রূপে উচ্চারিত হবে, সেখানে 'ও–কার' দিয়ে লেখার বিধান চালু করলেই সমস্যাটি আর থাকেনা। তখন আমরা 'কাল্‌ ও কালো', 'মত্‌ ও মতো', 'মার্‌–মার্‌ ও মারো–মারো' প্রভৃতি শব্দের গোলক ধাঁধাঁয় না পড়ে প্রকৃত ও প্রমিত উচ্চারণ সহজেই করতে সক্ষম হবো।

গ্রন্থপঞ্জি

১। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, সম্পাঃ (১৯৯৩) *"বাংলাঃ কী লিখবেন, কেন লিখবেন"* কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

২। চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার (১৩৯৬) *'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'* কলকাতাঃ রূপা এ্যান্ড কোম্পানী।

৩। চৌধুরী, জামিল (১৯৯৩). *'বানান ও উচ্চারণ'* ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী।

৪। ডঃ চৌধুরী, আবুল কাশেম (১৯৮৫) *'উচ্চতর ব্যবহারিক ভাষা ও রচনা'* ঢাকাঃ তরুণ লাইব্রেরী।

৫। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমী (১৯৮৬) *'প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা'* কলকাতা।

৬। বিশ্বাস, নরেন (১৯৯০) *'বাঙলা উচ্চারণ অভিধান'* ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী।

৭। রহিম, আব্দুর (১৩৮২) *'সোনার বাঙলা অভিধান'* ঢাকাঃ ন্যাশন্যাল পাবলিশার্স।

৮। লাহিড়ী, শিবপ্রসন্ন ও অন্যান্য, সম্পাঃ (১৯৮৮) *'বাংলাভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ'* ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী।

লোক প্রশাসন সাময়িকী
৭ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, আশ্বিন ১৪০৩

সার-সংক্ষেপ লিখন ঃ কৌশল ও গুরুত্ব

মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা*

১.০ ভূমিকা

১.১ অফিস–আদালতে যেসব কাজ প্রায়ই করতে হয়, সার–সংক্ষেপ লিখন সেগুলোর মধ্যে একটি। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সবচাইতে বড় উপাদান হল তথ্য। তথ্যের স্বল্পতা যেমন একটি সমস্যা, তেমনি তথ্যের আধিক্যও একটি বড় সমস্যা। জটিল ও পুরনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় প্রাথমিকভাবে অনেক তথ্যই প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়, যদিও চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এগুলোর মধ্যে কোন কোনটি নিরর্থক প্রতিপন্ন হতে পারে। বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোর নির্বাচন অবশ্যই একটি কঠিন কাজ। সবচাইতে বড় অসুবিধা হল, প্রয়োজনীয় তথ্যাবলীর অধিকাংশই থাকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায়—সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে এগুলোকে এক সূত্রে গ্রন্থিত করতে হয়।

> The trouble with facts is that there are so many of them.
>
> — Samual McChord Crothers,
>
> *The Gentle Reader*

১.২ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন, অথচ প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় তথ্যাবলীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিন্যস্ত করার এ প্রক্রিয়া সার–সংক্ষেপ লিখনের প্রথম ধাপ। পরবর্তী কাজ হল প্রাপ্ত তথ্যাবলীর বিশ্লেষণ এবং সেগুলোকে সংক্ষেপে সাজিয়ে লেখা। এ লেখাটি অবশ্যই সহজও হতে হবে; কারণ দুর্বোধ্য ভাষা পড়ে সমস্যা অনুধাবন ও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুঃসাধ্য। কোন কিছু সহজভাবে প্রকাশ করাও একটি কঠিন কাজ। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, "সহজ কথা বলতে আমায় কহ যে/ সহজ কথা যায় না বলা সহজে।"

---

* উপ–পরিচালক, বাংলাদেশ লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

২.০ সার-সংক্ষেপ, সারমর্ম, ভাবার্থ, নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

২.১ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সংক্ষেপে, সহজ করে সাজিয়ে লেখার প্রক্রিয়াই হল সার–সংক্ষেপ লিখন (Summary Writing)। শিক্ষা–প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কবিতা, গদ্য–রচনা কিংবা তার অংশবিশেষের সারমর্ম বা ভাবার্থ লিখন (Precis Writing) চর্চা করা হয়। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় গবেষণাকর্ম কিংবা প্রতিবেদনের 'নির্বাহী সার–সংক্ষেপ' (Executive Summary) তৈরি করতে হয়।

২.২ এ কাজগুলো মূলত অনুরূপ হলেও এদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্যও রয়েছে। যেমন, শিক্ষা–প্রতিষ্ঠানে যে সারমর্ম বা ভাবার্থ লেখা হয় তার উদ্দেশ্য হল প্রদত্ত রচনাটুকুর মূল ভাব বা বক্তব্যটি উদ্ধার করা। নির্বাহী সার–সংক্ষেপে মূল প্রতিবেদনটির বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মূল বক্তব্য সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়। অপরদিকে অফিস–আদালতে যে সার–সংক্ষেপ লেখা হয়, তার উদ্দেশ্য হল সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে বিষয়টি সংক্ষেপে তুলে ধরা। এখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিধি–বিধানের বরাত দিতে হয় এবং প্রয়োজনবোধে সেগুলো সার–সংক্ষেপের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হয়।

২.৩ কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সার–সংক্ষেপে তৈরির প্রয়োজন হবে এবং কীভাবে তা লিখতে হবে, সে সম্পর্কে ১৯৭৬ সনের সচিবালয় নির্দেশমালায় কিছু কিছু নির্দেশ দেওয়া আছে। সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য এসব নির্দেশ অবশ্যই পালনীয়। কারণ সংস্থাপন মন্ত্রণালয় 'সচিবালয় নির্দেশমালা' (Secretariat Instructions) তৈরি করেছে 'কার্যবিধিমালা' (Rules of Business) –এর ৪ (১০) সংখ্যক বিধি অনুযায়ী এবং মহামান্য রাষ্টপতি কার্যবিধিমালা প্রণয়ন করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৬(৫) সংখ্যক অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে।

২.৪ সচিবালয় নির্দেশমালায় সার–সংক্ষেপের কাঠামো ও এটি লিখনের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। বিভিন্ন নির্বাহী আদেশ ও প্রচলিত রীতি–নীতি অনুসারে সার–সংক্ষেপ লিখনের একটি স্বীকৃত কাঠামো ও পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক আদেশগুলোর মধ্যে ২২শে মার্চ, ১৯৯২ তারিখে জারিকৃত মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একটি উপানুষ্ঠানিক পত্র (পরিশিষ্ট 'ক') এবং এর সঙ্গে সংযুক্ত সাধারণ নিয়মাবলী (পরিশিষ্ট 'খ') ও নমুনা সার–সংক্ষেপ (পরিশিষ্ট 'গ') উল্লেখযোগ্য।

৩.০ সার সংক্ষেপ কেন এবং কখন

৩.১ অফিস–আদালতে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের খুবই ব্যস্ত সময় কাটাতে হয়। তাঁদের পক্ষে কোন বিষয় আদ্যোপান্ত পড়া প্রায়ই সম্ভব হয় না। এজন্য কোন বিষয় ও

সমস্যাকে সার-সংক্ষেপের সাহায্যে উপস্থাপনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সহজতর করা হয়। কোন বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভা কিংবা ক্যাবিনেট কমিটির সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হলে বিষয়টি সার-সংক্ষেপ আকারে পেশ করা হয়।

৩.২ 'সচিবালয় নির্দেশমালা, ১৯৭৬-এ বলা হয়েছে যে, "যখন কোন নথি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হয়, তখন ইহাতে অপরিহার্যভাবেই একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সঠিকভাবে বরাত-সূত্রযুক্ত সার-সংক্ষেপ থাকিতে হইবে। যথাযথ বরাতসূত্র সম্বলিত এই সার-সংক্ষেপে বিষয়টির তথ্যাদি, নোট ও চিঠি-পত্রাদি হইতে লওয়া গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং তৎসহ বিবেচ্য বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে এবং ইহার শেষ ভাগে সুনির্দিষ্ট সুপারিশসমূহ সন্নিবেশিত থাকিবে। এই সার-সংক্ষেপ সচিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে যাহাতে রাষ্ট্রপতি তাঁহার আদেশাবলী সার-সংক্ষেপের উপর লিপিবদ্ধ করিতে পারেন।" (নির্দেশ ১১১)

৩.৩ "যদি কোন বিষয় মন্ত্রীর নিকট পেশ করা হয়, এবং উক্ত বিষয়ের উপর নথিতে প্রদত্ত শেষ নোটখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ না হয়, তাহা হইলে বিষয়টির একটি সার-সংক্ষেপও প্রদান করিতে হইবে।" (নির্দেশ ১১২)

৩.৪ "জটিল বা দীর্ঘসূত্রী বিষয়গুলি, বিশেষত অন্য কোন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সহিত পরামর্শ করিতে হয় এমন সব ক্ষেত্রে শাখা প্রধান বিষয়টির একটি যথাযথভাবে বরাত-সূত্র নির্দেশিত সার সংক্ষেপ (duly referenced summary) প্রস্তুত করিবেন, সিদ্ধান্ত সমূহ অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে এই সার-সংক্ষেপ হাল অবস্থায় (up-to-date) রাখিতে হইবে। যে কর্মকর্তা এই সার-সংক্ষেপ প্রস্তুত করিবেন, তাঁহার দ্বারা ইহা স্বাক্ষরিত হইবে। বিষয়টির বিবরণ অতঃপর নথির নোটাংশে পুনরুক্ত হইবে না। যখন বিষয়টি অপর মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিকট প্রেরণ করা হইবে, তখন প্রয়োজনবশতঃ সেই মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিষয়টির সার-সংক্ষেপের একটি অনুলিপি তাহাদের নিকট রাখিয়া দিতে পারিবেন।" (নির্দেশ ১১৮)

৩.৫ জটিল, পুরনো বিষয় মন্ত্রণালয় ছাড়াও অন্যান্য অফিস-প্রধানের কাছে উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও সার-সংক্ষেপ সহ পেশ করার রেওয়াজ রয়েছে। এ রেওয়াজ অনুযায়ী সচিবালয়ের বাইরের বিভিন্ন অফিসে সার-সংক্ষেপ তৈরি ও উপস্থাপন করা হয়।

৪.০ সার-সংক্ষেপের ভাষা

৪.১ সার-সংক্ষেপের ভাষা সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল হওয়া বাঞ্ছনীয়। বানান ও বাক্যের শুদ্ধতার প্রতিও মনোযোগী হতে হবে। অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার না করাই শ্রেয়।

বক্তব্যকে ছোট ছোট বাক্যে প্রকাশ করলে তা বুঝতে ও বোঝাতে সুবিধা হয় এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণও সহজ হয়। চিন্তার স্বচ্ছতা, বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা, প্রচলিত আইন-কানুন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান এবং ভাষায় দখল থাকলে জটিল বিষয়কেও সহজভাবে প্রকাশ করা যায়।

৪.২ মনে রাখা প্রয়োজন যে, সার-সংক্ষেপ প্রশাসনিক যোগাযোগের একটি প্রধান রূপ (form) এবং ভাষা হল যোগাযোগের একটি অপরিহার্য বাহন।

৫.০ সার-সংক্ষেপের কাঠামো

৫.১ একটি স্বয়সম্পূর্ণ সার-সংক্ষেপে সাধারণত নিম্নলিখিত অংশের সন্নিবেশ থাকে ঃ

ক. ভূমিকা ঃ ভূমিকায় বিষয়টির উৎপত্তি, অর্থাৎ কোন্ পরিপেক্ষিতে বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে, তার উল্লেখ থাকে।

খ. সমস্যা ঃ যে সমস্যা বা ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিষয়টি আবর্তিত, এ অংশে সেটি চিহ্নিত করা হয়।

গ. আইন ও বিধির প্রভাব ঃ বিষয়টি সম্পর্কে যে সকল আইন বা বিধি-বিধান রয়েছে, সেগুলোর উল্লেখ করতে হয়।

ঘ. অতীত সিদ্ধান্ত (Precedent): বিষয়টি সম্পর্কে ইতপূর্বে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকলে নজির হিসেবে তার উল্লেখ থাকা বাঞ্চনীয়।

ঙ. সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয় (point(s) for decision): বিষয়টির নিস্পত্তির জন্য যে যেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন, তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

চ. সুপারিশ ঃ সার-সংক্ষেপের শেষাংশে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সুনির্দিষ্ট সুপারিশ/প্রস্তাব উপস্থাপন করতে হয়।

৫.২ সার-সংক্ষেপ লিখন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন ঃ

ক. স্বয়ংসম্পূর্ণ বরাতসূত্র ঃ বরাতসূত্র যথাযথভাবে উল্লেখ করতে হবে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও তথ্যাদি সংলগ্নী হিসেবে সংযোজন করতে হবে।

খ. সচিবের স্বাক্ষর ঃ মহামান্য রাষ্টপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভা ও ক্যাবিনেট কমিটির নিকট উপস্থাপনের জন্য তৈরি সার-সংক্ষেপে সরকারের সচিব স্বাক্ষর করবেন। সার-সংক্ষেপখানা মন্ত্রী মহোদয় দেখেছেন এবং তাঁর অনুমোদনক্রমে এটি উপস্থাপিত হচ্ছে, এ কথাগুলো সার-সংক্ষেপের শেষ অনুচ্ছেদে পরিষ্কারভাবে লিখতে হবে।

গ. প্রেরণের পদ্ধতি ঃ মন্ত্রিসভা বা ক্যাবিনেট কমিটির জন্য তৈরি সার–সংক্ষেপ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিবের কাছে পাঠাবেন।

ঘ. অন্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে পরামর্শ ঃ বিবেচ্য বিষয় অন্য কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলে সার–সংক্ষেপ তৈরির পূর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে উভয় মন্ত্রণালয় ঐকমত্যে পৌছার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। ঐকমত্যে পৌছা সম্ভব না হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত বিশ্বস্ততার সঙ্গে সার–সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে।

৬.০ কর্মপত্র ও সার-সংক্ষেপের তুলনা ঃ

৬.১ কর্মপত্র (working papers) ও সার–সংক্ষেপ উভয়ই সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ দু'য়ের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে। যেমন ঃ

ক. কর্মপত্র সভায় পেশ করা হয়, অপরদিকে সার–সংক্ষেপ মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভা ও ক্যাবিনেট কমিটির নিকট পেশ করা হয়।

খ. উভয়ের মূল উদ্দেশ্য অভিন্ন, এবং তা হল কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

গ. সার–সংক্ষেপের একটি বিধিগত মর্যাদা আছে, যা কর্মপত্রের সাধারণত থাকে না।

ঘ. সার–সংক্ষেপের তুলনায় কর্মপত্রের আকার সাধারণত বিস্তৃত হয়।

ঙ. সার–সংক্ষেপ ও কর্মপত্র লিখনের কলাকৌশল অনেকাংশে অভিন্ন।

৬.২ কর্মপত্র ও সার–সংক্ষেপ সংক্রান্ত জ্ঞান ও এ দু'য়ের অনুশীলন পরস্পরের পরিপূরক।

৭.০ ভাল সার-সংক্ষেপের বৈশিষ্ট্য ঃ

৭.১ ভাল সার–সংক্ষেপে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ্য করা যায় ঃ

ক. বক্তব্যের স্পষ্টতা, যথার্থতা ও সাবলীলতা,

খ. স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যের সমাবেশ;

গ. ধারাবাহিকতা ও যথাযথ কাঠামো;

ঘ. সামঞ্জস্যপূর্ণ বক্তব্য;

ঙ. সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব/সুপারিশ উপস্থাপন;

চ. সহজবোধ্য ও বিশুদ্ধ ভাষা।

৭.২ কর্মপত্রের ভাষা সহজবোধ্য ও শুদ্ধ করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়াবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন ঃ

ক. যথাসম্ভব ছোট বাক্য ও প্রচলিত শব্দের ব্যবহার;

খ. বানান ও বাক্যের শুদ্ধতা;

গ. কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্যের ব্যবহার সম্পর্কে সতর্কতা। উল্লেখ্য, কর্তৃবাচ্য লিখতে ও বুঝতে সুবিধা হয়।

৮.০ উপসংহার ঃ

৮.১ সার-সংক্ষেপ লেখার পদ্ধতিগত দিকগুলো আলোচনা করা সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে উন্নত মানের সার-সংক্ষেপ লেখা নির্ভর করে; যিনি লিখবেন তাঁর ভাষাজ্ঞান ও বিষয়গত দক্ষতার উপর। তবে পদ্ধতিগত ধারণা যে কোন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক। অনুশীলন এ দক্ষতাকে শাণিত করে।

৮.২ ভাল সার-সংক্ষেপ কেবল সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণেই সাহায্য করে না, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার আত্মবিশ্বাসকে প্রগাঢ় করে এবং কর্মক্ষেত্রে সন্তুষ্টি অর্জনে ইতিবাচক অবদান রাখে।

পরিশিষ্ট 'ক'

মোহাম্মদ আইয়ুবুর রহমান, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপানুষ্ঠানিক পত্র নং মপবি/বিবিধ-৫/৮৯/২০৪(৪৫)-মসশা তাং ৮ই চৈত্র, ১৩৯৮ বাং (২২শে মার্চ, ১৯৯২ ইং)

বিষয় ঃ মন্ত্রিসভার জন্য সার-সংক্ষেপ প্রেরণ এবং মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতাংশের প্রাপ্তি স্বীকার ও বাস্তবায়নের জন্য বিতরণ প্রসংগে।

প্রিয় সচিব,

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ থেকে মন্ত্রিসভার অনুমোদন, নীতিগত অনুমোদন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ অথবা অবহিত হওয়ার জন্য মন্ত্রিসভায় পেশ করিবার নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রিসভার জন্য সার-সংক্ষেপ সংক্রান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম-বিধি প্রচলিত আছে এবং সেগুলো যাতে যথাযথভাবে অনসুরণ করা হয় তার অনুরোধ জানিয়ে মন্ত্রি-পরিষদ বিভাগ থেকে একাধিক উপানুষ্ঠানিক পত্র ইতিপূর্বে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব/ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিবদের কাছে পাঠানো হয়েছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার জন্য সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রেরণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না। সার-সংক্ষেপে বিভিন্ন ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থাকার কারণে এগুলো মন্ত্রিসভার আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় না। ফলে মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন প্রস্তাব ও সুপারিশ মন্তিসভার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকে। সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন এবং প্রেরণে সতর্কতা অবলম্বন করলেই এসব

ত্রুটি–বিচ্যুতি দুর করা সম্ভব এবং এতে করে সকল সার–সংক্ষেপ যথাসময়ে মন্ত্রিসভায় পেশ করার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা যায়।

২। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত 'অতি গোপনীয়' শ্রেণীভুক্ত বিধায় এর উদ্ধৃতাংশ সংশ্লিষ্ট সচিব/ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিবের নিকট পাঠানো হয় এবং এটি তাঁর হস্তগত হওয়ার পর তাঁর নিজ স্বাক্ষরে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র মন্ত্রি–পরিষদ বিভাগে পাঠানো হয়ে থাকে। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত সরকারী সিদ্ধান্ত হিসেবে প্রচার করার বিধান থাকলেও কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতাংশ অবিকল নকল অথবা ফটোকপি করে অধস্তন কর্মকর্তাদের কাছে এর বাস্তবায়নের জন্য বিতরণ করা হচ্ছে, যা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাজ্য। এক্ষেত্রে কার্যবিধিমালা ১৯৭৫–এর ২১ ধারার (২) ও (৩) উপ–ধারা যথাযথভাবে অনুসরণ করলে এরূপ বিড়ম্বনা ও অনিয়ম এড়ানো সম্ভব।

৩। মন্ত্রিসভার জন্য সার–সংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রেরণের ক্ষেত্রে যে সব ভুল–ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, সেগুলো পরিহারকল্পে কার্যবিধিমালা, ১৯৭৫–এর সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম ও রীতি অনুযায়ী অবশ্যই অনুসরণীয় একটি বিবরণী এবং একটি নমুনা সার–সংক্ষেপ সংযুক্ত করা হলো। এগুলো সতর্কতার সাথে অনুসরণ করে মন্ত্রিসভার জন্য সার–সংক্ষেপ প্রণয়ন করা হলে এটি মন্ত্রিসভার আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে আর কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না।

৪। উপরি–উক্ত বিষয়ে আপনার সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করছি।

শুভেচ্ছান্তে,

একান্তভাবে আপনার,
স্বাঃ মোহাম্মদ আইয়ুবুর রহমান,
মন্ত্রি–পরিষদ সচিব।

পরিশিষ্ট 'খ'

মন্ত্রিসভার জন্য সার–সংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রেরণের সাধারণ নিয়মাবলী

১. মন্ত্রিসভার জন্য প্রেরিত সার–সংক্ষেপ "অতি গোপনীয়" শ্রেণীভুক্ত বিধায় উহাদের প্রতিটি কপিতে "অতি গোপনীয়" হিসাবে চিহ্নিত করিয়া শুদ্ধরূপে মোট সংখ্যার ক্রম–ক্রমিক নম্বর প্রদান করিতে হইবে। (যেমন ৫৫ কপির ১ম কপি, ৫৫ কপির ২য় কপি, ৫৫ কপির ৫৫তম কপি)।

২. সার–সংক্ষেপের প্রথম পৃষ্ঠার উপরিভাগের মাঝামাঝি অংশে অবশ্যই মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম থাকিতে হইবে।

৩. সার–সংক্ষেপের যে স্থানে মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম ও বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয় ঠিক উহার মধ্যবর্তী স্থানে "মন্ত্রিসভার জন্য সার–সংক্ষেপ" এই বাক্যটি লিখিতে হইবে।

৪. কোন কোন ক্ষেত্রে সার–সংক্ষেপে তারিখ উল্লেখ থাকে না বিধায় উহা কোন্ সময়ের সার–সংক্ষেপ বুঝিবার অবকাশ থাকে না। সার–সংক্ষেপের প্রথম পৃষ্ঠার উপরিভাগের

ডান দিকে যে অংশে "অতি গোপনীয়" ও ক্রম-ক্রমিক নম্বর লিখা হয়, উহার ঠিক নীচে তারিখ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫. পরিমিত ও উপযুক্ত মার্জিনসহ সার-সংক্ষেপ দুই স্পেসে টাইপ করিয়া এক পৃষ্ঠায় সাইক্লোষ্টাইল অথবা মুদ্রণ করিতে হইবে।

৬. সার-সংক্ষেপের ফটোকপি সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। সার-সংক্ষেপ সাইক্লোষ্টাইল অথবা মুদ্রণ করিয়া প্রেরণ করিতে হইবে।

৭. সার-সংক্ষেপের শেষে সচিব/ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব/ভারপ্রাপ্ত যুগ্ম-সচিব নিজে স্বাক্ষর করিবেন। নির্ধারিত স্থানে স্বাক্ষরিত (এসডি) অথবা অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য নয়।

৮. সার-সংক্ষেপের প্রস্তাবের সহিত সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া এবং প্রয়োজনবোধে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উহার সিদ্ধান্ত সার-সংক্ষেপে প্রতিফলিত করিতে হইবে।

৯. সার-সংক্ষেপের প্রস্তাবের সহিত সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত, আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকের কার্যবিবরণীর সংশ্লিষ্ট অংশের উদ্ধৃতাংশ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন সার-সংক্ষেপের সহিত সংযোজনী হিসাবে প্রদান করিয়া উহাদের যথাযথ সংলগ্নী চিহ্নিত করিতেহইবে।

১০. সার-সংক্ষেপের বিষয়বস্তুর উপর দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়ের অনুমোদন লইয়া উহা সার-সংক্ষেপে প্রতিফলিত করিতে হইবে।

১১. সার-সংক্ষেপে কি সিদ্ধান্ত চাওয়া হইতেছে উহা পৃথক অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। সার-সংক্ষেপটি সিদ্ধান্তের জন্য, অবগতির জন্য, দিক-নির্দেশনা বা নীতিগত অনুমোদনের জন্য পেশ করা হইলে উহাও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১২. মন্ত্রিসভার জন্য সার-সংক্ষেপ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন হইতে হইবে। সংযুক্ত কাগজপত্র ও সংলগ্নীসমূহ না পড়িয়াও মূল বক্তব্য যাহাতে অনুধাবন করা যায় সেই উদ্দেশ্যে উহাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সার-সংক্ষেপে প্রতিফলিত হইতে হইবে।

১৩. সার-সংক্ষেপ অহেতুক দীর্ঘায়িত না করিয়া যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত রাখা সমীচীন হইবে।

১৪. নির্দিষ্ট সংখ্যক অর্থাৎ পঞ্চান্ন (৫৫) কপি সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করিতে হইবে।

১৫. মন্ত্রিসভার জন্য পেশকৃত সার-সংক্ষেপ "অতি গোপনীয়" শ্রেণীভুক্ত বিধায় ইহা প্রেরণে সংশ্লিষ্ট বিধি ও নিয়ম সতর্কতার সহিত ও কঠোরভাবে পালন করিতে হইবে। সামান্য অসাবধানতার জন্য সার-সংক্ষেপ ফাঁস হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়।

১৬. পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রতি সোমবার মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে। মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে কোন সার-সংক্ষেপ পেশ করিবার প্রয়োজন হইলে উহা মন্ত্রি-পরিষদ বিভাগে সর্বশেষ পূর্বের সপ্তাহের মঙ্গলবার-এর পূর্বে পৌছাইতে হইবে।

পরিশিষ্ট গ

সার–সংক্ষেপ এর নমুনা

অতি গোপনীয়

৫৫ কপির ( ) কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

তারিখ ঃ

মন্ত্রিসভার জন্য সার–সংক্ষেপ

বিষয় ঃ

নামঃ

সচিব/ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব

-----------মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Barnet, Sylvan and Marcias tubbs, *Practical Guide to Writing,* Little, Brown and Company, Boston, 1983.
2. Flesch, Rudolf, *How to Be Brief,* Harper & Row, New York, 1962.
3. Government of Bangladesh, *Rules of Business,* 1975 (Revised up to December, 1989).
4. Hammond, ER, *Informative Writing*. Mc.Graw-Hill Book Company, New York, 1985.
5. Holtz, Herman, *Pursuasive Writing*. Mc.Graw-Hill Book Company, New York, 1983.
6. Kakonis, T. E. and John Scally, *Writing in an Age of Technology,* Macmillan, New York 1978.
7. Leggett, Glenn, C. D. Mead and M. G. Kramer, *Handbook for Writers,* Prentice- Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey, 1984.
8. Lesikar, R. V., *How to Write Report Your Boss Will Read and Remember,* Dow Jones-Irwin Inc, Homewood, Illinois, 1974.
9. Zinsser, William, *Writing With a Word Processor,* Happer & Row, New York, 1983.
10. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সচিবালয় নির্দেশমালা,* ১৯৬, ঢাকা।

১১. বালা, হীরালাল, *প্রশাসনিক যোগাযোগ,* বুক সিন্ডিকেট, ঢাকা, ১৯৯০।

১২. লাহিড়ী, শিবপ্রসন্ন ও অন্যান্য, *বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮।

লোক প্রশাসন সাময়িকী
৭ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, আশ্বিন ১৪০৩

পিএটিসিতে বৃক্ষরোপণের নেপথ্যে

এ. জেড. এম. শামসুল আলম*

১.০ ভূমিকা ঃ

সাভারে অবস্থিত বাংলাদেশ লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য স্থাপিত শীর্ষ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। এখানে ২৯টি ক্যাডার এবং ক্যাডার বহির্ভূত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য চার মাসের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে মধ্য সোপান এবং যুগ্ম–সচিবদের তিন মাসব্যাপী উচ্চতর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় এই কেন্দ্রে। সচিব, অতিরিক্ত সচিব এবং বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের সেমিনার ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয় এখানে।

সাবেক প্রশাসনিক স্টাফ কলেজ, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন (নিপা), সিভিল অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমী (কোটা), এবং স্টাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বিলুপ্ত করে ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের জনবল, আসবাবপত্র, অভিজ্ঞতা ও সম্পদ নিয়ে নতুন নামে ১৯৮৪ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

১.২ সাবেক কোটা, নিপা ও ষ্টাফ কলেজ ভেঙ্গে নতুন এবং উন্নততর আঙ্গিকে লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়তে সরকারের ব্যয় হয়েছে ৪২ কোটি টাকারও বেশী, তার প্রায় অর্ধেক বিশ্বব্যাংকের ঋণ ।

১.৩ বাংলাদেশ লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভূমি দখল ও ভূমি উন্নয়নের কাজ শুরু হয় ১৯৭৮ সনে। মরহুম রফিকুল্লাহ চৌধুরী (প্রাক্তন সিএসপি) ছিলেন এই প্রকল্পের প্রথম প্রজেক্ট ডাইরেক্টর। ১৯৮১ সনের ৩১ শে ডিসেম্বর সাভারে কেন্দ্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন সাবেক মহামান্য রাষ্টপতি মরহুম বিচারপতি আবদুস সাত্তার। তখন প্রকল্প পরিচালক ছিলেন জনাব হোসেন তৌফিক ইমাম। জনাব আহবাব আহমদ এবং ডঃ তৌফিক ইলাহী চৌধুরী, স্বল্প সময়ের জন্য পিএটিসি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ছিলেন ১৯৮৪ সনে।

১.৪ বিভিন্ন কারণে কেন্দ্রের উন্নয়ন কাজ অত্যন্ত শ্লথ গতিতে চলতে থাকে। বিষয়টি অবগত হয়ে রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ হুকুম দিলেন নির্মীয়মান

---

* রেক্টর, বাংলাদেশ লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

কেন্দ্রটিতে প্রশিক্ষণ প্রদানে আর বিলম্ব করা যাবে না। যদিও কেন্দ্র চালু করার সম্ভাব্য তারিখ ছিল ১৯৮৫ সনের শেষ দিকে, রাষ্ট্রপতির নির্দেশে ৫ এপ্রিল ১৯৮৪, বাংলাদেশ লোক -প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অধ্যাদেশ ১৯৮৪ জারী হয় এবং ২৮ এপ্রিল ১৯৮৪ তারিখ হতে কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু হয়। রাষ্ট্রপতি ৩ মে ১৯৮৪ তারিখে বাংলাদেশ লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, এর উদ্বোধন করেন। এর মধ্যে কেন্দ্রের অফিস ভবন, শ্রেণীকক্ষ এবং ডরমিটরি অনেকাংশেই নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য ফ্ল্যাট নির্মাণ হয়নি। ফলে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনেককেই সার্ভিস বাসে করে সাভারে যেতে হতো।

২.০ বিপিএটিসি'তে বৃক্ষরোপণ ও অর্থ বরাদ্দ

২.১ বাংলাদেশ লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রকল্পে বৃক্ষরোপণের জন্য বরাদ্দ ছিল ১ লক্ষ টাকা সংশোধিত প্রকল্পে তা ৫ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উদ্বোধন উপলক্ষে কেন্দ্রটি বৃক্ষশোভিত করতে প্রাথমিকভাবে বরাদ্দকৃত এক লক্ষ টাকার প্রায় সব শেষ হয়ে যায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দিন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ কেন্দ্রের একটি বিশেষ স্থানে স্বহস্তে একটি বকুল গাছের চারা রোপণ করেন।

২.২ এক লক্ষ টাকার বরাদ্দ কিভাবে ৫ লক্ষ হল তার বিবরণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিভিন্ন কারণে এবং বিভিন্নভাবে কেন্দ্র উদ্বোধনের সময় যে সমস্ত গাছের চারা লাগানো হয়েছিল তার অনেকগুলি মরে যায়। রাষ্ট্রপতি বিরক্ত হয়ে এক সময় এটাকে মরুভূমি বলে উল্লেখ করেন এবং গাছ পালা না দেখতে পেয়ে কর্মকর্তাদেরকে ভর্ৎসনা করেন। রাষ্ট্রপতির বিরাগভাজনের পর আইএমইডিও সতর্ক হয়। তারা বিষয়টির প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে এবং প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে, লক্ষ টাকায় রোপিত গাছপালার কিছুই দেখা যায় না ।

২.৩ আইএমইডির প্রতিবেদন, অন্যান্য খবরাখবরে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সতর্ক হয়। লক্ষ টাকা ব্যয়ে রোপিত বৃক্ষের অকাল মৃত্যুতে কর্মকর্তাগণ শোকাহত হন। এই শোকাবহ ঘটনার তদন্ত করার জন্য গঠিত হয় উচ্চ পর্যায়ের পেশাজীবী তদন্ত কমিটি। কমিটি বিষয়টি তদন্ত করে বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করেন। জনাব মুজিবুল হক আমাকে (লেখককে) জিজ্ঞাসা করলেন, পিএটিসি প্রকল্পের বৃক্ষায়নের জন্য যে এক লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, তাতে কয়টি বৃক্ষ এখনও জীবন্ত আছে? আমি জবাবে জানালাম কিছু গাছ আছে, তবে সংখ্যা উল্লেখ করার মত নয়। প্রতিটি বৃক্ষের রোপণ ব্যয় কত হবে তা তিনি জানতে চাইলেন। নির্লজ্জ না হয়ে বলার মত তথ্য হাতে ছিল না। তাই আমলাসুলভ যুক্তিতে বিষয়টাকে হালকা করার লক্ষ্যে বললাম, যেহেতু বিপিএটিসি একটি 'সেন্টার অফ এক্সেলেন্স' এবং শীর্ষ স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, তাই এর প্রতিটি বৃক্ষের জন্য ব্যয়ও শীর্ষ অঙ্কের হওয়া স্বাভাবিক এবং তাই হয়েছে।

২.৪ পিএটিসি কমপ্লেক্সে বৃক্ষরোপণ সম্পর্কে আইএমইডি কর্তৃপক্ষের বিরূপ মন্তব্য সূচক একটি রিপোর্ট পরিকল্পনা কমিশনে ছিল। প্রতিবেদনে বলা হয়, লক্ষ টাকা ব্যয়ে রোপিত বৃক্ষের একটিও তদন্ত টীম দেখেন নি। কথাটি ছিল অতিরঞ্জিত। লক্ষ টাকা ব্যয়ে রোপিত বৃক্ষের কয়েকশত জীবিত ছিল, কিন্তু এত গাছ মরে গিয়েছিল যে, ৫৫ একর জমিতে জীবিত গাছ খুঁজে বের করতে হতো। বৃক্ষরোপণ খাতে একলক্ষ টকার স্থলে দশ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাবে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য জনাব মজিবুল হক আমার প্রতি বেশ ক্ষুব্ধ হলেন।

২.৫ ভর্ৎসনামূলক কিছু মন্তব্য করে তিনি আমাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, "শামসুল আলম, এরূপ অপচয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বৃক্ষরোপণের জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা কি সংগত মনে কর?" একটু চুপ থেকে হ্যাঁ সূচক জবাবই দিলাম। আবারো আমার জবাবে তিনি আশ্চর্য হলেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন পিএটিসিতে বৃক্ষরোপণের জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ তিনিও সঙ্গত মনে করতে পারেন–এরূপ কোন একটি যুক্তি আমি তাকে দিতে পারি কিনা। যদি আমার আস্তিনে সেরূপ যুক্তি থাকে তবে তিনি ১০ লক্ষ টাকাই বরাদ্দ করবেন এরূপ আশ্বাসও দিলেন।

বৃক্ষরোপণের পক্ষে উমেদারির চিরাচরিত যুক্তি ছাড়া তার গ্রহণযোগ্য হতে পারে এরূপ যুক্তি আমি তেমন একটা খুঁজে পেলাম না। তাই, অগত্যা বিষয়টি আমার ঘাড়ের উপর তুলে পার্সোনাল করে নিলাম।

২.৬ আমি দু'টি যুক্তি ব্যাখ্যাসহ পেশ করলাম। প্রথমটি হলো, সত্য প্রকাশে ধানাই–পানাই করার অভ্যাস আমার নেই। পিএটিসি প্রকল্পের বহু বিষয়ই আমার জন্য বিব্রতকর হলেও তা আমি যে কোন পর্যালোচনা সভাতেই চাপা দিইনি। দ্বিতীয়ত, আমার চাওয়া ১০ লক্ষ টাকা আগে বরাদ্দকৃত ১ লক্ষ টাকার ন্যায় অপব্যয় হবে না–এই আস্থা আমার উপর যদি পরিকল্পনা কমিশনের মাননীয় সদস্যের থাকে, তাহলে টাকা তিনি বরাদ্দ করতে পারেন। এ ছাড়া আমার আর কোন সঙ্গত যুক্তি নেই।

২.৭ আমার যুক্তিগুলো মজবুত ছিল না। কারণ, উক্ত সভার এক মাসের মধ্যেই আমি অন্য অফিসে বদলি হয়ে যেতে পারতাম। সিস্টেম যদি কাজ না করে, তবে ব্যক্তির ওপর আস্থা রেখে অর্থ বরাদ্দ খুব বেশী সমীচীন হয় না।

২.৮ যা হোক, আমার এ দু'টি যুক্তির পর জনাব মুজিবুল হক আর কিছু বললেন না। কারণ, তাঁর নিজেরও বেশ বৃক্ষ–প্রীতি ছিল। কয়েক সেকেন্ড তিনি চুপ করে থাকলেন। হয়তো এক মিনিটও হতে পারে। তারপর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন পিএটিসি প্রকল্পের বৃক্ষায়নের জন্য আগের এক লক্ষ টাকা সহ মোট বরাদ্দ ৫ লক্ষ টাকা। এই বলে প্রকল্প ব্যয়ের পরবর্তী আইটেম চলে গেলেন।

২.৯ বিনা তর্কযুদ্ধে এবং তাঁর সুতীক্ষ্ণ তিরস্কারে ক্ষত বিক্ষত না হয়ে অর্ধেক বিজয় লাভ করলাম। বুঝলাম, আমার প্রতি তাঁর ৫০% আস্থা রয়েছে। আরও বেশী আস্থা

থাকলে হয়তো তিনি আরও বেশী বরাদ্দ করতেন। আমরা জুনিয়র সহকর্মীরা ছিলাম তাঁর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। কারণ, তাঁর সিদ্ধান্ত হতো সঠিক।

২.১০ আমার প্রতি আস্থা রেখে তিনি যে ৫০% অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন, তারও ৫০% অর্থ অপব্যয় হয় অথবা অতিরিক্ত ব্যয় হয়। আমাদের সামাজিক এবং প্রশাসনিক পরিবেশ এমন প্রতিকূল যে ইচ্ছে থাকলেও ১০০% সফল হওয়া অসম্ভব। বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রাজ্ঞ প্রশাসক জনাব মুজিবুল হক এই সত্যটি আমার চেয়ে অনেক বেশী অবহিত ছিলেন।

৩.০ বৃক্ষমৃত্যু ও বৃক্ষ নাশের ইতিবৃত্ত

৩.১ গাছ লাগাবার দায়িত্ব ছিল গণপূর্ত বিভাগের আরবরিকালচার শাখার ওপর। সমস্যা দেখা দিল নতুন রোপিত গাছগুলোর পরিচর্যা ও সংরক্ষণের। আমি প্রস্তাব করলাম, "পিএটিসি কর্তৃপক্ষ প্রকল্প বরাদ্দের টাকা দিয়ে নিজেরাই গাছ লাগাক।" পিএটিসি কর্তৃপক্ষ জানালেন, প্রকল্প বাস্তবায়নের সবটুকু দায়িত্ব প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসের, তাদের নয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসের দায়িত্ব হলো গণপূর্ত বিভাগের মাধ্যমে কাজ করিয়ে নেয়া। গণপূর্ত বিভাগও সরাসরি গাছ লাগাবেন না। তারা গাছ লাগাবেন কন্ট্রাক্টরদের মাধ্যমে।

৩.২ গণপূর্ত বিভাগ কন্ট্রাক্টরদের মাধ্যমে গাছ লাগালেন। গাছ কিছুটা বড় হয় আবার মরে যায়। প্রকল্প পরিচালক হিসেবে বিষয়টি আমি গণপূর্ত বিভাগকে অবহিত করলে, তারা জানান "পিএটিসি'র ১০ জন মালি কন্ট্রাক্টর কর্তৃক রোপিত গাছকে পানি তো দেয়ই না বরং তারা এ চারা উপড়ে ফেলে, ভেঙ্গে ফেলে, কেটে ফেলে। তাদের এ সাহসের কারণ ছিল পিএটিসির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে গণপূর্ত বিভাগের ও প্রকল্প পরিচালকের বৈরী সম্পর্ক। যা আমি প্রকল্প পরিচালক হিসেবে যোগ দেয়ার পর কিছুটা হ্রাস পায়। কিন্তু পূর্ব স্মৃতি বজায় থাকে।

৩.৩ পিএটিসি কর্তৃপক্ষ গণপূর্ত বিভাগের প্রায় সব কিছুতেই দোষ ধরেন। আর তাদের লাগানো গাছ টেকেনা একথা বলতে আনন্দ পান। পিএটিসির মালিরা রোপিত গাছ কতগুলো মরে গেছে তা দেখিয়ে মনে হয় পুলকিত বোধ করতো।

৩.৪ এই উদ্ভূত সমস্যার সমাধান কিভাবে হতে পারে তা আলোচনার জন্য গণপূর্ত বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে কথা হলো। তাদের কথা হলো যদি তারা নিজেদের লোক দিয়ে পাহারা না দেন এবং পরিচর্যা না করেন, তবে কোন গাছই পিএটিসিতে টিকবে না। বহু আলোচনার পর তাই করার সিদ্ধান্ত হলো। গণপূর্ত বিভাগ পিএটিসি কমপ্লেক্সে গাছ লাগানো এবং পাহারার জন্য ২২ জন মালি নিয়োগ করে। এই টাকাগুলো ছিল আমার মতে অনেকটা অপচয় এবং অপব্যয়। কিন্তু কাজ করার স্বার্থে এই অপচয় এবং অনেক অনিয়মও অনেক সময় বাস্তবতার খাতিরে মেনে নিতে হয়।

৪.০ বৃক্ষ-মৃত্যু সংক্রান্ত তদন্ত প্রতিবেদন

৪.১ গাছ নষ্ট হওয়ার অনিবার্য কারণগুলো তদন্ত কমিটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করে। সাথে সাথে এও উল্লেখ করে যে, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার অভাবও ছিল বৃক্ষনাশের অন্যতম কারণ। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সতর্কতা অবলম্বন করা হলে অনেক গাছই রক্ষা পেত বলে তদন্ত কমিটি উল্লেখ করে।

৪.২ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রোপিত বৃক্ষনাশের জন্য কারা দায়ী, তা নির্ণয় করা কমিটির পক্ষে সহজ হয়নি। বাসস্থান নির্মাণ করা হয়নি বলে তখনকার দিনে কেউ পিএটিসিতে আসতে চাইতেন না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও যারা পোস্টিং পেতেন, তারাও যোগদানের পরে শুরু করতেন বদলির তদবির। ফলে কর্মকর্তাদের বদলি হতো অতি ঘন ঘন। গণপূর্ত বিভাগ অথবা পিএটিসি কর্তৃপক্ষ কখন্ কোন্ গাছ কিভাবে মরেছে তার কোন রেকর্ড রাখেনি।

৪.৩ বৃক্ষমৃত্যুর দায়িত্ব হতে কর্মকর্তারা অব্যাহতি পেলেন রেকর্ডের অভাবে। দায়িত্ব গিয়ে পড়ল পিএটিসির ১০ জন মালির ওপর। পিএটিসির কর্মকর্তা/কর্মচারিদের মধ্যে ছিল সমবেদনা এবং সহমর্মিতার অভাব। তদন্ত কমিটির সদস্যরা মনে করলেন, মালিরা আরও একটু সচেতন হলে তৈরি দালানের আশে পাশে যে গাছগুলো লাগানো ছিল তার অনেকগুলো রক্ষা করা যেতো। গাছগুলো লাগিয়েছিল গণপূর্ত বিভাগ।

৪.৪ তদন্তে বলা হলো এ গাছগুলো মরার পেছনে অন্যান্য কারণের মধ্যে মালিদের দায়িত্বহীনতা এবং অবহেলাও দায়ী। তত্ত্বাবধানে অবহেলার জন্য কর্মকর্তারা দায়ী। প্রতিবেদন পাওয়ার পর সংস্থাপন মন্ত্রণালয় দুঃখ প্রকাশ করলো। শোক সভা করলো। কিন্তু বৃক্ষহত্যার জন্য কোন আদম সন্তানকে শাস্তি দেওয়া সম্ভব হয় নি।

৫.০ বিপিএটিসি'র বকুল গাছটির ইতিহাস

৫.১ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ পিএটিসিতে যে বকুল গাছটি লাগিয়েছিলেন তা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বড় হতে থাকে। পল্লবিত বকুল গাছটি মুকুলিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ২২ নভেম্বর ১৯৮৯, মহামান্য রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ পিএটিসিতে নবম সিনিয়র ষ্টাফ কোর্স উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। বকুল তলে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে নিয়ে তিনি ছবি তোলেন। সে ছবি যত্ন সহকারে পিএটিসিতে সংরক্ষিত হয়। বকুল গাছকে এবং রাষ্ট্রপতিকে সাক্ষী রেখে পিএটিসির প্রশিক্ষণার্থীরা দেশ সেবার মহান ব্রতে ব্রতী হন। এই বৃক্ষটি ছিল একটি ঐতিহাসিক বৃক্ষ।

৫.২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রোপিত বহু গাছ নষ্ট হলেও এই গাছটি পিএটিসির মালিরা যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করে। ফলে তদস্থলে পুনরায় রাষ্টপতিকে দিয়ে বকুল বৃক্ষ রোপণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। আমি লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের রেক্টর বা প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেই ১১ জানুয়ারী, ১৯৯০ তারিখে। আমার যোগ দেয়ার

কয়েক দিনের মধ্যেই একদিন ঝড়ে রাষ্ট্রপতির নিজ হাতে লাগানো বকুল গাছটি ভেঙ্গে যায়।

৫.৩ কাত হয়ে যাওয়া এবং ভেঙ্গে যাওয়া গাছটি রশি দিয়ে বেঁধে জোড়া লাগিয়ে বাঁচাবার ব্যর্থ চেষ্টা করা হলো। লাভ হয়নি। যেহেতু সাবেক রেক্টর সিদ্দিকুর রহমান সাহেব তাঁর নিজের হাতে লাগানো গাছের কথা রাষ্ট্রপতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন এবং সেই গাছের নিচে প্রশক্ষণার্থীদেরকে নিয়ে ছবি তুলেছিলেন, তাই ভাবলাম এরশাদ সাহেব পরে কখনো পিএটিসিতে আসলে এ গাছটির কথা স্মরণ করবেন এবং গাছটি দেখতে না পেয়ে আমার প্রতি অগ্নিশর্মা হবেন।

৫.৪ পিএটিসিতে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল। এই মসজিদে কোন মিনার ছিল না। মিনার না থাকায় ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫ চতুর্থ বুনিয়াদি কোর্স উদ্বোধন উপলক্ষে পিএটিসি পরিদর্শনকালে রাষ্ট্রপতি এরশাদ সাহেব আমার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হন। সবার সামনে বললেন, "আপনাকে আমি ধার্মিক বলেই জানি। কিন্তু আপনি মসজিদের নামে কি বানিয়েছেন? দেখে মনে হয় একটি গীর্জা বানিয়েছেন। মিনার ছাড়া কোন মসজিদ হয় নাকি?"

৫.৫ তাঁর এই অনুভূতির জন্য আমি তাঁর প্রতি অবশ্যই শ্রদ্ধাশীল। মিনার তৈরিতে আমার কোন উৎসাহ ছিল না। আমাদের নবীর (সঃ) মূল মসজিদে কোন মিনার ছিল না। সাহাবীদের আমলে কোন মিনার তৈরী হয়েছিল বলে মনে হয় না।

৫.৬ আমি যোগ দেওয়ার পরে পিএটিসিতে বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে বৃক্ষরোপণের একটা ধুম পড়ে যায়। চারা লাগাবার জন্যে সাড়ে তিন শত নতুন কোদাল ক্রয় করা হয়। প্রশিক্ষণার্থী, প্রশিক্ষক, কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং তাদের ছেলে মেয়েরাও গাছের চারা লাগাতে থাকেন। নতুন লাগানো এত চারা দেখে রাষ্ট্রপতি অবশ্যই তার লাগানো বকুল গাছের কথা স্মরণ করবেন বলে আমার সহকর্মীদের অনেকে মন্তব্য করেন। তিনি যদি বকুল গাছটির ঝড়ে ভেঙ্গে যাওয়া স্বাভাবিক ঘটনা বলে ধরে নেন, তবে রক্ষা। তা না হলে পিএটিসির স্বার্থ বিঘ্নিত হবে বলে বিজ্ঞজন অভিমত প্রকাশ করেন।

৫.৭ অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করা হলো রাষ্ট্রপতি যে জায়গায় বকুল গাছ লাগিয়েছিলেন সেখানে একটি আমগাছ অথবা পাওয়া গেলে একটি বকুল গাছ লাগিয়ে দেওয়া হোক। কথাটি আমার পছন্দ হল। অনেকে এর বাস্তবায়ন সম্পর্কে ছিলেন শংশয়ী। কিন্তু আমি ছিলাম অনেকটা নিশ্চিত।

৫.৮ বড় গাছ যে ক্রেনের সাহায্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে লাগানো সম্ভব, তা আমি ম্যানিলাতে দেখে এসেছি। এদেশে এ ব্যবস্থা এখনও প্রবর্তিত হয়নি। ভাবলাম ৫–৬ বছরের বকুল গাছ অন্য জায়গা থেকে তুলে এনে যদি লাগানো যায়, তাহলে স্বহস্তে রোপিত বকুল বৃক্ষটির মৃত্যুযন্ত্রণার কথা ভেবে রাষ্ট্রপতিকে কষ্ট পেতে হবে না।

খোঁজ করতে লাগলাম কোথায় ৫–৬ বছর বয়সের বকুল গাছ পাওয়া যায় এবং মালিক তা বিক্রি করতে সম্মত আছেন। অবশেষে খোঁজ পাওয়া গেল। সাভার লাইভস্টক অফিসার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে অনেকগুলি বকুল গাছ আছে। ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ জনাব শামসুল আবেদীন সাহেব আমার অতি শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি।

৫.৯ আমাদের মানসিক সমস্যার বিষয় শুনে শামসুল আবেদীন সাহেব রাজি হলেন একটি বকুল গাছ দান করতে, যখন ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারি। ৫–৬ বৎসরের একটি বকুল গাছ প্রচুর মাটিসহ তুলে আনা এবং অন্য জায়গায় নিয়ে জীবিত রাখা কতটুকু সম্ভব তা নিয়ে প্রশ্ন উঠলো। আমি কর্মকর্তাদেরকে বললাম ১০ মন মাটিসহ যদি নিয়ে আসতে পারো, গাছটি ভ্রমণের আনন্দ পাবে, গাছের মূল টের পাবে না। অন্তত মরে যাওয়ার মতো ব্যথা পাবে না।

৫.১০ সাভার লাইভস্টক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের বাগানের বকুল গাছটি চারদিকে আড়াই হাত করে মোট ৫ হাত মাটিসহ বিশেষ ব্যবস্থায় ঠেলাগাড়ীতে তুলে ঠেলে নিয়ে আসা হলো বাংলাদেশ লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চত্বরে। গাছটি লাগানো হলো। ভাগ্য ভালো, গাছটি টিকে গেল।

৬.০ উপসংহার

সাবেক রাষ্ট্রপতি যদি কখনও লোক–প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আসেন, নতুন গাছটি দেখে হয়তো ভাববেন, এটি আমার সেই প্রিয় বকুল গাছ। কিন্তু আসল সত্য হলো পিএটিসির বর্তমান বকুল গাছটি লক্ষ টাকার স্মৃতিধন্য একটি নকল বকুল গাছ। আমাদের দেশে অনেক কিছুই নকল হয়। একটি বকুল গাছ নকল হলেই বা তেমন কি আসে যায়?

পিএটিসিতে যত গাছ বর্তমানে দেখা যায় তার অধিকাংশই সরকারের অর্থ বরাদ্দে ব্যয়িত গাছ নয়। বরং পিএটিসির কর্মকর্তা/কর্মচারী/প্রশিক্ষণার্থীদের শ্রমের মাধ্যমে লাগানো গাছ। এগুলির জন্য তাদের অনেকের দরদ আছে। অন্ততঃ যে গাছ যিনি নিজের হাতে লাগিয়েছেন সেই গাছটির জন্য তাঁর দরদ আছে।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

কর্তৃক প্রকাশিত বইয়ের তালিকা

ক্রমিক নং	শিরোনাম ও লেখক	প্রতি কপির দাম	কমিশনসহ প্রতি কপির দাম
1.	বাংলাদেশ লোক–প্রশাসন পত্রিকা	৪০/০০	টাকা ঃ ২০/০০
2.	বাংলাদেশ পাবলিক এ্যাডমিনিষ্টেশন জার্নাল	৪০/০০	টাকা ঃ ২০/০০
3.	লোক প্রশাসন সাময়িকী	১৫/০০	টাকা ঃ ৭/০০
4.	Post-entry Training in Bangladesh Civil Service: The Challenge & Response	40/00	Tk. 20/00
5.	Career Planning in Bangladesh	120/00	Tk. 60/00
6.	Co-ordination in Public Administration in Bangladesh	100/00	Tk. 50/00
7.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মহিলা	১২০/০০	টাকা ঃ ৬০/০০
8.	Sustainability of Project For Higher Agricualtural Education	40/00	Tk. 20/00
9.	Approaches to Rural Health Care: A Case Study of Ganoshasthaya Kendra	40/00	Tk. 20/00
10.	Sustainability of Rural Development Projects: A Case Study of Rural Development Project in Bangladesh	40/00	Tk. 20/00
11.	Sustainability of Primary Education Project in Bangladesh	40/00	Tk. 20/00
12.	Handbook for the Magistrates	100/00	Tk. 50/00
13.	A Study of the use of Computer	50/00	Tk. 25/00
14.	সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি	125/00	Tk. 62/50

১৯৯৫–৯৬ অর্থ–বছরে গৃহীত কেন্দ্রের গবেষণা প্রকল্প

১. সরকারী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের উপর সমীক্ষা (৪১ টি প্রতিষ্ঠান)
২. প্রশিক্ষণে অডিও–ভিজুয়াল পদ্ধতি ব্যবহারের কার্যকারিতা ঃ একটি গবেষণা সমীক্ষা
৩. বিপিএটিসি'র চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের জীবন–যাত্রার মনোন্নয়ন ঃ একটি সমীক্ষা
৪. Designing Curricula of Short Coruses of BPATC: A case Staudy
৫. Increasing Effectiveness of the Senior Staff Course of BPATC: A Study of Curriculum and the Methodology
৬. Environment Development by Tree Plantaion of the Training Institutes with Special Reference to BPATC
৭. Improvement of Teaching of Secondary Schools with Special Reference to BPATC School.

বিপিএটিসির প্রকাশনা বিক্রয় সম্পর্কিত তথ্য

কেন্দ্রস্থ অনুষদ ভবন–২, এর ৩য় তলায় প্রকাশনা শাখার দপ্তরে তালিকাভুক্ত বই, পুস্তক, জার্নাল পাওয়া যায়।

কেন্দ্র থেকে সরাসরি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বই, পুস্তক, জার্নালের বিক্রয় মূল্যের উপর সাধারণত ৫০% কমিশন দেয়া হয়ে থাকে।

মুদ্রণ ঃ পিআইবি প্রেস, ৩ সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা–১০০০, ফোন ঃ ৯৩৩০০৮২